মার্চ ২০১৮ • ফাল্গুন-চৈত্র ১৪২৪

সচিত্র বাংলাদেশ

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ বিশ্বপ্রামাণ্য ঐতিহ্য

বাঙালির স্বপ্নের স্বাধীনতা যেভাবে এল

জাতির পিতার জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস

বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল দেশ

৮ই মার্চ: আন্তর্জাতিক নারী দিবসের তাৎপর্য

সচিত্র বাংলাদেশ

পড়ুন, কিনুন ও লেখা পাঠান

লেখা পাঠাতে ই-মেইল করুন
email : dfpsb@yahoo.com
dfpsb1@gmail.com

- গ্রাহকগণের যোগাযোগের সময় গ্রাহক নম্বর বা গ্রাহক মেয়াদ উল্লেখ করা প্রয়োজন।
- বছরের যে-কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। নগদে বা মানিঅর্ডারে গ্রাহকমূল্য পাওয়ার পরবর্তী সংখ্যা থেকে গ্রাহক কপি প্রতি মাসে ডাকযোগে পাঠানো হয়।
- এজেন্টদের কপি ভি.পি. যোগে পাঠানো হয়, এ জন্য কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না। দশ কপির কম সংখ্যার জন্য কোনো কমিশন বা এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্টদের কমিশন ৩৩% টাকা হারে দেওয়া হয়।
- ক্রয়, এজেন্ট ও গ্রাহক হওয়ার জন্য নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

সচিত্র বাংলাদেশ-এর বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষাণ্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা।

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৩৩১১৪২
এবং সকল জেলা তথ্য অফিস।

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি দেখুন

সচিত্র বাংলাদেশ: dfpsb@yahoo.com, dfpsb1@gmail.com ■ নবারুণ: nbdfp@yahoo.com ■ বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি: bdqtrly@gmail.com
Website: www.dfp.gov.bd

নবারুণ

নিয়মিত পড়বে, কিনবে, লেখা ও মতামত পাঠাবে। এখন মোবাইল অ্যাপে পাওয়া যাচ্ছে।

নবারুণ-এর বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষাণ্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা।

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৩৩১১৪২
এবং সকল জেলা তথ্য অফিস।

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি দেখুন

সচিত্র বাংলাদেশ: dfpsb@yahoo.com, dfpsb1@gmail.com ■ নবারুণ: nbdfp@yahoo.com ■ বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি: bdqtrly@gmail.com
Website: www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 38, No. 09, March 2018, Tk. 25.00

মুক্তিযুদ্ধের ৪৩ ফুট উঁচু ভাস্কর্য, যুদ্ধ জয়, শেরপুর

জাগ্রত চৌরঙ্গী, গাজীপুর

অদম্য বাংলা, ঠাকুরগাঁও

যুদ্ধ জয়, কুমিল্লা

বিভিন্ন জেলায় নির্মিত দৃষ্টিনন্দন মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা।

সচিত্র বাংলাদেশ gvP© 2018 - dvêyb-^Pi 1424

সচিত্র বাংলাদেশ

মার্চ ২০১৮ ❑ ফাল্গুন-চৈত্র ১৪২৪

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬শে মার্চ ২০১৭ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন–পিআইডি

সম্পাদকীয়

মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতার মাস। এ মাসের ৭ই মার্চ, ১৭ই মার্চ, ২৫শে মার্চ ও ২৬শে মার্চ জাতীয় জীবনে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দিন। ২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। বাঙালির জাতীয় জীবনে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ অর্জন স্বাধীনতা। এই মহান স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধুর সুস্পষ্ট নির্দেশনা– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' ২০১৭ সালের ৩০শে অক্টোবর ৭ই মার্চের এই ঐতিহাসিক ভাষণটি ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্বপ্রামাণ্য ঐতিহ্যের স্বীকৃতি লাভ করে, যা জাতি হিসেবে আমাদের জন্য গর্বের ও অহংকারের। তাই এবারের ৭ই মার্চ নতুন মাত্রা ও মর্যাদা লাভ করেছে।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ প্রথম প্রহরে 'অপারেশন সার্চলাইট'-এর মাধ্যমে ঢাকায় ব্যাপক গণহত্যা চালায় পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী। এক রাতেই প্রায় সাত হাজার মানুষ ব্যক্তি পরিচয় হারিয়ে হয়ে ওঠে 'লাশ'। কালরাত্রির সেই গণহত্যাকে স্মরণ করে ২০১৭ সালে জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫শে মার্চকে 'গণহত্যা দিবস' ঘোষণা করেন। এবারই প্রথমবারের মতো ২৫শে মার্চ গণহত্যা দিবস হিসেবে উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে।

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে শুরু হয় মহান মুক্তিযুদ্ধ। দীর্ঘ নয় মাসের সশস্ত্র সংগ্রামে ৩০ লক্ষ শহিদের প্রাণ বিসর্জন, ৩ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রম এবং অগণিত মুক্তিযোদ্ধার রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয় হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ অর্জন মহান স্বাধীনতা। এ দিনে আমরা বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাকে জানাই গভীর শ্রদ্ধা। মহান মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন দিক, ২৫শে মার্চ 'গণহত্যা দিবস' ও ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ নিয়ে একাধিক প্রবন্ধ ও নিবন্ধ রয়েছে এবারের mwPÎ evsjv‡`k সংখ্যায়।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনকে জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে এ সংখ্যায় রয়েছে নিবন্ধ।

বর্তমান সরকারের নয় বছরে বিভিন্ন সূচকে ধারাবাহিকভাবে অগ্রগতির ফলে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি লাভ করতে যাচ্ছে। জাতিসংঘ বাংলাদেশকে এ মাসে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ নিয়ে বিশেষ নিবন্ধ রয়েছে এ সংখ্যায়।

৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নারী উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ আজ বিশ্বব্যাপী রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃত। এর ওপর একটি নিবন্ধ রয়েছে এই সংখ্যাটিতে।

এছাড়া এ সংখ্যায় বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের গল্প, কবিতাসহ অন্যান্য নিয়মিত বিষয়ও স্থান পেয়েছে। আশা করি, সংখ্যাটি সকলের ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন

সিনিয়র সম্পাদক
মো: এনামুল কবীর

সম্পাদক
আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন
সুফিয়া বেগম

সিনিয়র সহ-সম্পাদক
সুলতানা বেগম

সহ-সম্পাদক
সাবিনা ইয়াসমিন
জান্নাতে রোজী

সম্পাদনা সহযোগী
শারমিন সুলতানা শান্তা
জান্নাত হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

আলোকচিত্রী
সৈয়দ মাসুদ হোসেন
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৪৯৩৫৭৯৩৬ (সম্পাদক)
E-mail : dfpsb@yahoo.com
dfpsb1@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৩১১৪২

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষান্মাষিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা।
নিয়মিত গ্রাহক হওয়ার জন্য যোগাযোগ : **সহকারী পরিচালক**
(বিক্রয় ও বিতরণ), চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর;
স্থানীয় এজেন্ট এবং সকল জেলা তথ্য অফিস।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়
সূচিপত্র
প্রবন্ধ/নিবন্ধ
৭ই মার্চের ভাষণ: স্বাধীনতার চিরঞ্জীব সোপান ৪
হাসানুল হক ইনু
বাঙালির স্বপ্নের স্বাধীনতা যেভাবে এল ৭
শামসুজ্জামান খান
বঙ্গবন্ধুর একটি ভাষণ একটি ইতিহাস ৯
সৈয়দ আবুল মকসুদ
মুক্তিযুদ্ধে আমাদের মিত্ররা ১১
শামসুজ্জামান শামস
৭ই মার্চ : অবিনাশী কথামালার জন্মদিন ১৩
যতীন সরকার
মুক্তিযুদ্ধের কবিতা : কম্পিত স্বরের মূর্ছনা ১৫
সৌম্য সালেক
ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ বিশ্লেষণ ১৭
ফয়সাল শাহ
১৭ই মার্চ জাতীয় শিশু দিবস
বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির অহংকার ১৯
মোহাম্মদ নজরুল হাসান
বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ বিশ্বপ্রামাণ্য ঐতিহ্য ২২
বীরেন মুখার্জী
ভাস্কর্যে মুক্তিযুদ্ধ ২৪
শামস সাইদ
বঙ্গবন্ধু থেকে বিশ্ববন্ধু ২৭
শ্যামল দত্ত
বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল দেশ ২৯
আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন
জাতির পিতার জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস ৩৩
কনক চৌধুরী
বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের প্রাণ জনসংগীত ৩৪
ড. শিল্পী ভদ্র
২৫শে মার্চ গণহত্যা দিবস ৩৭
কালরাত্রির নির্বিচার গণহত্যা
আবু ফাতাহ মোহাম্মদ কুতুব উদ্দিন
বঙ্গবন্ধুর আমলে চলচ্চিত্রের নানা প্রসঙ্গ ৩৯
অনুপম হায়াৎ
৮ই মার্চ: আন্তর্জাতিক নারী দিবসের তাৎপর্য ৪১
আফিয়া খাতুন

হাইলাইটস

ফিচার
ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ
ডিএফপি'র অগ্রণী ভূমিকা ৪৩
নাহিদা সুলতানা
জাতীয় পাট দিবস
অপার সম্ভাবনাময় পাট শিল্প ৪৫
শারমিন সুলতানা শান্তা
গল্প
দ্বন্দ্ব ৪৬
ইফ্‌ফাত আরা দোলা
মুক্তিযোদ্ধা মবিন ৪৮
মো. মনিরুজ্জামান মনির
কবিতাগুচ্ছ ৫০–৫২
শাফিকুর রাহী, পৃথ্বীশ চক্রবর্ত্তী, সালমা নাসরীন, আনসার আনন্দ, সোহরাব পাশা, মো. জাকির হোসেন চৌধুরী, শম্পা প্রদীপ্তি, সাঈদ তপু, পারভীন আক্তার লাভলী, নূর মোহাম্মদ, শান্তনু চট্টোপাধ্যায়, ওয়াসীম হক, আব্দুল আওয়াল রনী, সেঁজুতি রহমান
বিশেষ প্রতিবেদন
রাষ্ট্রপতি ৫৩
প্রধানমন্ত্রী ৫৩
তথ্য মন্ত্রণালয় ৫৪
আমাদের স্বাধীনতা ৫৬
জাতীয় ঘটনা ৫৭
আন্তর্জাতিক ৫৭
উন্নয়ন ৫৮
জেন্ডার ও নারী ৫৮
শিক্ষা ৫৯
প্রতিবন্ধী ৫৯
স্বাস্থ্যকথা ৬০
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৬০
কৃষি ৬০
যোগাযোগ ৬১
পরিবেশ ও জলবায়ু ৬১
সামাজিক নিরাপত্তা ৬২
নিরাপদ সড়ক ৬২
মাদক প্রতিরোধ ৬২
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন ৬৩
সংস্কৃতি ৬৩
শিল্প-বাণিজ্য ৬৪
চলচ্চিত্র ৬৪
ক্রীড়া ৬৪

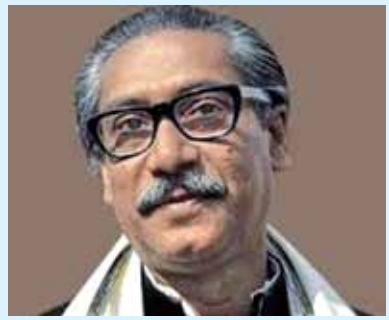

বাঙালির স্বপ্নের স্বাধীনতা যেভাবে এল

বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্ন ও আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন ঘটেছে ১৯৭১ সালে। একাত্তরের ৭ই মার্চের ভাষণে মহানায়ক বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা করেন এবং ২৬শে মার্চ স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ঘটে। দু-এক দিনের বা দু-এক প্রজন্মে নয়, স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বহু বছরের বহু পরিকল্পনা নিয়ে বহু মানুষকে ধীরে ধীরে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করতে হয়। ধাপে ধাপে সেসব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও বহু মানুষের আত্মত্যাগের শেষ পর্যায়ে আসে সেই কাঙ্ক্ষিত মহামূল্য স্বাধীনতা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন ইতিহাসের সেই চেনা পথেই এসেছে। এ নিয়ে ফোকলোর বিশারদ ও বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান-এর বিশেষ নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা-৭

বঙ্গবন্ধুর একটি ভাষণ, একটি ইতিহাস

বাঙালি জাতির জীবনে একাত্তরের ৭ই মার্চ অনন্য একটি দিন। যদিও দিনটি ফাল্গুনের অন্যান্য দিনগুলোর মতো ছিল না। সেদিন রেসকোর্স ময়দানের সমাবেশটিও অতীতের কোনো সমাবেশের সঙ্গে তুলনীয় নয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অতীতে বহু জনসভায় বক্তৃতা করেছেন, কিন্তু সেদিনের সমাবেশে তিনি যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন, সেটি ছিল তাঁর জীবনের অনন্য এক ভাষণ। তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণটি ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে দুটি প্রধান দলিলের একটি। এ নিয়ে বিশিষ্ট কলামিস্ট সৈয়দ আবুল মকসুদ -এর বিশেষ নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা-৯

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ বিশ্বপ্রামাণ্য ঐতিহ্য

ইউনেস্কোর 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারে' অন্তর্ভুক্ত হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ। ইউনেস্কোর 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড' (এমওডব্লিউ) কর্মসূচির ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডভাইজরি কমিটি ২৪ থেকে ২৭শে অক্টোবর ২০১৭ প্যারিসে দ্বিবার্ষিক বৈঠক শেষে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণসহ মোট ৭৮টি দলিলকে 'ডকুমেন্টারি হেরিটেজ' হিসেবে মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারে যুক্ত করার সুপারিশ করে। এরপর ইউনেস্কোর মহাপরিচালক ইরিনা বোকোভা ৩০শে অক্টোবর ২০১৭ আনুষ্ঠানিকভাবে সেই তথ্য প্রকাশ করেন। এ নিয়ে বীরেন মুখার্জীর প্রবন্ধটি পড়ুন, পৃষ্ঠা-২২

জাতির পিতার জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। জন্মক্ষণ অনুসারে ২০১৮ সালের ১৭ই মার্চ তাঁর ৯৮তম জন্মবার্ষিকী পালিত হতে যাচ্ছে। অমিত সাহসী বঙ্গবন্ধু ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন ন্যায় ও অধিকারের পক্ষে সোচ্চার, পরবর্তীতে হয়ে ওঠেন নির্যাতিত-নিপীড়িত বাঙালির মুক্তির দিশারি ও অবিসংবাদিত নেতা। হাজার বছরের আরাধ্য ও প্রত্যাশিত স্বাধীন-সার্বভৌম ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি ১৯৭১ সালে বাঙালি জাতিকে একটি স্বাধীন দেশ উপহার দেন। প্রতিবছর ১৭ই মার্চ জাতির পিতার জন্মদিন পালনের পাশাপাশি ১৯৯৭ সাল থেকে দিনটি জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। এর ওপর কনক চৌধুরীর লেখা প্রবন্ধটি পড়ুন, পৃষ্ঠা-৩৩

২৫শে মার্চ গণহত্যা দিবস
কালরাত্রির নির্বিচার গণহত্যা

২৫শে মার্চ মধ্যরাত থেকে পাকিস্তানি সামরিকবাহিনী শুরু করে 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড। সেই রাতে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী পিলখানায় পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসের (ইপিআর) সদর দপ্তর, রাজারবাগ পুলিশ সদর দপ্তর, খিলগাঁও আনসার সদর দপ্তর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আবাসিক ভবন ও ছাত্রদের আবাসিক হল, আর্ট কলেজের হোস্টেল, শহিদমিনার, রমনা কালিবাড়ি, স্টেডিয়াম এলাকা, পুরান ঢাকার নয়াবাজার, শাঁখারীপট্টি ও কয়েকটি বস্তিসহ পরিকল্পনা অনুযায়ী নানা স্থানে একযোগে হামলা চালিয়েছিল। হামলায় শত শত বাঙালি অফিসার, জওয়ান, শিক্ষক, ছাত্র ও সাধারণ মানুষ নির্মমভাবে নিহত হন। অনেক ঘরবাড়ি ও পত্রিকা অফিসে অগ্নিসংযোগ করা হয়। শুধুমাত্র সেই কালরাতেই প্রায় সাত হাজার নিরীহ-নিরস্ত্র মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল। এ নিয়ে আবু ফাতাহ মোহাম্মদ কুতুব উদ্দিন-এর নিবন্ধটি দেখুন, পৃষ্ঠা-৩৭

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail : dfpsb@yahoo.com, dfpsb1@gmail.com

মুদ্রণে : রূপা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ২৮/এ-৫ টয়েনবি সার্কুলার রোড মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। ফোন: ৭১৯৪৭২০

৭ই মার্চের ভাষণ স্বাধীনতার চিরঞ্জীব সোপান

হাসানুল হক ইনু

হাজার হাজার বছরের বাঙালিত্বের স্বাধীন আত্মপ্রকাশের রূপরেখা ও পথনির্দেশ যে চিরঞ্জীব ঐতিহাসিক ভাষণে বিধৃত, সেটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ। ২০১৭ সালের ৩০শে অক্টোবর ইউনেস্কো সেই অবিস্মরণীয় ভাষণকে 'বিশ্বপ্রামাণ্য ঐতিহ্য' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। বিশ্বপ্রেক্ষিতে এটি এক সুমহান জাতীয় অর্জন। সেইসাথে যারা ইতিহাস বিকৃত করে, ইতিহাসে পাথর চাপা দেয়, এই ঐতিহাসিক স্বীকৃতি তাদের গালে সরাসরি চপেটাঘাত।

জাতীয় প্রেক্ষাপট

সেইসময় বাঙালির জাতীয় প্রেক্ষাপট কী ছিল? অতীতে ৪টি বিজয় অর্জন হয়– '৫২-র ভাষা আন্দোলন, '৫৪-র নির্বাচনে বিজয়, '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান আর '৭০-এর মহা নির্বাচনি বিজয়। আবার এই চারটি বিজয় ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য তিনটি মহা ষড়যন্ত্র পাকিস্তানিরা করেছিল। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার জন্য আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সাজানো এবং '৭০-এর নির্বাচনি বিজয় বানচালের জন্য পয়লা মার্চ সংসদ অধিবেশন বাতিল করে দেওয়া। এছাড়া, মাথার ওপর পাকিস্তানিদের পাকিস্তান ভাঙার অভিযোগ ও বিচ্ছিন্নতাবাদের অভিযোগ ছিল।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মওলানা ভাসানী, শেরেবাংলা একে ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্ট বিপুল ভোটে মুসলিম লীগকে পরাজিত করে। গণপরিষদে সংবিধান রচনার উদ্যোগ হয়। কিন্তু মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব ছিল মাত্র ৫৬ দিন। পাকিস্তানি জান্তার ষড়যন্ত্রে প্রথমে ইস্কান্দার মির্জাকে গভর্নর করে পাঠানো হয়। পরে আইয়ুব খানের সামরিক হস্তক্ষেপে '৫৪-র বিজয় ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

৭ই মার্চ ১৯৭১, রমনা রেসকোর্স ময়দানে সমবেত জনতার উদ্দেশে ঐতিহাসিক ভাষণ দিচ্ছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান –ফাইল ছবি

প্রসঙ্গত, মুজিব আরবি শব্দ। এর অর্থ উত্তর দেওয়া, জবাব দেওয়া। জাতির ওপর সেই সময় যত অন্যায় হয়েছিল, জাতির যত প্রশ্ন ছিল সব প্রশ্নের উত্তর দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই ভাষণে।

যারা ৭ই মার্চের ভাষণের বিষয়বস্তু এবং পূর্বাপর ঘটনাবলি হিসেবে না নিয়ে ভাষণের মধ্যে খুঁত ধরার চেষ্টা করেন, তাদের উদ্দেশে আমি বলতে চাই, বঙ্গবন্ধু এই ভাষণে জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতা আন্দোলনে অভাবনীয় উঁচুমাত্রার রণনীতি ও রণকৌশল প্রয়োগ করেন। শান্তিপূর্ণ গণ-আন্দোলনের মধ্যে স্বাধীনতার প্রশ্ন ফয়সালা করেন।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যে প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু এই ভাষণ দিয়েছেন, সেটা বিবেচনায় নিতে হবে। আর এই ভাষণ শুধু ভাষণ নয়; পরের দিন ৮ই মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ রাত পর্যন্ত কী ফলাফল ছিল, তাও বিবেচনায় নিতে হবে।

১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু ছয় দফা দেন। এটি ছিল স্বশাসনের প্রস্তাব। এটি নস্যাৎ করতে পাকিস্তান বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্রের মিথ্যা মামলা দিয়ে তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। '৫৪ সালের বিজয় ছিনিয়ে নেওয়ার পর এটি ছিল পাকিস্তানের দ্বিতীয় ষড়যন্ত্র।

'৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের পতন ঘটে এবং আইয়ুব খানের সংবিধানটাও বাতিল হয়ে যায়। 'এক মাথা এক ভোট' নীতিটি প্রতিষ্ঠিত হয়, গণপরিষদে সংবিধান রচনার সিদ্ধান্ত হয়। সেই সংবিধানটি রচনায় যাতে বাঙালিদের ন্যায্য অধিকার বিধিবদ্ধ থাকে, সেলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু '৭০-এর সাধারণ

নির্বাচনকে গণরায়ে পরিণত করলেন, গণপরিষদে অর্জন করলেন সংখ্যাগরিষ্ঠতা। বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন ৬ দফার ভিত্তিতে পাকিস্তানের সরকার গঠন। তাই '৭০ সালের নির্বাচনটি কোনো গতানুগতিক নির্বাচন ছিল না।

পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ দেখল, গণপরিষদে বাঙালিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। ফলে সংবিধানে বঙ্গবন্ধু ৬ দফা অন্তর্ভুক্ত করবেন, বাঙালিরা স্বশাসন পাবে। শুধু অভিন্ন প্রতিরক্ষা আর পররাষ্ট্র নীতি ছাড়া পূর্ব বাংলা চলবে নিজের মতো। তারা তা হতে দিতে পারে না। আর এজন্যই গণপরিষদের অধিবেশন ১লা মার্চ বসার কথা থাকলেও ইয়াহিয়া খান তা নাকচ করে দেন।

বঙ্গবন্ধুর এ উদ্দেশ্য যাতে সফল না হয় সেজন্যই ইয়াহিয়া খান পহেলা মার্চের গণপরিষদের অধিবেশন বাতিল ঘোষণা করে। এভাবেই আবার ছিনতাই হয়ে যায় বাঙালির গণরায়। তখন সারাদেশে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ২রা মার্চ স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। উত্তোলিত হয় স্বাধীন বাংলার পতাকা। ৩রা মার্চ বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে পল্টন ময়দানে পাঠ করা হয় স্বাধীনতার ইশতাহার। সুতরাং ৭ই মার্চ তিনি যখন মঞ্চে দাঁড়ালেন, তখন স্বাধীন বাংলার পতাকা এসে গেছে, জাতীয় সংগীত এসে গেছে, এসে গেছে স্বাধীনতার ইশতাহারও।

৮ই মার্চ থেকে তিনি অসহযোগের ডাক দিলেন। এই অসহযোগ গান্ধীর অসহযোগ নয়, দেশের কর্তৃত্বই নিয়ে নিলেন। অসহযোগ পাকিস্তানের সাথে, আর দেশ পরিচালনার জন্য নিলেন কর্তৃত্বভার। অফিস-আদালত, ব্যাংক চলবে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কীভাবে কাজ করবে, জনগণ কী করবে–সকল নির্দেশনা দিয়ে দিলেন। পূর্ব বাংলার রাষ্ট্র কাঠামোর প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই পাকিস্তানি নির্দেশ অমান্য করে বঙ্গবন্ধুর জারিকৃত ফরমান অনুযায়ী চলা শুরু করে।

ভাষণের শেষে বঙ্গবন্ধু দুটো সংগ্রামের কথা বলে বাঙালি জাতিকে নিয়ে তাঁর দর্শন তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' ভৌগোলিক স্বাধীনতার সাথে তিনি শোষণ-বঞ্চনা থেকে মুক্ত হবার সংগ্রামের কথা বলেছেন। এর মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতার পাশাপাশি মানুষ ও সমাজের মুক্তির কথা বললেন তিনি।

২৫শে মার্চ রাতে বাংলাদেশ আক্রমণ ছিল পাকিস্তানের চার নম্বর চক্রান্ত। বঙ্গবন্ধু এই চক্রান্ত পূর্বেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তিনি দেখেছেন এর আগে '৫৪ সালের নির্বাচনে বাঙালিদের বিজয় কীভাবে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, '৬৬ সালে তাঁকে মিথ্যা মামলায় হত্যার চক্রান্ত করা হয়েছে আর '৭০ সালের নির্বাচনে জয়ী হয়েও বাঙালিদের গণপরিষদে বসতে দেওয়া হচ্ছে না। অতীতের তিন চক্রান্তের জালে বাঙালিদের আটকে রাখলেও আর কোনো চক্রান্তে যাতে পাকিস্তানিরা বাঙালিদের দমিয়ে রাখতে না পারে, সেজন্যই ৭ই মার্চ মঞ্চে দাঁড়ালেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙালিরা যাতে সরাসরি চক্রান্ত বানচাল করে স্বপ্নের স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে যেতে পারে, তাঁর ভাষণে সেই সশস্ত্র সংগ্রামের পথই দেখালেন তিনি। আর পিছু ফেরা নয়, আর বঞ্চনা নয়, নয় শোষণ আর লাঞ্ছনা– এবার স্বাধীনতা, এবার মুক্তি।

আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক প্রেক্ষাপট

এই ভাষণ দেওয়ার সময় আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পরিস্থিতি কী ছিল, তাও লক্ষ করার বিষয়। মনে রাখতে হবে সেই সময় '৬৫-র পাক-ভারত যুদ্ধের পরে তাসখন্দ শান্তি চুক্তি হয়েছিল। পাকিস্তান-ভারত-রাশিয়া শান্তির বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। অর্থাৎ ভারতের সাথে তখন পাকিস্তানের শান্তি। বাংলাদেশের পক্ষ নিয়ে ভারত যুদ্ধে লিপ্ত হবে– তা বলার কোনো আগাম অবকাশ ছিল না। তাছাড়া, পাকিস্তানিদের সঙ্গে কমনওয়েলথ দেশভুক্ত ও কমনওয়েলথ বহির্ভূত ইউরোপের সকল দেশের সুসম্পর্ক ছিল এবং মার্কিন ও চীন সরকারের সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। অপরদিকে '৬৫-র যুদ্ধের পরে ভারত এবং চীনের বিরোধ ছিল, ভারত এবং রাশিয়ার কোনো চুক্তি ছিল না। আর সেই সময়টা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং আমেরিকার শীতল যুদ্ধের সময়।

স্বাধীনতার ঘোষণা

চতুর্থ চক্রান্তের পরেই তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন। কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন নয়, যুদ্ধ হলো দুটি স্বাধীন দেশের মধ্যে। তার আগে ৮ই মার্চ থেকেই তিনি শাসনভার নিজের হাতে নিয়েছেন। প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার নির্দেশ দেন। মানুষের মধ্যে তৈরি করেন অবিচল আস্থা আর বিশ্বাস। যার ফলে শেখ মুজিব গ্রেফতার হলেও তখন সাড়ে সাত কোটি বাঙালিই মুজিব হয়ে গেছে। ১৭ই এপ্রিল জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের মুজিবনগর সরকার গঠিত হলো। পৃথিবীর দেশসমূহ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে শুরু করল। ১৯শে এপ্রিল থেকে সেনাবাহিনীতে কর্মরত বাঙালি সদস্যরা পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান নেন। বিচ্ছিন্নতাবাদের কোনো অপবাদ বাঙালিদের ওপর আসেনি। বঙ্গবন্ধু তাঁর গভীর প্রজ্ঞা আর কৌশলে সেই অবস্থান তৈরি করেছেন। বাঙালিদের স্বাধীনতা সংগ্রাম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হবার আন্দোলন নয়, একটি মুক্তিকামী জাতির স্বাধিকার, স্বশাসনের আন্দোলন। এ কারণেই ২৫শে মার্চ পাকিস্তানিদের আক্রমণ স্বশাসিত বাংলাদেশের ওপর আক্রমণ আর ২৬শে মার্চ থেকে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ– দুই স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ।

বঙ্গবন্ধু নিজের হাতে তিল তিল করে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি নাগরিককে স্বাধীনতার লক্ষ্যে জাগিয়ে তুলেছিলেন। '৬৬-তে ৬ দফা উত্থাপন এবং স্বশাসনের পক্ষে গণরায় অর্জন '৭০-এ। এছাড়া '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানে আইয়ুবের শাসনতন্ত্র বাতিল, এক মাথা এক ভোট অর্জন করে তিনি গণপরিষদের ভোট আদায় করে নেন এবং নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন।

প্রধানমন্ত্রী হবেন, না-কি স্বাধীনতার লক্ষ্যে উত্থিত জাতির কর্তৃত্বভার প্রকাশ্যে গ্রহণ করবেন–এই প্রশ্ন ছিল তাঁর সামনে। তিনি উত্তর দিয়েছেন শান্ত অথচ বজ্রকণ্ঠে– 'আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই।' আর সেকারণেই এই ভাষণের আগেই তাঁর নির্দেশনায় স্বাধীনতার পতাকা উঠেছে, স্বাধীনতার ইশতাহার পাঠ করা হয়েছে, জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়েছে, বাংলাদেশের সীমানা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে, বঙ্গবন্ধুকে দেশের সর্বাধিনায়ক ঘোষণা করা হয়েছে, জয় বাংলা বাহিনী গঠন করা হয়েছে, স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ চালু হয়েছে।

৭ই মার্চ: ইতিহাস বদলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত

এমনই এক পরিস্থিতিতে ইতিহাস বদলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে মঞ্চে দাঁড়ান বঙ্গবন্ধু। শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে স্বাধীনতার লক্ষ্যে রণনীতি ও রণকৌশল প্রয়োগ করেন এই ভাষণে। মঞ্চে যখন বঙ্গবন্ধু ওঠেন, ঠিক তখনকার অবস্থা কী ছিল? বিশাল জনসমুদ্র সামনে, হাতে বাঁশের লাঠি, কণ্ঠে জয় বাংলা ধ্বনি, চোখে মুক্তির আগুন। একদিকে পাকিস্তানি সেনা কর্তৃপক্ষের রক্তচক্ষু, আরেকদিকে স্বাধীনতা শব্দটা ধ্বনিত হচ্ছে সাড়ে সাত কোটি বাঙালির হৃদয়ে। এই প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতার মন্ত্রে জাতিকে এগিয়ে নিতে সেই ভাষণের মধ্য দিয়েই অসহযোগের নামে ৮ই মার্চ সকাল থেকে বাংলাদেশের কর্তৃত্ব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রহণ করেন। প্রায় ৩০টির ওপর ফরমান দিয়ে দেশ পরিচালনা শুরু

৭ই মার্চ ১৯৭১, বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনতে রমনা রেসকোর্স ময়দানে সমবেত জনতার একাংশ –ফাইল ছবি

করেন। ২৩শে মার্চ সারাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন বাংলার পতাকা ওঠানো হয়, শেষ পেরেকটা ঠুকে দেওয়া হয় পাকিস্তানের কফিনে।

কার্যত বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালির স্বাধীন শাসন শুরু হয় এবং এই স্বাধীন শাসনকে যেন কোনোভাবেই বানচাল করতে না পারে তার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধের দিকনির্দেশনাও তিনি পরিষ্কারভাবে ভাষণে দেন। আমরা দেখি পাকিস্তানিদের চতুর্থ ষড়যন্ত্র। ২৫শে মার্চের রাত্রে স্বাধীন স্বশাসিত বাংলাদেশের ওপর আক্রমণ। বঙ্গবন্ধু কালবিলম্ব না করে ২৬শে মার্চ স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়ে স্বাধীন বাংলার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে দেন। সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়ে বাংলাদেশ পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

৭ই মার্চের ভাষণের দশ অধ্যায়

এখন পূর্বাপর এই ঘটনার প্রেক্ষিতে ভাষণটি যদি মিলিয়ে দেখি, তাহলে দেখা যায় কী নিখুঁতভাবে বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণ সাজিয়েছেন। পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে দশটি অধ্যায় চিহ্নিত করা যায়–

১. ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ এই ২৩ বছরের শোষণ-বঞ্চনা ও বাঙালির অধিকার অস্বীকারের ইতিহাস

২. ১৯৭০-এর নির্বাচনের গণরায় বানচালে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার পাকিস্তানি ষড়যন্ত্র

৩. পাকিস্তানের নয়া চক্রান্ত–১০ই মার্চের গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান

৪. বঙ্গবন্ধুর পালটা প্রস্তাব–সামরিক আইন প্রত্যাহার, সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফেরত যাওয়া, হত্যার তদন্ত, জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর

৫. সর্বাত্মক অসহযোগ– হরতালের ঘোষণা

৬. প্রয়োজনে সশস্ত্র প্রতিরোধের ডাক

৭. পূর্ববাংলা পরিচালনার রাজনৈতিক কর্তৃত্বভার গ্রহণ

৮. পূর্ব থেকে পশ্চিমে অর্থ চালান বন্ধ ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা

৯. সশস্ত্র প্রতিরোধের আহ্বান ও জাতীয় মুক্তি–আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলার নির্দেশ এবং

১০. মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রামের ঘোষণা।

সুতরাং এই ভাষণের ফলাফলে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, কী অপূর্বভাবে তিনি স্বশাসন এবং স্বাধীনতা, গণ-আন্দোলন, নির্বাচন ও সশস্ত্র সংগ্রামের সমন্বয় সাধন করেছেন। একটি ভাষণ একটি জাতিকে স্বাধীনতা পেতে কীভাবে দাঁড় করিয়ে দিল, পৃথিবীর ইতিহাসে সেই অবিস্মরণীয় অধ্যায়ের জন্যই ইউনেস্কোর এই যুগান্তকারী স্বীকৃতি।

এই অর্জন কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। '৭৫-এর পর সামরিক কর্তৃপক্ষ জাতির ইতিহাস কেড়ে নেয়। কেড়ে নেয় অর্জনগুলো। ইতিহাস ও অর্জনগুলো পুনরুদ্ধারের জন্য আমরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যে লড়াই শুরু করেছি, সেই পর্বের ৭ই মার্চের ভাষণ নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করছি। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এবার বাংলাদেশের পথে চলতে শুরু করেছে। বাংলাদেশের আবার স্বরূপে ফিরে এসেছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে, বঙ্গবন্ধু স্বমহিমায়, স্বসম্মানে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেছেন।

যে বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা দিয়ে গেছেন, সেই বাংলায় আবার রাজাকার-জঙ্গি ছোবল মারছে। এটা চলতে দেয়া যায় না। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যে মহা ঐক্য গড়ে উঠেছে, যার সেনাপতিত্বে আমরা লড়াই চালাচ্ছি, তার ফলে জঙ্গি-রাজাকারমুক্ত নিরাপদ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। বঙ্গবন্ধু দেশ উপহার দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আবার শান্তির দেশ গড়ে দেবেন।

চল্লিশের দশকে মনীষী এম. ওয়াজেদ আলী আমাদের স্বপ্ন দেখিয়ে বলেছিলেন, 'এই জাতি একজন মহামানবের প্রতীক্ষায় আছে।' ৭ই মার্চ ১৯৭১ আমাদের সেই প্রতীক্ষা শেষ হলো, মহামানব বঙ্গবন্ধুকে পেলাম। সকল অর্থেই তিনি সেই মহামানব যে, বাংলাদেশকে ১৭৫৭-এর পলাশী থেকে ২১৪ বছর পর ১৯৭১-এ স্বাধীন করলেন।

বাবলু জোয়ার্দারের ভাষায়–

সে ছিল দীঘল পুরুষ-
হাত বাড়ালেই ধরে ফেলত
পঞ্চাশ হাজার বর্গমাইল,
সাড়ে সাত কোটি হৃদয়,
ধরে ফেলত বৈশাখি মেঘ অনায়াসে।

আর এ অজস্র কারণেই ৭ই মার্চের বজ্রকণ্ঠের বঙ্গবন্ধু কেবলমাত্র একজন ব্যক্তি নন। বঙ্গবন্ধু হচ্ছেন একটি পতাকা, একটি মানচিত্র, একটি দেশ, বাঙালি জাতীয়তার একটি মহাকাব্য, একটি আন্দোলন, জাতি নির্মাণের কারিগর, ঠিকানা প্রদানের সংগ্রাম, একটি বিপ্লব, একটি অভ্যুত্থান, একটি ইতিহাস, বাঙালি জাতির ধ্রুবতারা: জাতির উত্থান, রাজনীতির কবি, জনগণের বন্ধু, রাষ্ট্রের স্থপতি, স্বাধীনতার প্রতীক, ইতিহাসের মহানায়ক, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাঙালি জাতির অমর পিতা।

জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

লেখক: তথ্যমন্ত্রী ও জাতীয় সংসদ সদস্য

বাঙালির স্বপ্নের স্বাধীনতা যেভাবে এল

শামসুজ্জামান খান

বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্ন ও আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন ঘটেছে ঐতিহাসিক-অবিস্মরণীয় ১৯৭১ সালে। ইতিহাসে লেখা আছে বাঙালির স্বাধীনতা কামনার, স্বপ্নকুঁড়ির মতো বা অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষার ও ইচ্ছার মতো বীজ আকারের, অঙ্কুরোদগমের অবয়বের মতো কিছু দিক-চিহ্নের কথা। লেখা আছে, সেই স্বাধীনতা-স্বপ্নের আগুনে প্রবেশ করে ওই স্পর্ধার জন্য পুড়ে মরার কথা। লেখা আছে অগণন ত্যাগ-তিতিক্ষা আর আত্মত্যাগের কথা। স্বাধীনতা বড়ো কঠিন সাধনায় অর্জনের এক মণিরত্ন। দু-এক দিনের বা দু-এক প্রজন্মে এই মহারত্ন অর্জন সম্ভব নয়। বহু বছর আর বহু পরিকল্পনা এবং তার বাস্তবায়নের জন্য বহু মানুষকে ধীরে ধীরে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে ধাপে ধাপে এক পর্যায়ে বিজয় এবং পরের পর্যায়ে পিছু হটা–এমন করেই শেষ পর্যন্ত আসে সেই কাঙ্ক্ষিত, বহু সাধনার ধন মহামূল্য স্বাধীনতা।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন ইতিহাসের সেই চেনা পথেই এসেছে। হঠাৎ করে এক দিনে কোনো মেজর সাহেবের ডাকে আসেনি। তা আসা সম্ভব না বলেই আসেনি–যেভাবে আসার নিয়ম সেভাবেই এসেছে। সেই ইতিহাসই আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাস। অন্য ইতিহাস কেউ বলতে চাইলে তা ভুয়া, বিকৃত, স্বকপোলকল্পিত। বাংলাদেশের ভণ্ড, নতজানু ও স্বার্থসিদ্ধিপ্রবণ ঐতিহাসিক, তথাকথিত অনুগ্রহ প্রত্যাশী বুদ্ধিজীবী ও আমলা আর ক্ষমতালিপ্সু রাজনীতিক বাংলাদেশের স্বাধীনতার এই স্বকপোলকল্পিত বা মনগড়া ইতিহাস তৈরির নানা কুমতলবকে নানা পরিকল্পনা, মহাপরিকল্পনা এবং পূর্বের লেখা ইতিহাস সংশোধনের সিঁদেল চোরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাস কবে থেকে শুরু তা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। চর্যাপদের কবি ভুসুক যেদিন দুঃখ-বেদনা ও বঞ্চনার আত্মপ্রশ্নে বিদ্ধ হয়ে বললেন, 'আজি ভুসুক বাঙালি ভইলি' (আজ ভুসুক বাঙালি হলো)–বৌদ্ধ বাঙালি সিদ্ধাচার্যের সেই উচ্চারণ বাংলার জাগরণ আর বাঙালির জাতিসত্তা নির্মাণে অর্থাৎ দূরদৃষ্টিতে স্বাধীনতার পথরেখা (এখনকার পরিভাষায় রোডম্যাপ) তৈরিতে কোনোই অবদান রাখেনি এমন তো নয়! বাঙালি যখন তার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার নির্মাণে চর্যাপদকে সামনে রাখে তখন কবি ভুসুকের ওই বাণী বাঙালিত্বের জন্মচিৎকারের মতো অনন্য ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। মহামতি বুদ্ধের অনুসারী বাঙালি কবিই তখন বাঙালিত্বের তথা বাঙালি জাতির বিজয়ের নকিব হয়ে উঠেছেন।

এর কয়েকশ বছর পরে ইংরেজ শাসনামলে শেরপুর-জামালপুরে পাই বাঙালি মুসলমান কৃষক টিপু পাগলা, উত্তরবঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান ফকির এবং সন্ন্যাসী বিদ্রোহীদের, পশ্চিম বাংলার নারকেলবাড়িয়ার তিতুমীরকে (মীর নিসার আলী)। আর ১৯২০-৩০-এর দশকে স্বদেশি আন্দোলনের নায়ক মাস্টারদা সূর্যসেন ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারকে দেখি ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াইয়ে জীবনদান করে আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে এবং পরে স্বাধীনতার সশস্ত্র লড়াইয়ে কৃষক বিদ্রোহের অনন্য বীরগাথাও আমরা বাংলার ইতিহাসে খুঁজে পাই।

কিন্তু এর বাইরে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি, বিপ্লবী রাজনীতি এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতির অবদানও আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বাঙালির জাতিসত্তা নির্মাণে অসামান্য। নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে শ্রী চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিণ চন্দ্র পাল, শরৎচন্দ্র বসু, এ কে ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মানিক মিয়া প্রমুখের অবদান বিরাট। নিয়মতান্ত্রিক ও সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে সুভাষচন্দ্র বসু, শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দীন আহমদ প্রমুখের নাম স্মরণীয়। আর তাঁদের সংগ্রামী জীবন ও রাজনীতির সার-সংস্কৃতি এবং লোকজ-সংস্কৃতির সাধকের অবদানও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মাইকেল, বিদ্যাসাগর, মীর মশাররফ হোসেন,

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১, রমনা রেসকোর্স ময়দানে মিত্রবাহিনীর প্রধানের কাছে পাকিস্তানি বাহিনী প্রধান আত্মসমর্পণ করে–ফাইল ছবি

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, লালন ফকির, হাছন রাজা, অবন-জয়নুল-কামরুল-সত্যজিৎ রায়সহ অসংখ্য কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক-আলোকচিত্রীর বাঙালির জাতীয় সংস্কৃতি নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। আর এই সংস্কৃতির ভিত্তির ওপর নির্মিত হয়েছে বাঙালির স্বাধীন রাষ্ট্র। সেজন্য এ রাষ্ট্রের স্রষ্টা শেখ মুজিব বলতে পারেন: 'ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময়ও বলব– আমি বাঙালি, বাংলা আমার ভাষা।'

আসলে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি সৃষ্টি হয়েছে মূলত বাঙালি সংস্কৃতির ভিত্তির ওপর। তাই আমরা শুধু রাজনৈতিক বিদ্রোহীদের এই রাষ্ট্র সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি না, একই সঙ্গে ভুসুক থেকে সপ্তদশ শতকের আবদুল হাকিম এবং উনিশ-বিশ শতকের মুকুন্দ দাস, রমেশ শীল, দুদু শাহ, জালাল খাঁ, মাইজভাণ্ডারি তরিকার সৈয়দ আহমদ উল্লা এবং সুকান্ত থেকে শামসুর রাহমানকে বাঙালির রাষ্ট্র সৃষ্টির অন্যতম রূপকার বলে মনে করতে পারি। তাঁদের সবার চিন্তার সমন্বয় সাধন করেই শেখ মুজিব বাংলাদেশ রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক, মানবিক, ধর্মনিরপেক্ষ বা অসাম্প্রদায়িক চারিত্র্য নির্ধারণ করেন।

সামান্য কোনো পেশাজীবীর পক্ষে ইতিহাসের এত বড়ো ক্যানভাসকে চিন্তা ও কর্মপদ্ধতিতে ধারণ করে রাষ্ট্র গঠন করা একেবারেই অসম্ভব। এখানেই শেখ মুজিবের অনন্যতা–তিনি ভিন্নধর্মী বা স্বকীয় রাষ্ট্র স্থপতি বাঙালির শত-সহস্র বছরের ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি এবং দুঃখ-বঞ্চনাকে ধারণ করেই সৃষ্টি করেন এই অনন্য জাতি-রাষ্ট্র-বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস সুদীর্ঘকালের, সে কথা আমরা আগেই বলেছি। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ভাষণে মহানায়ক বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা করেন এবং ২৬শে মার্চ স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ঘোষণা করেন। ১৯৭১ সালের মার্চের প্রথম দিনেই সংসদ অধিবেশন বন্ধ ঘোষণায় পাকিস্তানি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে গোটা বাংলাদেশ। পূর্ব বাংলার মানুষের মন থেকে মুছে যায় পাকিস্তান রাষ্ট্রের বাস্তব অস্তিত্ব এবং বাংলার মানুষকে এই মানসিক স্তরে আনেন মূলত বাংলার জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি এক দিনের কোনো ঘোষণা বা ১৯৭১ সালের মার্চের অসহযোগ আন্দোলনেই বিপুলসংখ্যক মানুষকে এই গুরুতর সিদ্ধান্তের স্তরে আনতে পারেননি। বাংলার মানুষকে এই স্তরে আনতে তাঁর সময় লেগেছে প্রায় সিকি শতাব্দী।

১৯৪৭-৪৮ সালে তিনি শামসুল হক ও মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে, আতাউর রহমান খানের সহায়তায় মুসলিম লীগ বিরোধী এবং আধুনিক জনগণের স্বার্থভিত্তিক আওয়ামী মুসলিম লীগের রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করেন। তা ধীরে ধীরে শত নির্যাতন-অত্যাচার, জোরজুলুম সহ্য করে বাংলার মানুষের মনে সুদৃঢ় প্রভাব ফেলতে থাকে।

এই ধারার প্রথম বিজয় সূচিত হয় ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভূমিধস পরাজয়ে। এ পর্যায়ে সোহরাওয়ার্দী, ভাসানী, এ কে ফজলুল হকের অবদান মুখ্য হলেও জনপ্রিয় তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান কম নয়। শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলা ও বাঙালির স্বপক্ষে জাতিতাত্ত্বিক অবস্থানপ্রসূত যে ভূমিকা পালন করেন, তা বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও বাঙালির রাষ্ট্র নির্মাণের উপাদান প্রস্তুত করে। তিনি পাকিস্তানি গণপরিষদে পশ্চিম পাকিস্তানি শোষকদের উদ্দেশে বলেন:

ক. Zulum mat karo bhai (জুলুম করো না ভাই), যদি করো তাহলে নিয়মতান্ত্রিক পথ ছেড়ে আমরা অসাংবিধানিক পন্থায় চলে যেতে বাধ্য হব;

খ. The word 'Bengal' has a history, has a tradition of its own ('বাংলা' শব্দটির এক নিজস্ব ইতিহাস ও ঐতিহ্য আছে)। তাই 'বাংলা' নাম পরিবর্তন করে 'পূর্ব পাকিস্তান' রাখতে চাইলে আমাদের পূর্ব বাংলায় গিয়ে জনগণের মত নিতে হবে, তারা রাজি হলে তবেই এটা সম্ভব;

গ. বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা এবং যুক্ত নির্বাচনের কী হলো? (Speeches of Sheikh Mujibur Rahman in Pakistan Parliament, P. ১২)–এ দুটি বিষয়ই বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম মূল উপাদান;

ঘ. করাচিকে এক ইউনিটভুক্ত করে পশ্চিম পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করলে (করাচি বাংলার পাটের টাকায় গড়ে উঠেছে বলে) পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তর করতে হবে;

ঙ. বাংলার মানুষ না খেয়ে আছে এবং তারা মারা যাচ্ছে (কিছু আগে খুলনায় দুর্ভিক্ষ হয়ে গেছে) পাকিস্তান দাবিকে বিপুলভাবে সমর্থন করার এই ফল? পশ্চিম পাকিস্তানিরা পাকিস্তানের জন্য এতটা ত্যাগ স্বীকার করেনি। তারা আমাদের দুঃখ বুঝবে না;

চ. আমরা 'পাকিস্তানি' না 'বাঙালি' নামে পরিচিত হতে চাই;

ছ. I will here and now speak in Bengali and nobody can prevent me from doing that (আমি এখানে এই মুহূর্তে বাংলায় বক্তৃতা করব। আমাকে কেউ বাধা দিতে পারবেন না)।

১৯৬২ সালে বাংলার স্বাধীনতা প্রস্তুতির জন্য তিনি গঠন করেন ছাত্রনেতাদের নেতৃত্বে এক নিউক্লিয়াস। এর সদস্য করা হয় সিরাজুল আলম খান, ফজলুল হক মণি, আবদুর রাজ্জাক ও কাজী আরেফ আহমদকে। তারা বঙ্গবন্ধুর অনুমোদনে স্বাধীনতার নানা সুস্পষ্ট কর্মসূচি তৈরি করেন। যেমন–ক. 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা', 'জাগো জাগো বাঙালি জাগো', 'পিণ্ডি না ঢাকা? ঢাকা, ঢাকা' স্লোগান এবং বাঙালির স্বাধীনতার বীজমন্ত্র 'জয় বাংলা'। ১৯৬৬ সালে ছয় দফা বাংলাদেশের স্বাধীনতার মোক্ষম অস্ত্র হয়ে ওঠে। এই মারণাস্ত্রপ্রতিম ছয় দফা বঙ্গবন্ধু পেশ করেন পাকিস্তানের রাজনৈতিক শক্তির মূল কেন্দ্র লাহোরে।

সাহসী, লড়াকু মুজিব তখন জনপ্রিয়তার তুঙ্গে। শেখ মুজিব ছয় দফা নামে এক দফায় আসছেন এটা বুঝতে পেরেই আইয়ুব খান তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগ করার হুমকি দেন। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি দখলদাররা অস্ত্রের ভাষাই প্রয়োগ করে বাঙালিদের বিরুদ্ধে। এই ভয়াবহ অস্ত্রের ভাষা সত্ত্বেও ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলন কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা শুধু নয়, দেশকে মার্চেই যেন স্বাধীন করে ফেলেন। ১৯৭১ সালের জুলাই মাসের South Asian Review-তে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: 'When the police and servants joined the judges in pledging support for Mujib a defacto transfer of power had taken place inside Bangladesh and it had happened within a week of Yahiya's decision. During next three weeks Mujibs house became in effect this secretariate of Bangladesh' (বিচারকদের অনুসরণ করে পুলিশ এবং সিভিল প্রশাসনের কর্মচারীরা যখন মুজিবের প্রতি সমর্থন জানায় তখনই বাংলাদেশের ভেতরে ক্ষমতার কার্যত হস্তান্তর হয়ে যায় এবং ইয়াহিয়ার সিদ্ধান্তের এক সপ্তাহের মধ্যেই তা ঘটে। পরের তিন সপ্তাহে মুজিবের বাড়ি কার্যত বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েটে পরিণত হয়)।

এভাবে উত্তাল মার্চের পথ বেয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনন্য নেতৃত্বে রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির বিজয় অর্জিত হয়। বিশ্বের বুকে আবির্ভাব ঘটে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের।

লেখক: মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি

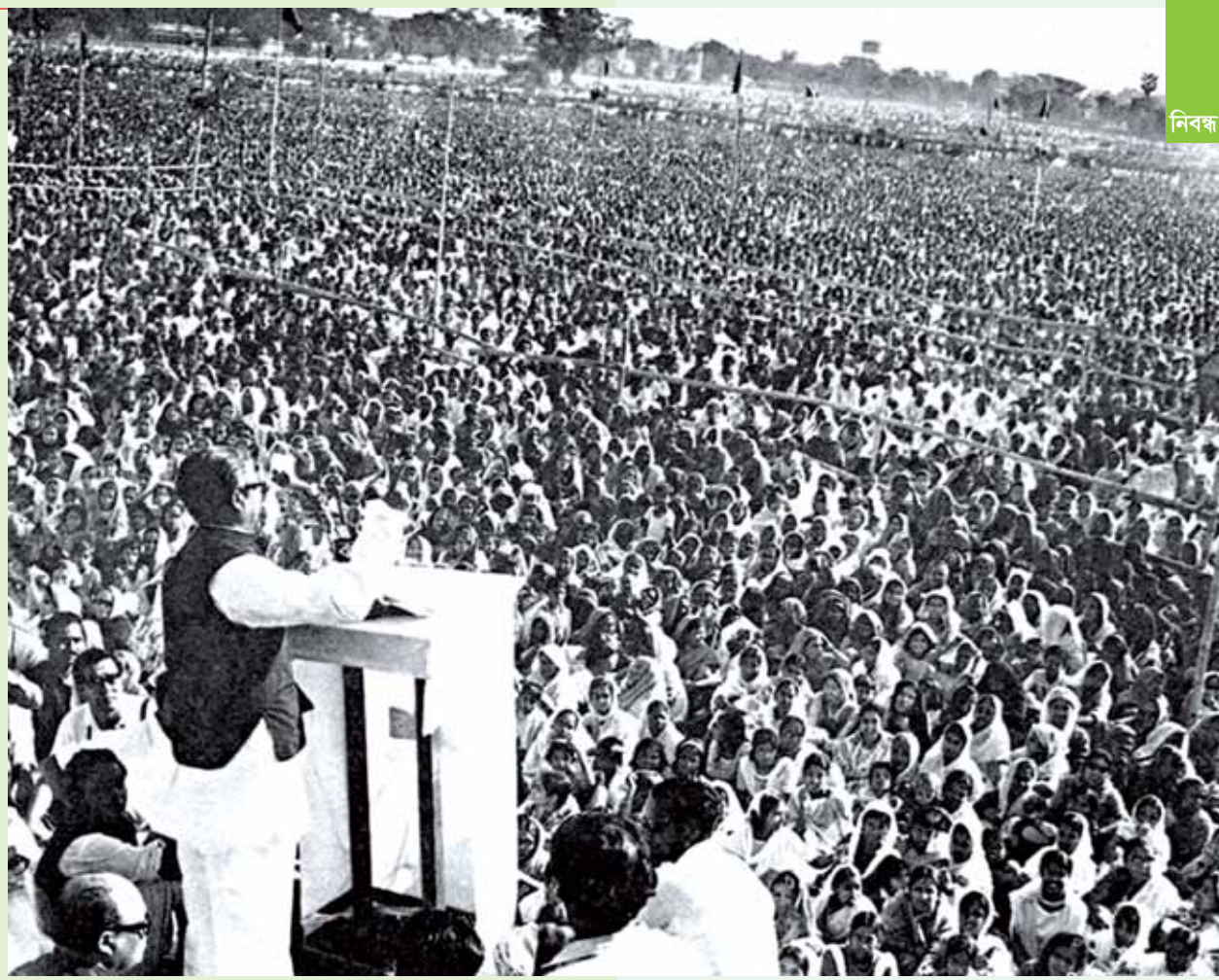

বঙ্গবন্ধুর একটি ভাষণ একটি ইতিহাস

সৈয়দ আবুল মকসুদ

বাঙালি জাতির জীবনে একাত্তরের ৭ই মার্চ অন্য যে-কোনো একটি দিনের মতো ছিল না। যদিও দিনটি ছিল অন্যান্য বছরের ফাল্গুনের দিনগুলোর মতোই পাতা ঝরার সময়। শেষ ফাল্গুনের দুপুরটি ছিল না শীত, না গরম। আকাশ ছিল পরিষ্কার, কিন্তু চড়া রোদ সেদিন ছিল না। সেদিন রেসকোর্স বা বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যে সমাবেশ হয়, সেই সমাবেশও অতীতের কোনো সমাবেশের সঙ্গে তুলনীয় নয়। শেখ মুজিবুর রহমান অতীতে বহু জনসভায় বক্তৃতা করেছেন, কিন্তু সেদিনের সমাবেশে তিনি যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন, সেটি ছিল তাঁর জীবনের অনন্য এক ভাষণ। তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণটি ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে দুটি প্রধান দলিলের একটি। দ্বিতীয়টি ১০ই এপ্রিলের বৈদ্যনাথতলার 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র'।

কোনো কোনো জাতির ইতিহাসে কোনো একটি প্রজন্ম খুবই ভাগ্যবান হয়। শত দুঃখ-কষ্ট সয়েও তারা ভাগ্যবান এই জন্য যে তারা নিজের চোখে ইতিহাসের নির্মাণ দেখে। তাদের মধ্যে যাদের ইতিহাস সৃষ্টিতে অংশগ্রহণের সুযোগ হয়, তাদের সৌভাগ্য সীমাহীন। আমরা বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলন এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের সেই প্রজন্ম। প্রজন্মের পর প্রজন্ম যে আন্দোলনের ইতিহাস বই পড়ে জানবে, তা আমাদের চোখে দেখা। ঘরোয়া আলোচনায় বা সেমিনারে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তব্য শুনতে পছন্দ করতাম। কিন্তু কোনো জনসভায় দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে নেতাদের বক্তৃতা শুনতে আমার ভালো লাগত না। অখণ্ড পাকিস্তানের শেষ চার মাস আমি বেশ কয়েকটি জনসভায় শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত ছিলাম। ঘূর্ণিঝড়-বিধ্বস্ত উপকূল এলাকা থেকে ফিরে এসে মওলানা ভাসানী পল্টন ময়দানে যে জনসভা করেন ২৩শে নভেম্বর ১৯৭০; তা শুনতে দৈনিক পাকিস্তান গ্রুপের অনেকের সঙ্গে আমিও স্টেডিয়ামের দোতলার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই। 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান' কথাটি সেদিন সেখানে প্রথম উচ্চারিত হয়। শুনে অনেকের মতোই কবি শামসুর রাহমান রোমাঞ্চিত হন। একাত্তরের ২১শে ফেব্রুয়ারি পল্টনে ছাত্রলীগের জনসভায় বন্ধুদের সঙ্গে আমি মঞ্চের কাছেই ছিলাম। সেখান থেকে বাংলাদেশের স্বাধিকারের কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়। ছাত্রলীগের ৩রা মার্চের জনসভায়ও বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনি। সর্বশেষ যে স্মরণীয় জনসভাটিতে আমি উপস্থিত ছিলাম, সেটি ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি বন্দিশালা থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের দিন।

৭ই মার্চ রক্তের অক্ষরে লেখা একটি দিন। তবে জাতির জীবনে ৭ই মার্চ হঠাৎ আসেনি। তার আছে এক দীর্ঘ পটভূমি।

সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পর থেকেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এবং কেন্দ্রের সামরিক-বেসামরিক আমলাচক্র চঞ্চল হয়ে ওঠে। তাদের দুরভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষও উদাসীন ছিল না। বঙ্গবন্ধুও বুঝতে পারছিলেন পাকিস্তানি সামরিকজান্তার কুচক্রী মনোভাব। ইয়াহিয়া-ভুট্টো ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে সমস্ত জানুয়ারি মাসটিকে কাজে লাগান। ১২ই জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকা আসেন তাঁর উপদেষ্টাদের নিয়ে। তিনি ছয় দফার

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ চান। অতি সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া সত্ত্বেও তিনি সন্তুষ্ট হন না। এরপর জানুয়ারির শেষ হপ্তায় ভুট্টো আসেন তাঁর দলের নেতাদের নিয়ে শেখ মুজিবের সঙ্গে ছয় দফা বিষয়ে আলোচনার জন্য। তাঁর কাছে ছয় দফা বিচ্ছিন্নতাবাদী এজেন্ডা। এরপর ১১ই ফেব্রুয়ারি ইসলামাবাদে ইয়াহিয়া-ভুট্টো দীর্ঘ আলোচনা করেন। ১৩ই ফেব্রুয়ারি ইয়াহিয়া এক ঘোষণায় ৩রা মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। ভুট্টো জানিয়ে দেন, তিনি ঢাকায় আসবেন না, কারণ ঢাকা এলে তাঁকে বাঙালিরা মেরে ফেলবে। ফেব্রুয়ারিতে পশ্চিম পাকিস্তানের আরো নেতা ঢাকায় এসে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করেন। তাঁদের মধ্যে সিন্ধুর জাতীয়তাবাদী নেতা জিএম সৈয়দও ছিলেন। তিনি করাচি গিয়ে ২০শে ফেব্রুয়ারি বলেন, তিনি শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনা করেছেন, ছয় দফায় পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ক্ষতিকর কিছু নেই।

মানুষের জীবনের কিছু কিছু স্মৃতি কোনোদিনই ম্লান হয় না। পাকিস্তান আমলের শেষ একুশে ফেব্রুয়ারির কথা আমার মনে পড়ে। সে ছিল এক অন্যরকম শহিদ দিবস। হাজার হাজার মানুষ রাত ১০টার পর থেকে শহিদমিনার ও আজিমপুর কবরস্থানে যেতে থাকেন। সেই লাখো জনতার মধ্যে বঙ্গবন্ধুও ছিলেন। রাত ১২টা ১ মিনিটে তিনি শহিদদের কবরে ফাতিহা পাঠ করেন এবং কবরে ফুল দেন। সেখান থেকে তিনি খালি পায়ে হেঁটে আসেন শহিদমিনারে। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল সে রাতে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে হেঁটে শহিদমিনারে আসার। সে রাতে তিনি শহিদমিনারে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন। তিনি বলেছিলেন, 'বাংলাদেশ কারও বাজারও হবে না, কারও কলোনিও হবে না। বাহান্নতে তারা আমাদের ছেলেদের হত্যা করেছে। তাঁরা শহিদ। এবারের সংগ্রামে আমরা হব গাজী।'

একাত্তরের ৩রা জানুয়ারি আওয়ামী লীগের নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের রেসকোর্সে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানেও আমি উপস্থিত ছিলাম। নৌকার আকারে বিরাট মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল। শপথগ্রহণ পরিচালনা করেন বঙ্গবন্ধু। সেখানে পরিবেশিত হয়েছিল 'আমার সোনার বাংলা' এবং বেশকিছু গণসংগীত।

১লা মার্চ পূর্বাণী হোটেলে আওয়ামী লীগের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সংসদীয় দলের সভা চলছিল। তখনই রেডিওতে ঘোষণা করা হয়, ৩রা মার্চ যে অধিবেশন বসার কথা, তা প্রেসিডেন্ট মুলতবি করেছেন। আমি তখন ওই হোটেলের কয়েক গজ দূরে সিকান্দার আবু জাফরের সমকাল অফিসে আড্ডা দিচ্ছিলাম। হঠাৎ মতিঝিল, জিন্নাহ এভিনিউ (ওই দিনই এর নামকরণ হয় বঙ্গবন্ধু এভিনিউ) এবং দৈনিক বাংলার দিক থেকে মুহুর্মুহু স্লোগান শুনতে পাই: 'জাগো জাগো বাঙালি জাগো', 'তোমার দেশ আমার দেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ' প্রভৃতি। বেরিয়ে দেখি রাস্তায় হাজার হাজার মানুষ। অনেকের হাতে লাঠিসোঁটা।

তাৎক্ষণিক এক সংবাদ সম্মেলনে অধিবেশন মুলতবির প্রতিক্রিয়ায় বঙ্গবন্ধু বলেন, 'এ এক সুদীর্ঘ ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতি'। তিনি পরদিন ঢাকায় এবং ৩রা মার্চ সারাদেশে হরতালের ঘোষণা দেন। তিনি জানিয়ে দেন, ৭ই মার্চ রেসকোর্সে এক সমাবেশে 'বাংলার মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার অর্জনের কর্মসূচি ঘোষণা' করা হবে। ১লা মার্চ থেকেই ৭ তারিখের জন্য মানুষ রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে থাকে। তখন থেকে রাজনীতি শুধু আর আওয়ামী লীগের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। সব দলমতের মানুষই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পাকিস্তানি সামরিকজান্তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।

তখন রমনা পার্ক ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মাঝখানে মওলানা ভাসানী রোড এখনকার মতো প্রশস্ত ছিল না। সোহরাওয়ার্দীর দিকেও শতবর্ষী সেগুন ও মেঘশিরীষ ছিল কয়েকটি। উদ্যানটি ফাঁকা। সমাবেশের নির্ধারিত সময় ছিল বেলা দুইটা। বেলা সাড়ে ১১টার সময় কমলাপুর জসীমউদদীন রোড থেকে আমি গিয়ে দেখি রেসকোর্স এক জনসমুদ্র। কোনোরকমে আমি ঠাঁই পাই ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের উলটো দিকে এক গাছের তলায়, যে গাছের ডালেও বসেছিল কয়েকজন। জনতার ভিড়ে ৩২ নম্বর থেকে সভামঞ্চে আসতে বঙ্গবন্ধুর ঘণ্টা খানেক দেরি হয়। প্রথাগত জনসভা নয়, একমাত্র বক্তা বঙ্গবন্ধু। জনতার শ্বাসরুদ্ধকর অপেক্ষার সমাপ্তি ঘটে। উচ্চারিত হয়: 'ভায়েরা আমার...।'

সেদিন তিনি কী বলেছিলেন, দেশের মানুষের আজ তা মুখস্থ। ভাষণে একটি শব্দও নেই অপ্রাসঙ্গিক। একটি বাক্যও নেই অন্যায্য। ভাষণের শুরুতেই তিনি কয়েকবার 'দুঃখ' শব্দটি উচ্চারণ করেছেন। বাস্তবিক পক্ষেই সেদিন তিনি 'দুঃখ-ভারাক্রান্ত মন নিয়ে' জনতার 'সামনে হাজির' হয়েছিলেন। কারণ, সাধারণ মানুষের ওপর সামরিকজান্তার নির্মম অত্যাচার। বঙ্গবন্ধু তাঁর আন্দোলনের পটভূমি জনতার সামনে তুলে ধরেন। তবে তা বিশুদ্ধ বইয়ের ভাষায় নয়, জনগণের মুখের ভাষায়। পাকিস্তানি শাসকদের সঙ্গে কখন তাঁর কী বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, তা জনগণকে জানান। পাকিস্তানের 'মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে' তাঁর দায়িত্ব বিরাট, তাই তিনি সবার সঙ্গে 'আলোচনা' ও 'আলাপ' করে 'শাসনতন্ত্র তৈয়ার' করার কথা বলেন।

ভাষণে তিনি যে চারটি শর্ত দেন, তারচেয়ে ন্যায়সংগত দাবি ওই পরিস্থিতিতে হতে পারত না।

১. সামরিক আইন প্রত্যাহার
২. সামরিকবাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া
৩. সব হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করা
৪. নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর।

সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ কথাটি ছিল: 'আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না, এ দেশের মানুষের অধিকার চাই।' আর একটি প্রত্যয় ঘোষিত হয়েছিল: 'সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না।'

বঙ্গবন্ধু সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক ধারার জননেতা, গেরিলা যুদ্ধের বিপ্লবী নেতা নন। তাঁর ক্ষমতার উৎস জনগণ, বন্দুকের নল নয়। সেদিনের ভাষণের বিষয়বস্তুর বিকল্প আর কী হতে পারত? তাঁর পক্ষে কি বলা সমীচীন হতো: 'আমি ঘোষণা দিচ্ছি, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন।' অমন দায়িত্বজ্ঞানহীন কথা তিনি বলেননি। কারণ, পাকিস্তানের ভৌগোলিক ও অন্যান্য বাস্তবতায় তা তিনি দিতে পারেন না। তা দিলে বাংলাদেশ হতো নাইজেরিয়ার বায়াফ্রা। আবেগের বশে স্বাধীনতার ঘোষণা দিলে দেশের ৪০ থেকে ৯০ ভাগ মানুষের সমর্থন পেলেও পৃথিবীর সমর্থন পেতেন না– এমনকি ভারতেরও নয়।

বঙ্গবন্ধু সঠিকভাবেই বলেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।' তিনি বলেছিলেন, স্বাধীনতাই আমাদের লক্ষ্য। তার জন্য আজ থেকে সংগ্রাম শুরু হলো। স্বাধীনতা কারো হাতে তুলে দেওয়ার জিনিস নয়, তা সংগ্রাম ও ত্যাগের মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। তার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছিল ৭ই মার্চের ভাষণে।

লেখক : সাংবাদিক, কলামিস্ট ও গবেষক

মুক্তিযুদ্ধে আমাদের মিত্ররা

শামসুজ্জামান শামস

উনিশ'শ একাত্তর সালে সংঘটিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এক অনন্য ঘটনা। কেননা ঠান্ডাযুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশ বিশ্বের একমাত্র দেশ, যে দেশটি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। তাই মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের জনসাধারণের আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন হলেও ঠান্ডাযুদ্ধের কারণে সেটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়। এর বড়ো প্রমাণ হচ্ছে এই যে, পাকিস্তানের পক্ষে তথা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের প্রকাশ্যে অবস্থান গ্রহণ, অন্যদিকে মুক্তিকামী বাংলাদেশের জনগণের পক্ষে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সুস্পষ্ট সমর্থন জানায়। বিশ্ব ইতিহাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম দেশ ভুটান। একাত্তরের ৬ই ডিসেম্বর ভুটানের তৎকালীন রাজা জিগমে দর্জি ওয়াংচুক স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি জানিয়ে বলেছিলেন, বিদেশি দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বাংলাদেশের জনগণের মহান এবং বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম অদূর ভবিষ্যতে সাফল্য লাভ করবে। ভুটানের জনগণ এবং তার প্রত্যাশা– সৃষ্টিকর্তা বর্তমান বিপদ থেকে বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করবেন, যেন তিনি দেশের পুনর্গঠন এবং উন্নয়নের মহান কর্তব্যে দেশ ও দেশের মানুষকে নেতৃত্ব দিতে পারেন।

বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী দ্বিতীয় দেশ ভারত। ১৯৭১ সালের ৬ই ডিসেম্বর ভারত সরকারের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয় বাংলাদেশ সম্পর্কে কূটনৈতিক স্বীকৃতি। বেলা ১১টায় 'অল ইন্ডিয়া রেডিও' মারফত ঘোষণা করা হলো যে, ভারত বাংলাদেশকে সার্বভৌম রাষ্ট্র বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। তখনকার ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। ভারতের পার্লামেন্টের বিশেষ অধিবেশনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তাব উত্থাপন করে ইন্দিরা গান্ধী বলেন,'বাংলাদেশের সব মানুষের ঐক্যবদ্ধ বিদ্রোহ এবং সেই সংগ্রামের সাফল্য এটা ক্রমান্বয়ে স্পষ্ট করে তুলেছে যে, তথাকথিত মাতৃরাষ্ট্র পাকিস্তান বাংলাদেশের মানুষকে স্বীয় নিয়ন্ত্রণে ফিরিয়ে আনতে সম্পূর্ণ অসমর্থ।' লোকসভায় দাঁড়িয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেন, 'স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে বিশাল বাধার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণের সংগ্রাম এক নতুন অধ্যায় রচনা করেছে। সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করার পর ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।' ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বক্তব্য শেষ না হতেই ভারতের সংসদ সদস্যদের হর্ষধ্বনি আর 'জয় বাংলাদেশ' ধ্বনিতে ফেটে পড়েন তারা। ৪ঠা ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির জন্য বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ যুগ্মভাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে অনুরোধ জানিয়ে একটি পত্র পাঠান। বাংলাদেশ সরকারের ৪ঠা ডিসেম্বরের পত্রের জবাবে ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়ে যে পত্র প্রেরণ করেন তার আংশিক বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ :

'সত্যের জয় হোক, প্রধানমন্ত্রী, নয়াদিল্লি, ডিসেম্বর ৬, ১৯৭১– প্রিয় প্রধানমন্ত্রী, মহামান্য অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও আপনি ৪ঠা ডিসেম্বর আমাকে যে বাণী পাঠিয়েছেন তাতে আমি ও ভারত সরকারের আমার সহকর্মীরা গভীরভাবে অভিভূত হয়েছি। এই পত্র পাওয়ার পর আপনার বিচক্ষণ নেতৃত্বে পরিচালিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি স্বীকৃতি দেয়ার অনুরোধ ভারত সরকার ফের বিবেচনা করেছে। আমি সানন্দে জানাই যে, বর্তমানে বিরাজিত পরিস্থিতির আলোকে ভারত সরকার স্বীকৃতি অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আমি একটি অনুলিপি সংযুক্ত করছি। আপনার বিশ্বস্ত ইন্দিরা গান্ধী।'

বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম আরব দেশ ইরাক। ১৯৭২ সালের ৮ই জুলাই তৎকালীন ইরাকের প্রেসিডেন্ট আহমেদ হাসান আল বকরের শাসনকালে এ স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম আফ্রিকান দেশ সেনেগাল। সেনেগাল সরকার ১৯৭২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। তখন সেনেগালের প্রেসিডেন্ট ছিলেন সেনঘর। বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম অনারব দেশ মালয়েশিয়া। মালয়েশিয়াও বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয় ১৯৭২ সালে। দিনটি ছিল ২৫শে ফেব্রুয়ারি। বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম ইউরোপের দেশ পোল্যান্ড। ১৯৭২ সালের ১২ই জানুয়ারি পোল্যান্ড সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবেও নাম আছে পোল্যান্ডের।

বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম উত্তর আমেরিকান দেশ কানাডা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আমেরিকার কোনো সহযোগিতা বাংলাদেশ পায়নি, বরং বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধী দেশই ছিল আমেরিকা। তবে উত্তর আমেরিকান দেশ হিসেবে প্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল কানাডা, ১৯৭২ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি। এ সময় কানাডার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন পিয়েরে ট্রুডো। ১৯৭৩ সালের মার্চ পর্যন্ত ৯৮টি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর হত্যার আগ পর্যন্ত ১০৪টি দেশ (প্রায় সব দেশ সৌদি আরব, চীন এবং ওমান ছাড়া) বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল।

অবশেষে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর ১৯৭৫ সালে সৌদি আরব ও চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। চীন স্বীকৃতি দেয় ১৯৭৫ সালের ৩১শে আগস্ট। সৌদি আরবের না দেওয়ার কারণ হিসেবে 'হিন্দু দেশের মদদে দুনিয়ার সবচেয়ে বড়ো মুসলিম দেশকে ভাঙার' আর চীনের কারণ হিসেবে 'অখণ্ড পাকিস্তান নীতি' উল্লেখ করা হয়। ওমান স্বীকৃতি দেয় ১৯৭৫ সালের ১৭ই আগস্ট।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন এ অঞ্চলের বাঙালিদের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। বাঙালি জনগণ হাজার হাজার বছর ধরে পরাধীনতার শিকলে বন্দি ছিল। বাঙালিদের মরণপণ আন্দোলন, সংগ্রাম ও যুদ্ধের মধ্য দিয়ে লাখ লাখ মানুষের জীবন উৎসর্গ ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে আমাদের এই চরম এবং পরম পাওয়া স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সাহস ও নেতৃত্বের সততায় বাঙালিরা স্বাধীনতা পেয়েছে। আমেরিকা, চীন ও যুক্তরাজ্য–এসব শক্তিধর দেশের চরম বিরোধিতার মুখে ভারত, রাশিয়া এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের সহযোগিতায় আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি এবং সেইসঙ্গে দেশের সর্বস্তরের মানুষ– কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, জনতার অকুণ্ঠ সমর্থন ও মুক্তিযুদ্ধের মহামন্ত্রে উজ্জীবিত হওয়ার কারণে এই বিশাল অর্জন ও প্রাপ্তি। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা লাভ ছিল আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন। স্বাধীনতা লাভের মধ্য দিয়ে আমরা ভৌগোলিক সীমানা পেয়েছি। বাংলা হয়েছে স্বাধীন রাষ্ট্রের ভাষা। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীর বর্বরতা-নৃশংসতা হিটলার-নাদির শাহকেও হার মানায়। এত মৃত্যু, এত বীভৎসতা, এত বেদনা আমরা অতীতে কখনো দেখিনি। ভবিষ্যতেও এতটা কখনো দেখব বলে মনে হয় না। তবু একাত্তর আমাদের গর্বের, গৌরবের ও আনন্দের। কারণ স্বাধীনতার চেয়ে বড়ো কিছু আর কী হতে পারে। দেখতে দেখতে আমরা মহান স্বাধীনতার ৪৭ বছরে পদার্পণ করেছি। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাত্রে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং ১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত তাদের সেই বর্বরোচিত কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছিল। এর ভিতরে পাকিস্তানি সৈন্য এবং তাদের এদেশীয়

দালালদের দ্বারা পরিচালিত গণহত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, অগ্নিকাণ্ডের মতো লোমহর্ষক কর্মকাণ্ড ঘটেছিল সারা দেশব্যাপী।

১৯৭১ সালে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে একটি আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভারতের সামরিকবাহিনী তথা যৌথবাহিনী পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে স্পষ্টভাবে পরাজিত করতে সক্ষম হয় এবং চূড়ান্ত বিজয় আসার আগেই ভারত ৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। বাংলাদেশের মানুষকে মুক্তিযুদ্ধের সময় নিজের দেশে আশ্রয় দেওয়া, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া, মুক্তিযুদ্ধে সেনা সহায়তা দেওয়াসহ সব ধরনের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ মদদ দিয়েছিল ভারত।

ভারতের পর আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো মিত্রশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে রাশিয়া সক্রিয়ভাবে বাংলাদেশকে সহযোগিতা করে। চট্টগ্রাম বন্দর থেকে মাইন ও ধ্বংসাবশেষ অপসারণে রাশিয়ার অনেককে জীবন দিতে হয়েছে। কেবল আমাদের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধেই নয়, বাংলাদেশের পুনর্বাসন কাজেও সোভিয়েত ইউনিয়ন আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার আট দিনের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৭১-এর ৩রা এপ্রিল পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে লেখা সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগোনির চিঠিটি দারুণ গুরুত্বপূর্ণ। সেই চিঠিতে শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রেফতারের খবরে উদ্বেগ, শক্তি ব্যবহার না করে রাজনৈতিক পথেই সংকট মোকাবিলার পরামর্শ ও মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার কথা ছিল। ২৫শে মার্চ গণহত্যার পর প্রথম প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল ভারত। দ্বিতীয়টি সোভিয়েত ইউনিয়ন। সোভিয়েত পত্রপত্রিকা, প্রচারমাধ্যমগুলোও বাংলাদেশে পাকিস্তান বাহিনীর নির্যাতনের কাহিনি ও মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি প্রচার করে বিশ্ব জনমত সৃষ্টিতে সহায়তা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের পক্ষে জাতিসংঘে যুদ্ধ বন্ধের প্রস্তাব বাতিল করে দেয়। জবাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বঙ্গোপসাগরে অষ্টম নৌবহর পাঠাবে বলে হুংকার দিয়ে আমেরিকাকে সতর্ক করে দেয়। বিশ্বের আরো বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান যেমন– কিউবা, যুগোস্লাভিয়া, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, পূর্ব জার্মানি প্রভৃতি তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলন এবং যুদ্ধকে সমর্থন করেছে। ইংল্যান্ড বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অন্যতম বন্ধু ছিল। নিরাপত্তা পরিষদে ইংল্যান্ড ভোটদানে বিরত থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন জানিয়েছে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে ব্রিটেনের প্রচারমাধ্যম বিশেষ করে বিবিসি এবং লন্ডন থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকা বাঙালিদের ওপর পাক হানাদারবাহিনীর নির্যাতন, প্রতিরোধ, বাঙালিদের সংগ্রাম, ভারতে আশ্রয় নেয়া শরণার্থীদের করুণ অবস্থা, পাকবাহিনীর গণহত্যা এবং মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি সম্পর্কে বিশ্বজনতাকে জাগ্রত করে তোলে। ব্রিটিশ সরকারও আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে খুবই সহানুভূতিশীল ছিল। উল্লেখ্য, লন্ডন ছিল বহির্বিশ্বে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারের প্রাণকেন্দ্র। তাছাড়া লন্ডনে জন্মগ্রহণকারী বিখ্যাত সংগীত শিল্পী জর্জ হ্যারিসন মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে বিশ্ব জনমত সৃষ্টি ও দান সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে ৪০ হাজার লোকের সমাগমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ডভিত্তিক গান পরিবেশন করেন।

তাছাড়া, ইংল্যান্ড বিচারপতি আবু সাইয়িদ চৌধুরীকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠন করতে অনেক সাহায্য-সহযোগিতা করেছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ব্রিটিশ গণমাধ্যমের ভূমিকাও বেশ জোরালো ছিল। ব্রিটেনের ডেইলি টেলিগ্রাফ, গার্ডিয়ান, নিউ স্টেটসম্যান, টাইমস, ইকনোমিস্ট, সানডে টাইমস, অবজারভার, বিবিসিসহ বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য গণমাধ্যম মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তানি সামরিকবাহিনীর গণহত্যা, নির্যাতন ও বাঙালিদের দুর্দশা বহির্বিশ্বের কাছে তুলে ধরে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ব্রিটিশ গণমাধ্যমের সংবাদগুলো ছিল বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল। বাংলাদেশে গণহত্যা শুরুর পর পরই ৩১শে মার্চ 'ম্যাসাকার ইন পাকিস্তান' ('পাকিস্তানে হত্যাকাণ্ড') শিরোনামে গার্ডিয়ানে সংবাদ ছেপেছিল। এপ্রিল মাসের ২ তারিখে নিউ স্টেটসম্যান 'উইপ ফর বাংলাদেশ' ('বাংলাদেশের জন্য কাঁদো') শিরোনামে একটি হৃদয়স্পর্শী সংবাদ প্রকাশ করে। এভাবে মুক্তিযুদ্ধের পুরোটা সময় ব্রিটিশ গণমাধ্যম বিভিন্ন হৃদয়স্পর্শী ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদের মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত তৈরি করেছিল।

অস্ট্রেলিয়া, পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান ও কানাডার প্রচারমাধ্যমগুলো পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে বিশ্ব জনমত সৃষ্টিতে সাহায্য করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ, প্রচারমাধ্যম এবং কংগ্রেসের অনেক সদস্য এদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সোচ্চার ছিলেন। মুসলিম এবং আরব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম দিকের রাষ্ট্রগুলোর একটি মিসর। মিসরের মিডিয়াতেও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সমর্থনে লিখেছেন অনেকেই। ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে কায়রোর আধা সরকারি সংবাদপত্র আল আহরামে সম্পাদক ড. ক্লোভিস মাসুদ ভারত থেকে শরণার্থীদের নিরাপদ এবং নিঃশর্তভাবে দেশে ফেরার একটি ব্যবস্থা করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে তাগিদ দেন। এর পাশাপাশি একটি গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমাধানের কথাও বলেন।

কনসার্ট ফর বাংলাদেশ: পণ্ডিত রবিশঙ্করের অনুরোধেই জর্জ হ্যারিসন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে ১৯৭১ সালের ১লা আগস্ট ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনের 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'-এর পুরো দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। সেই কনসার্টই মানবতার জন্য সংগীতের প্রথম সফল বড়ো আয়োজন।

সেদিনের অনুষ্ঠানে জর্জ হ্যারিসন হাজার হাজার শ্রোতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে শুরুতেই বলেছিলেন, ভারতীয় সংগীত আমাদের চেয়ে অনেক গভীর। তারপর তিনি পণ্ডিত রবিশঙ্কর, ওস্তাদ আলী আকবর খান ও সহশিল্পীদের পরিচয় করিয়ে দেন। সেদিন কনসার্টের শুরুতেই পণ্ডিত রবিশঙ্কর এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেছিলেন, 'প্রথম ভাগে ভারতীয় সংগীত থাকবে। এজন্য কিছু মনোনিবেশ দরকার। পরে আপনারা প্রিয় শিল্পীদের গান শুনবেন। আমাদের গানে শুধুই সুর নয়, এতে বাণী আছে। আমরা শিল্পী, রাজনীতিক নই। বাংলাদেশে অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা ঘটছে। বাংলাদেশের পল্লিগীতির সুরের ভিত্তিতে আমরা বাজাবো 'বাংলা ধুন'।' কনসার্ট ফর বাংলাদেশ-এর জন্যই পণ্ডিত রবিশঙ্কর বিশেষভাবে 'বাংলা ধুন' নামের এই সুর সৃষ্টি করেছিলেন। সেটা দিয়েই ওস্তাদ আলী আকবরের সঙ্গে যুগলবন্দিতে কনসার্ট শুরু হয়েছিল। তাদের সঙ্গে তবলায় ওস্তাদ আল্লারাখা আর তানপুরায় ছিলেন কমলা চক্রবর্তী। ১৯৭১ সালের ১লা আগস্ট নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে সেদিন 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' অনুষ্ঠান দেখতে ও শুনতে প্রায় ৪০-৫০ হাজার দর্শক অনুষ্ঠানে সমবেত হয়েছিলেন। ওই অনুষ্ঠান থেকে সংগৃহীত ২,৪৩,৪১৮.৫০ ডলার ইউনিসেফের বাংলাদেশের শিশু সাহায্য তহবিলে দেওয়া হয়েছিল। পণ্ডিত রবিশঙ্কর ভেবেছিলেন ২৫ থেকে ৫০ হাজার ডলার সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। কিন্তু জর্জের ভাবনায় ছিল বিটলসের দর্শন, অর্থাৎ 'যা করব তা বড়ো করে করব' এবং সেটাই হয়েছিল।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

৭ই মার্চ

অবিনাশী কথামালার জন্মদিন

যতীন সরকার

আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে

কবি জীবনানন্দ দাশের জননী কুসুম কুমারীর একটি কবিতার এই ছত্র দুটোকে ছেলেবেলাতেই আমাদের মনে গেঁথে দেওয়া হয়েছিল। বাঙালিরা যে কথা বলতেই পটু, কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা এমন কথাকেও আমরা স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলে মেনে নিয়েছিলাম। কথার বদলে আমাদের সবাইকেই কাজের মানুষ হয়ে উঠতে হবে এমন অনুজ্ঞারও আমরা বিরোধিতা করিনি।

কিন্তু পরিণত বয়সে আমার মনে হয়েছে কথা ও কাজের এ রকম জল-অচল বিভাজন করে দেওয়া মোটেই ঠিক নয়। অন্তত 'কথার কথা' ও 'কাজের কথা'র পার্থক্যটি সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকতেই হবে। 'কথার কথা' জলবুদবুদের মতোই ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু 'কাজের কথা' বর্তমানকে অতিক্রম করে সুদূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত তার বিভা ছড়িয়ে যেতে থাকে।

কথার কথা বলা হয় নিতান্তই অভ্যাসের বশে, এর পেছনে কোনো সচেতন ভাবনা বা দায়িত্ববোধ থাকে না। এ রকম কথাসর্বস্ব মানুষ যারা, তাদেরকেই বলে 'বাচাল'। বাচালরা সবারই ধিক্কারের পাত্র। কবি কুসুম কুমারীও 'কথায় বড়ো' বাচালদের ধিক্কার জানিয়ে একান্ত মনে কামনা করেছেন যে, দেশে 'কাজে বড়ো' মানুষ বা কাজের মানুষদের আবির্ভাব ঘটুক।

কিন্তু যাদের মুখে কথা নেই তারাই হলো কাজের মানুষ– এমন কথাও মোটেই ঠিক নয়। বাচালরাও যেমন ধিক্কারের পাত্র, তেমনই সবসময় মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকে যে মানুষ সে মানুষও প্রশংসায় ভূষিত হতে পারে না। কাজ করতে হলে তো অবশ্যই চিন্তা করতে হয় এবং সেই মূর্তিহীন চিন্তাই কথার মধ্য দিয়ে মূর্তিমান হয়ে ওঠে, কথার সেই মূর্তিগুলোই প্রাণ পায় কাজের মধ্যে। কথার আধারে কাজের লক্ষ্য ও লক্ষ্যে পৌঁছার পরিকল্পনাকে সূত্রবদ্ধ করে না নিয়ে সত্যিকার কোনো কাজই করা সম্ভব নয়। কথা আসে চিন্তা থেকে, কথার আধারেই চিন্তা আশ্রয় নেয়, সেই চিন্তাই কথা হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে এবং তখন সেই কথাকেই রূপ দিতে হয় কাজে। এরকম প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে না গিয়ে কোনো ব্যক্তিই কাজের মানুষ হতে পারে না। এ কথাটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন সত্য, তেমনই সত্য সমষ্টি তথা যে-কোনো জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও।

জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই বরং কথাটি অনেক বেশি সত্য। অনেক অনেক ব্যক্তির সমবায়েই তো গড়ে ওঠে একেকটি জনগোষ্ঠী। পৃথক পৃথক ব্যক্তির ভাব-ভাবনাগুলো সম্মিলিত হয়েই পরিণত হয় সমষ্টিবদ্ধ জনগোষ্ঠীর ভাবনায়। প্রতিটি জনগোষ্ঠীর ভাবনাতেই থাকে আত্মপ্রতিষ্ঠ হওয়ার আকুল আকুতি। সেই আকুতি গোষ্ঠীর বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত রূপে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। গোষ্ঠীর সেই আকুতিটি সুনির্দিষ্ট ও সংহত কথার মধ্যে রূপ পেতে চায়। কিন্তু সেই চাওয়াটি খুব সহজে পাওয়ায় পরিণত হয় না। সেই কাঙ্ক্ষিত কথাটির জন্ম হওয়ার জন্য শত শত বছরও লেগে যেতে পারে। তারপর কোনো এক শুভ দিনে গণমনে যুগ যুগ লালিত সেই আকুতিটি অস্ফুট ভাবনার নির্মোক ভেঙে পরিস্ফুট ভাষা হয়ে বেরিয়ে আসে, জন্ম নেয় অসীম শক্তিধর অবিনাশী এক কথা বা কথামালা। সমগ্র জনগোষ্ঠীর অন্তর-মথিত সেই কথা বা কথামালা নিঃসৃত হয় যার মুখ থেকে, তিনি শুধু তখন একজন কথাকার হয়ে থাকেন না, হয়ে ওঠেন সেই জনগোষ্ঠীর পরিত্রাতা ও ভয়ত্রাতা।

এরকমটি হয়ত সর্বত্রই ঘটে, তবে সর্বত্র একইভাবে ঘটে না। অন্তত বাংলাদেশে যেভাবে ঘটেছে, এমনভাবে একটি নির্দিষ্ট দিনে জনগণ কাঙ্ক্ষিত কথামালার জন্ম বোধহয় কোনো দেশেই ঘটেনি, কোনো দেশের মানুষেরই সম্ভবত এমন 'কথামালার জন্মদিন' পালনের সৌভাগ্য হয়নি। এদেশের মানুষের বহুযুগ লালিত বিমূর্ত আকাঙ্ক্ষাটি মূর্ত কথামালা হয়ে জন্ম নিয়েছে যে বিশেষ দিনে, সে দিনটি ৭ই মার্চ। বছরের তিনশ পঁয়ষট্টি দিন থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট একটি দিন–একটি অসাধারণ কথামালার জন্মদিন। কথামালার এই জন্মদিনটি যেমন অবিস্মরণীয়, তেমনই অবিস্মরণীয় এই কথামালার জন্মদাতা শেখ মুজিবুর রহমান। বঞ্চিত বঙ্গজনের পরিত্রাতা ও ভয়ত্রাতা রূপেই যিনি বঙ্গবন্ধু।

হাজার বছর ধরে এদেশের লোক সাধারণ স্বাধিকার বঞ্চিত হয়ে থেকেছে, নানা ধরনের অধীনতার বাঁধন তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। সেই বঞ্চনা থেকে, বাঁধন থেকে মুক্তির স্পৃহা তাদের ভেতরে গুমড়ে গুমড়ে মরেছে ঠিকই, কিন্তু মুক্তির পথ তারা খুঁজে পায়নি। তাই বলে খোঁজার প্রয়াস থেকে তারা বিরতও থাকেনি। তাদের অবিরাম প্রয়াসে অনেক রক্ত ঝরেছে, সে প্রয়াস অনেক খণ্ড খণ্ড সার্থকতারও জন্ম দিয়েছে, কিন্তু সার্থকতার শীর্ষবিন্দুটিকে স্পর্শ করতে পারেনি। শুধু তাই নয়, তাদের 'চাওয়া'র বিষয়টিও নিজেদের কাছে ছিল একান্ত ধোঁয়াটে; তাদের ভাবনা ছিল, কিন্তু সেই ভাবনা তাদের চিত্তলোকে কোনো মূর্তি পরিগ্রহ করতে পারেনি; তাদের বিমূর্ত বিক্ষিপ্ত ভাবনা বা চিন্তা সুনির্দিষ্ট কথামালায় মূর্ত ও সংহত হয়ে উঠতে পারেনি। আবহমান বাংলার লোকসাধারণের এরকম ভাবনাই সব অস্পষ্টতা ও অমূর্ততার কুয়াশা ভেদ করে একাত্তরের ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠ থেকে জন্ম নিল চির কাঙ্ক্ষিত ও সংহত কথামালা। সে কথামালার প্রাণজীবকে ধারণ করে এর শেষ বাক্যগুলো–

> রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব/এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

হ্যাঁ, অবশ্যই শেখ মুজিবের মতো বিশেষ একজন মানুষের কণ্ঠ-নিঃসৃত ছিল এই কথামালা। তবু কিন্তু এই কথামালা কোনো ব্যক্তি মুজিবের নয়, সব মুক্তিকামী বঙ্গজনের। অতীতের হাজার বছরের অগণিত বঙ্গজনের অমূর্ত ভাবনাই মূর্ত ভাষার রূপ ধারণ করে এই কথামালার জন্ম হয়েছিল সেদিন। তাই দেখি, মুজিবের যারা কট্টর বিরোধী বা কঠোর সমালোচক ছিলেন, অথচ অন্তর-গভীরে লালন করতেন মুক্তির আকুতি, তারাও সেদিন মুজিবের বজ্রকণ্ঠের আহ্বানেই সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে' তুলতে প্রাণিত হয়ে উঠেছিলেন। বাংলার স্বাধীনতা যাদের কাম্য ছিল না, সেই স্বদেশদ্রোহী স্বজাতিবিদ্বেষী কুলাঙ্গাররাও সেদিন এই আহ্বানের প্রকাশ্য বিরোধিতা করার সাহস পায়নি। এমনকি সেদিনকার পাকিস্তানের চরম প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলোও অনেক নরম সুরে কথা বলতে বাধ্য হয়েছিল।

আসলে 'জাতির উত্তরণ' নয়, মুক্তিসংগ্রামীদের রোষের হাত থেকে নিজেদের চামড়া বাঁচানোই তখন অনেকের জন্য আশু প্রয়োজন হয়ে দেখা দিয়েছিল। কারণ তারা দেখতে পেরেছিল যে ৭ই মার্চে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে যা উচ্চারিত হয়েছে তা মোটেই 'কথার কথা' নয়, জাতির হৃদয়-নিংড়ানো 'কাজের কথা' এবং এই কাজের কথার মাধ্যমে পুরো দেশের মানুষই 'কথায় না বড় হয়ে' কবি-কাঙ্ক্ষিত 'কাজে বড়' হয়ে উঠেছে। সেই মানুষেরা বুঝে ফেলেছে যে, 'কেউ তাদের দাবায়ে রাখতে' পারবে না। তাই 'যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে তারা শত্রুর মোকাবেলায়' ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তাদের সবার 'জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন' হয়ে গেছে। কবি নির্মলেন্দু গুণ যে সাতই মার্চের কথামালাকে 'কবিতা' ও তার কথাকারকে 'কবি' আখ্যা দিয়েছেন তাতে একটুও অতিকথন নেই। কবিতা ও কবি সম্পর্কে যেসব গতানুগতিক ধারণা পোষণে আমরা অভ্যস্ত, সেসব ধারণার মানদণ্ডে সাতই মার্চের কবিতা ও কবির মূল্যায়ন মোটেই সম্ভব নয়। অভ্যস্ত ধারণার বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে ওই কবিতাটির অসাধারণত্ব কোনোমতেই শনাক্ত করা যাবে না, চেনা যাবে না এর কবিকেও।

তবে একাত্তরে বঙ্গজনদের মুক্তিসংগ্রামকে নস্যাৎ করে দেওয়ার লক্ষ্যে শত্রুর পদলেহী আচরণ করেছিল যেসব জাতিদ্রোহী কুলাঙ্গার, তারা ৭ই মার্চের কবিতাটির মর্মবাণী মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছিল। কারণ ওই জ্ঞানপাপীরা তো পরাজিত হয়েছিল এই কবিতাটির অসীম শক্তিতে শক্তিমান মুক্তিসংগ্রামীদের হাতেই। তাই, পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে জ্ঞানপাপীরা আজ তাদের সব আক্রোশ ঢেলে দিচ্ছে ওই কবিতা ও তার কবির ওপর। ওরা ইতিহাস বিকৃতির উপকরণ সংগ্রহ করছে কবিতাটির বিকৃত ব্যাখ্যা-ভাষ্য থেকে এবং সেই বিকৃত ব্যাখ্যা-ভাষ্য দিয়েই অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কবির চরিত্র হননের।

৭ই মার্চের সেই কথামালায় অনেক স্পষ্ট কথা যেমন ছিল, তেমনই এমন অনেক ইঙ্গিত ছিল, যা স্পষ্ট কথার চেয়েও অনেক বেশি ব্যঞ্জনাবহ। ওইসব ব্যঞ্জনাই ওই কথামালাটিকে অবিস্মরণীয় কবিতায় পরিণত করেছিল। এ যেন কথাকে 'অর্থের বন্ধন হতে ভাবের স্বাধীন লোকে' পৌঁছিয়ে দেওয়া। কবিতার এরকম ব্যঞ্জনাময় 'রাজনৈতিক কৌশলের কাছে' সেদিন চূড়ান্ত মার খেয়েছিল 'পাকিস্তানি জেনারেলদের রণকৌশল'।

১৯৭২ সালে মার্কিন সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু তো স্পষ্ট করেই বলেছিলেন–

> ৭ই মার্চ যখন আমি ঢাকা রেসকোর্স মাঠে আমার শেষ মিটিং করি, ওই মিটিংয়ে উপস্থিত দশ লাখ লোক দাঁড়িয়ে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানকে 'স্যালুট' জানায় এবং ওই সময়ই আমাদের জাতীয় সংগীত চূড়ান্তরূপে গৃহীত হয়ে যায়।...
>
> আমি জানতাম কী ঘটতে যাচ্ছে, তাই আমি ৭ই মার্চ রেসকোর্স মাঠে চূড়ান্তভাবে ঘোষণা করেছিলাম এটাই স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য যুদ্ধ করার মোক্ষম সময়।...
>
> আমি চেয়েছিলাম, তারাই [অর্থাৎ পাকিস্তানি সেনাবাহিনী] প্রথম আমাদের আঘাত করুক। আমার জনগণ প্রতিরোধ করার জন্য প্রস্তুত।

সাতই মার্চের সেই অসীম শক্তিধর অবিনাশী কথামালার জন্মদিনটি হোক আমাদের কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে সর্বশক্তি নিয়োগ করার বজ্র শপথগ্রহণের দিন।

লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট

মুক্তিযুদ্ধের কবিতা কম্পিত স্বরের মূর্ছনা

সৌম্য সালেক

উনিশ'শ একাত্তরে সংগঠিত মুক্তিযুদ্ধে বিজয় ছিল বাঙালি জাতির হাজার বছরের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম আলোকিত অধ্যায়। তবে এই সংগ্রামের পেছনে রয়েছে বহু যুগের শোষণ, অপমান, বৈষম্য ও বঞ্চনার করুণ রক্তাক্ত অধ্যায়। ১৯৪৭-এর দেশ ভাগের পর থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত পাকিস্তান পর্বের ২৪ বছরের ইতিহাস অনিয়ম, বৈষম্য, বঞ্চনা ও নিপীড়নের আস্তরণে ঢাকা। অবশ্য বাঙালির ক্ষীণতা ও অনধিকারের ইতিহাস আরো দীর্ঘকালের বিভিন্ন অন্যায্য শাসনের করুণ কথকতায় পূর্ণ। তবে, বাঙালি ভীতু–এই জনশ্রুতিকে একাত্তরে আমরা সাহসের বীরমন্ত্রে লঙ্ঘন করতে পেরেছি; সেই ধ্বনি সুকান্তের কণ্ঠে শোনা যাক– 'একবার মরে ভুলে গেছে আজ মৃত্যুর ভয় তারা'। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনী যে গণহত্যা ও নির্যাতন চালিয়েছিল তা যেমন বিরল তেমনি বর্ণনাতীত। নিশ্চিহ্ন হওয়া থেকে জাতিসত্তাকে তথা মাতৃভূমিকে বাঁচাবার জন্য বাঙালি সেদিন প্রাণপণ লড়েছিল আর তাদের মাতৃপ্রেমকে শাণিত করতে ছিল রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্তসহ সমকালীন কবি ও শিল্পীদের নিরন্তর প্রচেষ্টা। এই সার্বিক প্রচেষ্টায় আমরা সফল হয়েছি এবং আজ উদ্‌যাপন করছি তারই লব্ধ-সুফল। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পটভূমি। একই সাথে স্বতন্ত্রভাবে রাষ্ট্রিক পরিচয় বহনেরও আতুরঘর। পুরোনো প্রতিবেশ ভাবনা থেকে নতুন আলোয় নতুন আয়তনে নিজকে দাঁড় করাবারও সূতিকাগার একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। তাই স্বাভাবিক অনিবার্যতায় আমাদের শিল্প-সাহিত্যে, কবিতায়, সংগীতে এর উপস্থিতি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং গুরুত্ববহ। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন যেমন মুক্তিকামীদের উৎসাহিতকরণে ও দৃশ্যপট বর্ণনা করে কবিতা এবং সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে সেই ধারা আজও সক্রিয়ভাবে সচল রয়েছে। কেউ কেউ মন্তব্য করে থাকেন, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে রচিত কবিতায় শিল্পের প্রয়োজনের তুলনায় সময়ের প্রয়োজন অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। এ বিষয়ে বলতে চাই– সময় যদি অনুভূতিকে আক্রান্ত করে, শিল্প সৃষ্টির সেটাই কি মহার্ঘ্য মুহূর্ত নয়! মুক্তিযুদ্ধের কবিতামালায় যুদ্ধের ঘনিষ্ঠ বর্ণনার পাশাপাশি ওঠে এসেছে গোটা বাংলাদেশের প্রকৃতি ও ভূগোলের অবিচ্ছিন্ন রূপরেখা যার মর্মমূল জুড়ে রয়েছে মাতৃভূমির প্রতি মমতা, প্রেম ও ভালোবাসায় একাকার এক মহাচিত্র। বিভিন্ন কবিদের বর্ণনা ও গ্রন্থনা থেকে সেই মহাচিত্রের সামান্যই আমরা তুলে আনতে সক্ষম। আমরা কবি জসীমউদ্‌দীনের কবিতায় পাই একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার সাহসের সমাচার, যিনি দেশকে দস্যুবিহীন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ–

আমি চলিয়াছি চির-নির্ভীক অবহেলি সব কিছু
নরমুণ্ডের ঢেলা ছড়াইয়া পশ্চাৎ-পথ পিছু।

এক অনলবর্শী বর্ণনায় 'বাংলা ছাড়ো' কবিতায় কবি সিকান্দার আবু জাফরের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে প্রতিবাদের প্রবল উচ্চারণ– 'রক্ত চোখের আগুন মেখে ঝলসে যাওয়া/ আমার বছরগুলো আজকে যখন হাতের মুঠোয়/ কণ্ঠনালীর খুনপিয়াসী ছুরি কাজ কি তবে আগলে রেখে বুকের কাছে/ কেউটে সাপের ঝাঁপি আমার হাতেই নিলাম আমার/ নির্ভরতার চাবি/ তুমি আমার আকাশ থেকে সরাও তোমার ছায়া/ তুমি বাংলা ছাড়ো।'

মুক্তিসংগ্রাম নিয়ে সবচেয়ে বেশি সফল কবিতা লিখেছেন কবি শামসুর রাহমান। সম্পত্তি, পথের কুকুর, তোমাকে পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা, স্বাধীনতা তুমিসহ তাঁর রচিত আরো অনেক কবিতাই আজ মুখে মুখে চর্চিত। তিনি 'গেরিলা' শিরোনামের কবিতায় মুক্তিকামীর অবয়ব অঙ্কন করেছেন এক অভিনব বাক্ মহিমায়–

দেখতে কেমন তুমি? অনেকেই প্রশ্ন করে, খোঁজে
কুলুজি তোমার আঁতিপাতি। তোমার সন্ধানে ঘোরে
ঝানু গুপ্তচর, সৈন্য পাড়ায় পাড়ায়। তন্নতন্ন করে খোঁজে প্রতিঘর।
পারলে নীলিমা চিরে বের করত তোমাকে ওরা, দিত ডুব গহন পাতালে।

অসাধারণ বীর ব্যঞ্জনায় কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ আমাদের শুনিয়েছেন পূর্বপুরুষের কিংবদন্তি। 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতাটিতে হাজার বছরের বাঙালির নির্মম ও করুণ ইতিহাসের সাথে সাথে যেন উঠে এসেছে সমগ্র মানবজাতির অনধিকার ও বঞ্চনার ইতিহাস, আমরা সামান্য পাঠ নিচ্ছি–

আমি কিংবদন্তির কথা বলছি
আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি
তাঁর করতলে পলিমাটির সৌরভ ছিল
তাঁর পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল।
তিনি অতিক্রান্ত পাহাড়ের কথা বলতেন
পতিত জমি আবাদের কথা বলতেন
তিনি কবি এবং কবিতার কথা বলতেন...
যখন রাজশক্তি আমাদের আঘাত করল
তখন আমরা প্রাচীন সংগীতের মতো
ঋজু এবং সংহত হলাম।
পর্বতশৃঙ্গের মতো মহাকাশকে স্পর্শ করলাম
দিকচক্রবালের মতো দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হলাম
এবং শ্বেত সন্ত্রাসকে সমূলে উৎপাটিত করলাম।

কবি জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী'র কবিতায় খুঁজে পাওয়া যায় শত শত মৃত্যু ও কান্নার কলরোলের মাঝে মুক্তিযোদ্ধাদের নির্ভীক পথচলার ধ্বনি। মধ্যরাতের স্তব্ধতা ভেঙে উঠে আসছে গুলির শব্দ, একের পর এক চলছে কবর খোঁড়া। তবুও বাবুই পাখির মতো স্বপ্ন বুনতে ছিল কিছু মানুষ; এমন স্বপ্ন ও মৃত্যুর মাঝে কবির কলম থেকে ওঠে আসে– 'যখন কবর খোঁড়া হচ্ছিল/ প্রতীক্ষা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছিল/ বাবুই তখনো ব্যস্ত ছিল/ তার চঞ্চল ঠোঁটে ছিল অমর তন্তু/ কী সূক্ষ্ম, কী পেলব/ কী অপরাজেয়'।

দেশমাতার জন্য বুকের রক্ত ঢেলে দিতে বীরযোদ্ধাদের একটুও দ্বিধা ছিল না, ছিল না এতটুকু ভীতি–বীর বাঙালির এই বলিষ্ঠ চেতনাই বিজয় অর্জনে প্রধান ভূমিকা পালন করে। সেই দীপ্ত-চেতনার উজ্জ্বল গ্রন্থনা ফুটে ওঠে কবি আল মাহমুদের কবিতায়। তাঁর 'অসহ্য সময় কাটে' শিরোনামের কবিতার কিঞ্চিৎ পাঠ নিচ্ছি–

'আমিও অন্তরঙ্গ হয়ে যাই হঠাৎ তখন/ জনতার সমুদ্রের সাথে/ বাঘের হাতের মতো সনখ শপথ/ সোহাগের গাঢ় ইচ্ছা নিয়ে/ নেমে আসে মনের ওপর। / নির্মম আদর পেয়ে আমিও রক্তাক্ত হব বরকতের শরীরের মতো?'

'বারবারা বিডলার কে' শিরোনামের কবিতায় বারবারাকে অনুভূতি লিখতে গিয়ে কবি আসাদ চৌধুরীর শব্দমালায় ওঠে আসে 'ইয়াহিয়া খাঁ' নামে এক জল্লাদের প্রতিচ্ছবিসহ 'সভ্যতার নির্মল পুষ্পকে' বাঁচাতে কবির অমোঘ আহ্বান– 'বারবারা এসো/ রবিশঙ্করের সুরে সুরে মুমূর্ষু মানবতাকে গাই/ বিবেকের জং ধরা দরজায় প্রবল করাঘাত করি/ অন্যায়ের বিপুল হিমালয় দেখে এসে ক্রুদ্ধ হই, সংগঠিত হই/ ছাত্রপত্রহীন সূর্যকিরণকে বিষাক্ত করার পূর্বে/ এসো বারবারা, বজ্র হয়ে বিদ্ধ করি তাকে।'

বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন কোলাজে কবি মোহাম্মদ রফিক-এর কবিতায় ওঠে এসেছে অশ্রু ও মৃত্যুর রক্তকাহিনি আর সেইসাথে বিচার প্রাপ্তির অশান্ত কামনা, 'যদি সত্য হয়' কবিতা থেকে– 'যদি সত্য হয় জল, মোমেনার মার চোখ ভেঙে দরিয়ার নোনা ঢল/ মহুয়ার বুকে বিদ্ধ ছোরা/ দৃষ্টির পাথর গলে ছিটকে আসা বহু বহু যুগ জমানো মাটির খাদে খান খান হিম নিস্তব্ধতা/... নিশ্চয় বিচার হবে, যদি সত্য, কলিজার উম।' কবিতায় বাককৌশলের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশগুণে আদৃত নির্মলেন্দু গুণের কবিতা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণেই মূলত স্বাধীনতার

বীজমন্ত্র ধ্বনিত হয়েছে; সেই ভাষণের অন্তরীণ উত্তেজনা ও আকাঙ্ক্ষা দারুণ বাকনৈপুণ্যে প্রকাশ পেয়েছে কবির– 'স্বাধীনতা শব্দটি কীভাবে আমাদের হল' কবিতায়– 'হে অনাগত শিশু, হে আগামী দিনের কবি/ শিশুপার্কের রঙিন দোলনায় দোল খেতে খেতে/ তুমি একদিন সব জানতে পারবে– আমি তোমাদের কথা ভেবে/ লিখে রেখে যাচ্ছি সেই শ্রেষ্ঠ বিকেলের গল্প।' মুক্তি ও প্রতিশোধের চেতনাদীপ্ত এক বজ্র-বিদ্যুৎ বর্ণনা আমরা খুঁজে পাই কবি অসীম সাহা'র 'পৃথিবীর সবচেয়ে মর্মঘাতী রক্তপাত' শিরোনামের কবিতায়– 'শুধু প্রয়োজন প্রতিটি ঐতিহাসিক রক্তবিন্দুর কাছ থেকে/ মানুষের সভ্যতার ইতিহাস জেনে নেওয়া/ আমি সেই রক্তবিন্দু থেকে সম্মুখের ইতিহাস অবধি নিজের রক্তবিন্দুকে প্রবাহিত করে দিতে চাই/ আমি একটি রক্তপাতহীন পৃথিবীর জন্যে এই মুহূর্তে পৃথিবীর সবচেয়ে– মর্মঘাতী রক্তপাত করে যেতে চাই।' মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে আবেগ-উত্তেজনা ও ভালোবাসার নিপুণ এক সাংগীতিক বর্ণনা খুঁজে পাই কবি খোন্দকার আশরাফ হোসেন-এর 'বাউসী ব্রিজ ৭১' শিরোনামের কবিতায়। কবিতাটির শেষ কয়েকটি পঙ্‌ক্তি– 'আর আমরা শীতের রাতে সূর্যের প্রার্থনাস্তব গানরত কৃষকের মতো/ আমাদের মুখগুলো মাটির কাছাকাছি নামালাম, মমতার বিন্দু বিন্দু রক্তে/ চরের মাটিতে জ্বলন্ত ফুল ফোটানোর ঠিক আগ মুহূর্তে, কী আশ্চর্য/ আমাদের চিবুকগুলো ভয়ে নয়, আসন্ন মৃত্যুর সন্ত্রাসে নয়/ ভালোবাসার মতো এক আর্দ্র, কোমল আবেগে ডুকরে কেঁদে উঠল।' দামাল ছেলের জন্য এক মায়ের প্রতীক্ষা অত্যন্ত আবেগঘন সুরে উঠে আসে কবি সানাউল হক খান-এর কবিতায়। তাঁর 'খোকন খোকন করে মায়' শিরোনামের কবিতা থেকে– 'ভাঙা ভিটে লেপে দিতে দিতে/ আঁচলে জমেছে কাদা, দুই চোখে বালি/ অনেক স্বপ্নের লগ্নপাত ঘটেছে আরক্ত ঘুমে/ তোমার খোকন তবু ঘরে ফিরল না/ তুমি বসে রইলে।'

একাত্তরে যুদ্ধকালীন পোস্টারে, ফেস্টুনে, মিছিলে মিছিলে বজ্র-স্লোগান হয়েছিল কবি হেলাল হাফিজের কবিতা। তাঁর 'নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়' থেকে দুই ছত্র– 'এখন যৌবন যার মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়/ এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়।' কবি কাজী রোজীর 'একটি মাইক্রোবাস, তোমরা দু'জন ও জীবন্ত লাশ আমি' শিরোনামের কবিতাটিতে পাওয়া যায় যুদ্ধকালীন ভয়, স্তব্ধতা, অন্ধকার ও নিরুদ্দিষ্ট যাত্রার এক ভয়ানক বর্ণনা–

'তোমরা যে দু'জন আমাকে নিয়ে চলেছ/ কোনো কথা বলছ না কেন?/ হু হু বাতাস মিশমিশে কালো অন্ধকার/ দীর্ঘ পথের নাগাল ছুঁয়ে ছুঁয়ে ছুটে চলেছে দূরের পথ/ সাদা মাইক্রোবাস প্রচণ্ড গতিবেগে ছুটে চলেছে/ তোমরা কথা বলছ না কেন?'

মুক্তিযুদ্ধের অধিনায়কের স্মৃতির উদ্দেশ্যে 'না' শীর্ষ নামের কবিতায় কবি হাসান হাফিজ উচ্চারণ করেছেন বলিষ্ঠ প্রত্যয়, বাঙালির হার না মানা বীর্যবান অস্তিত্বের জয়গাথা– 'অপেক্ষার জীর্ণ জরায়ু ছিঁড়ে/ আমাদের দাঁত কামড়ে বেঁচে থাকা– লেফট রাইট দুঃসাহস/ ক্ষোভ ঘৃণা ভালোবাসা রক্তপাত/ অবিমিশ্র রক্তপাত আরো রক্তপাত– না, আমরা কাপুরুষ নই, না।' স্বাধীনতা অর্জনের অনেকগুলো বছর অতিক্রম হলেও দেশবাসী স্বাধীনতার মহত্ত্বকে ঠিক উদ্‌যাপন করতে পারছে না; যেন সেই পুরোনো শকুন খামছে ধরে আছে পতাকা, আজও যেন চক্রান্তের অবসান হলো না, এমনই ভাবচিত্রে গড়া 'বাতাসে লাশের গন্ধ' কবিতার শেষাংশে কবি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ নতুন করে স্বাধীনতার পরিচয় ও সংজ্ঞায়ন করেছেন– 'স্বাধীনতা– সে আমার স্বজন হারিয়ে পাওয়া একমাত্র স্বজন/ স্বাধীনতা– সে আমার প্রিয় মানুষের রক্তে কেনা অমূল্য ফসল/ ধর্ষিতা বোনের শাড়ি ওই আমার রক্তাক্ত জাতির পতাকা।' মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মহাপ্রতিরোধের সাথে বাঙালি ফিরিয়ে দিয়েছে প্রতিঘাত; রক্তপটভূমে ওদের অসুর নৃত্য আর হলো না; কবি কামাল চৌধুরীর 'সাহসী জননী বাংলা' শিরোনামের কবিতা থেকে– 'ভেবেছিলি অস্ত্রে মাত হবে বাঙালি অনার্য জাতি, খর্বদেহ/ ...ভাত খায়, ভীতু কিন্তু কী ঘটল শেষে?/ কে দেখালো মহাপ্রতিরোধ অ আ ক খ বর্ণমালা/ পথে পথে তেপান্তরে ঘুরে উদ্বাস্তু আশ্রয়হীন/ পোড়াগ্রাম মাতৃ অপমানে কার রক্ত ছুঁয়ে শেষে হয়ে গেল ঘৃণার কার্তুজ।'

শত সংগ্রাম, রক্ত ও অশ্রু গেল তবু যেন সেই কাঙ্ক্ষিত ভোর, সেই প্রার্থিত স্বাধীনতা ফিরে আসেনি, তাই কবির কণ্ঠে গভীর আক্ষেপ– 'সে আসেনি/ কান্নাধোয়া স্নিগ্ধ বৃষ্টি বুকে প্রতীক্ষার জানালায় ব্যাকুল দাঁড়ানো চোখের হাসির মতো/ যুবতী মাঠের জোছনায়-রাঙা পায়ে।' কবি সোহরাব পাশার 'তবে কেন এত আয়োজন' শিরোনামের কবিতায় এমনই স্নিগ্ধ কাতর উচ্চারণ আমরা শুনতে পাই। কবি মাহমুদ আল জামান-এর 'যখন ফিরছি' নামের কবিতাটি একজন যুদ্ধ শেষে ফিরে আসা মুক্তিযোদ্ধার জবানিতে লেখা যেখানে পথের বর্ণনায় রয়েছে– বিক্ষত নারী, ভাঙা থালা, নদীতে যুবার লাশ আর লোকালয় জুড়ে ভগ্ন-বিধ্বস্ত ছায়া– 'যখন ফিরছি/ আলপথের ধারে/ ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে ছিল দুটি/ বিক্ষত নারী/ যখন ফিরছি/ নিকানো উঠোনো ভাঙা থালা/ নদীতে যুবার লাশ স্পষ্টস্বরে/ মাকে ডাকছে।' আরো অগণ্য কবি আছেন যাঁদের কবিতায় মুক্তিযুদ্ধের উত্তেজনা, ঘটনাচক্র, ইতিহাস ও দিনপঞ্জি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাষায় বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে তাঁদের মধ্যে– কবি সুফিয়া কামাল, কবি আহসান হাবীব, কবি হাসান হাফিজুর রহমান, কবি সৈয়দ শামসুল হক, কবি মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, কবি ফজল শাহাবুদ্দিন, কবি আবুবকর সিদ্দিক, কবি শহীদ কাদরী, কবি বেলাল চৌধুরী, কবি রফিক আজাদ, কবি সিকদার আমিনুল হক, কবি মহাদেব সাহা, কবি আবুল হাসান, কবি রবিউল হুসাইন, কবি হুমায়ুন কবির, কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা, কবি মাকিদ হায়দার, কবি হাবীবুল্লাহ সিরাজী, কবি শিহাব সরকার, কবি আবিদ আজাদ, কবি সমুদ্র গুপ্ত, কবি আবিদ আনোয়ার, কবি মিনার মনসুর, কবি রেজাউদ্দিন স্টালিন, কবি গোলাম কিবরিয়া পিনু এবং কবি দুলাল সরকার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সংঘাত, অনধিকার চর্চা, বৈষম্য, শোষণ-পীড়নসহ নানা রাজনৈতিক কারণে যুদ্ধ সংগঠিত হয়। অস্ত্র থাকলেই কেবল যুদ্ধে জয়লাভ করা যায় না। কারণ যুদ্ধ করে মানুষ, অস্ত্র নয়। যুদ্ধের সাথেও ন্যায্যতা ও নৈতিকতার প্রশ্নটি প্রচ্ছন্নভাবে যুক্ত থাকে। যোদ্ধার মনে অনীতি ও অবিচারের প্রশ্নটি যখন সংক্রমিত হয় তখন সে হতোদ্যম হয় এবং পরাজয় মেনে নেয়। এই সাক্ষ্য বহন করে ভিয়েতনাম যুদ্ধ এবং আমাদের মুক্তিযুদ্ধেও শত্রুপক্ষ একই ধারার বিজিত হয়েছে। আমাদের বিজয়ের পেছনে যেমন রয়েছে মুক্তিকামী মানুষের জনযুদ্ধে প্রাণপণ ঝাঁপিয়ে পড়ার সংগ্রামী চেতনা; তেমনি ভূমিকা ছিল কবি-লেখক, শিল্পীর কালি, তুলি এবং কথার দীপ্ত প্রভাব। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত কবিতায় একদিকে আছে 'শোষণের সহস্র কাহিনী' অন্য দিকে আছে 'যন্ত্রণা থেকে মুক্তির উত্তুঙ্গ অভিলাষ'। এই কবিতামালা বাঙালির হাজার বছরের সংগ্রামশীল পরিক্রমার অবিচ্ছিন্ন আখ্যান। অসংখ্য কবির রচনা হলেও তা যেন নিবিড় গ্রন্থনায় আমাদের পূর্ণাঙ্গ জাতিসত্তাকে তুলে ধরে। কাঙ্ক্ষিত উষার আশ্বাসে, রক্ত ও অশ্রু মহিমায় বাক্‌ঋদ্ধ এই কবিতামালা আজও ছড়িয়ে যায়– কম্পিত স্বরের মূর্ছনা।

লেখক: কবি ও সাহিত্যিক

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ বিশ্লেষণ

ফয়সাল শাহ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি মহাকালের মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ভাষণ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষণের মধ্যে অন্যতম। এটিকে গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের ১৮৬৩ সালের গেটিসবার্গ বক্তৃতার সঙ্গে তুলনা করা হয়। এমন সুন্দর ভাষণটি কিন্তু লিখিত ছিল না। আর এই ভাষণটির জন্য তেমন পূর্ব প্রস্তুতিও ছিল না। এটি ছিল বঙ্গবন্ধুর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া। আর এই ভাষণেই বঙ্গবন্ধু দিলেন বাঙালির মুক্তির ডাক: 'প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ। ... এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।'

সেদিন সারাদেশের মানুষও যেন উন্মুখ হয়েছিল সেই ডাক শোনার জন্য। অন্যদিকে ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে পারেন তা আগেই আঁচ করতে পেরেছিল দেশ-বিদেশের সংবাদপত্রগুলো। দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ-এ ৬ই মার্চ ছাপা হয়, 'পূর্ব পাকিস্তানের একতরফাভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা' শিরোনামে 'শেখ মুজিবুর রহমান আগামীকাল স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারেন।' দ্য সানডে টাইমস পত্রিকায় ৭ই মার্চ 'স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারেন পূর্ব-পাকিস্তানের নেতা' শিরোনামে একটি খবর ছাপা হয়। এ খবরে দুই ধরনের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করা হয়–মুজিব একতরফা স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন অথবা নিজেই নির্বাচকমন্ডলীর অ্যাসেম্বলির অধিবেশন ডেকে দুই অংশের প্রতিনিধিদের যোগ দেওয়ার আহ্বান জানাবেন। এ ব্যাপারে ৫ই মার্চ খবর প্রকাশ করে দ্য গার্ডিয়ান, ৭ই মার্চ ছাপে দ্য অবজারভার। এ থেকে বোঝা যায়, ঘটনা এমন পরিস্থিতিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, বাঙালি স্বাধীকার ব্যতীত অন্যকিছু চিন্তাও করতে পারেনি।

সাতচল্লিশ বছর পূর্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত একাত্তরের ৭ই মার্চের ভাষণ যোগাযোগ বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক প্রয়োগের এক বিস্ময়কর ঘটনা। যোগাযোগ বিষয়ে আধুনিক নিয়মকানুনের এক আশ্চর্য প্রতিফলন ঘটেছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধুর এ ঐতিহাসিক ভাষণে। প্রতি মিনিটে গড়ে ৫৮ থেকে ৬০টি শব্দ উচ্চারণ করে বঙ্গবন্ধু ১৯ মিনিটে এই কালজয়ী ভাষণটি শেষ করেছিলেন। সম্প্রচারতত্ত্বে প্রতি মিনিটে ৬০ শব্দের উচ্চারণ একটি আদর্শ হিসাব। এক হাজার একশত সাতটি শব্দের এ ভাষণে কোনো বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি নেই, কোনো বাহুল্য নেই– আছে শুধু সারকথা, সারমর্ম। তবে দু-একটি স্থানের পুনরাবৃত্তি বক্তব্যের অন্তর্লীন তাৎপর্যকে বেগবান করেছে। ভাষণের সূচনাপর্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বলা হয়ে থাকে, 'There is nothing like a good beginning for a speech'। বক্তব্যের প্রারম্ভে শ্রোতার মানসিক অবস্থান (audience orientation) ও সাম্প্রতিক ঘটনা উল্লেখ করা অত্যাবশ্যক বলে যোগাযোগতত্ত্বে যা বলা হয় (reference to audience and reference to recent happenings) তার আশ্চর্য প্রতিফলন ঘটে বঙ্গবন্ধুর এই যুগান্তকারী ভাষণে। বঙ্গবন্ধু ভাষণ শুরু করেছিলেন, 'ভায়েরা আমার, আজ দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়।' অত্যন্ত কার্যকর বক্তৃতার অবতরণিকা–যা পুরো বক্তৃতার মূল ভিত্তি তৈরি করেছে ও শ্রোতৃকুলকে অভ্যুদিত বক্তৃতার আভাস দিচ্ছে। পুরো বক্তৃতার আধেয় বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বক্তৃতাটি মূলত পৃথিবীর মানচিত্রে একটি নতুন দেশের অভ্যুদয় বার্তা ও তার স্বাভাবিক অনুযাত্রায় পাকিস্তানের তদানীন্তন রাষ্ট্রকাঠামোর পূর্বাঞ্চলের পরিসমাপ্তির প্রজ্ঞপ্তি ও বিবরণী।

বঙ্গবন্ধু ভাষণ শুরু করেছিলেন 'ভায়েরা আমার' বলে এবং শুরুতে বলেছিলেন আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন'। ভাষণের শেষাংশে আসতে আসতে তাঁর কম্যুনিকেট করার আত্মীয়সুলভ ভঙ্গিতে তিনি এমন স্তরে পৌঁছে গেছেন যে, তাদের সহজেই 'তুমি' সম্বোধন করতে পারছেন। এতে শ্রোতার সঙ্গে তাঁর আত্মিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়েছে এবং তাঁর বক্তব্যে আবেদন বেড়েছে। এতে বক্তা এবং শ্রোতা একাত্ম হয়েছেন। ভাষণের ধারাবাহিকতাকে কখনো ক্ষুণ্ন হতে দেননি এবং কোনো পয়েন্টই মূল বক্তব্যকে শিথিল করেনি। বরং ওইসব আনুষঙ্গিক উপাদান মূল বক্তব্যকে সংহত ও জোরালো করেছে। বাংলার মানুষকে একাত্ম করার জন্য এবং নিজ ক্যারিশমানুযায়ী তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব অভিভাবক হিসেবে নিজ কাঁধে নেবার জন্য বঙ্গবন্ধু বলেছেন– 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে,' 'আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।' 'আমার' শব্দটিকে বারংবার ব্যবহার করেছেন। যেমন– 'ভায়েরা আমার,' 'জামার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে আমার দেশের গরিব, দুঃখী, নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে,–তার বুকের ওপর হচ্ছে গুলি,' 'আমার গরিবের উপর,' 'আমার বাংলার মানুষের,' 'আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে,' 'আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে,' 'আমার মানুষ কষ্ট না করে,' 'আমার লোককে হত্যা করা হয়' ইত্যাদি। ভাষণটি গঠনে কৌশল, কূটনৈতিক প্রজ্ঞা, ইতিহাস থেকে নেওয়া শিক্ষা, সময়জ্ঞান ও শব্দ চয়নের মুন্সিয়ানা আছে। বাঙালিকে 'আমার দেশের গরিব-দুঃখী-নিরস্ত্র মানুষ', 'আমার মানুষ' বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। পূর্ব বাংলার অধিকারবঞ্চিত মানুষের জন্য আজীবন আপোশহীন সংগ্রাম, জেল-জুলুম-নির্যাতন সহ্য করে জনগণের একেবারে হৃদয়ের ভেতরে ঢুকে যাওয়া এই নেতার পক্ষেই এই ভাষায় শ্রোতাদের সম্বোধন করা সম্ভব।

বাংলাদেশের কবি নির্মলেন্দু গুণ শেখ মুজিবের ৭ই মার্চের ভাষণকে বলেছেন একটি মহাকাব্য। আর সেই মহাকাব্যের মহাকবি হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কবি গুণের কবিতায় বঙ্গবন্ধুকে কবি অভিহিত করার প্রতিধ্বনি শোনা গেছে লন্ডনের সানডে টাইমস পত্রিকার মতো কাগজে। কাগজটি শেখ মুজিবকে নাম দিয়েছিল 'এ পোয়েট অব পলিটিক্স। একাত্তর সালের ৭ই মার্চের ভাষণ অবশ্যই একটি মহাকাব্য এবং এই মহাকাব্যের কবি শেখ মুজিব। মহাকাব্যের মতো এই কবিতার পরিধি বিস্তৃত নয়। কিন্তু বক্তব্যে, ভাবে ও ব্যঞ্জনায় মহাকাব্যের চাইতে বড়ো এবং বিস্তৃত।

নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী হলেও তিনি বুঝেছিলেন, পাকি চক্রান্তকারীরা তাঁকে এই ক্ষমতা দেবে না। তাই তিনি ওই ঐতিহাসিক ভাষণে বলেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাচারি, আদালত, ফৌজদারি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫শে নভেম্বর ২০১৭ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ 'বিশ্বপ্রামাণ্য ঐতিহ্যে'র স্বীকৃতি অর্জন উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশে বক্তৃতা করেন–পিআইডি

...২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন।' এই বক্তব্যে তিনি 'বাংলাদেশ ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এবং বলে দিয়েছেন তিনি 'প্রধানমন্ত্রী' অর্থাৎ পাকিস্ড়ানের প্রধানমন্ত্রী হতে চান না। তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশে, যেজন্য কোন অফিস বন্ধ থাকবে তা যেমন বলেছেন তেমনি ২৮ তারিখে কর্মচারীদের বেতন নিয়ে আসতে বলেছেন। এই বক্তব্যে বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা আছে। তবে তা বাস্ড়বায়নের জন্যই আবার বলেছেন, 'তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা-কিছু আছে তাই দিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্ড়াঘাট যা যা আছে সবকিছুই–আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।' পাকিস্ড়ানি শক্তিশালী সেনাবাহিনীর বির"দ্ধে এই বক্তব্যে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ। দিব্যচোখে ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েই যেন আবার স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য বললেন, 'তোমাদের যা-কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ।' আবার সামনে আনলেন: 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।'

বঙ্গবন্ধু পাকিস্ড়ানিদের কাছে যে চারটি শর্ত উত্থাপন করেছিলেন তার তিনটিই ছিল সামরিক বিষয়াদি:

১. সামরিক আইন মার্শাল 'ল' withdraw করতে হবে
২. সামরিকবাহিনীর সমস্ড় লোকদের ব্যারাকের ভিতর ঢুকতে হবে
৩. যে ভাইদের সেনাবাহিনী হত্যা করেছে তার তদন্ড় করতে হবে।

বক্তৃতায় বাঙালি জনগণের কাছে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশাবলির সামরিক প্রস্তুতির বিষয়গুলোও লক্ষণীয়:

১. যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে
২. ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল।

এ ছিল পাকিস্ড়ানিদের বির"দ্ধে বঙ্গবন্ধুর সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা। এরপর স্বাধীনতার লক্ষ্যে যুদ্ধ ঘোষণার আর কিছু বাকি থাকে না। সেদিন অনেকে ভেবেছিলেন ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে পাকিস্ড়ানি সৈন্যদের আক্রমণের নির্দেশ দেবেন। কিন্তু তিনি উন্মত্ত ছিলেন না। জনগণকে তিনি যে প্রস্তুতি নিতে বলেছিলেন তা ছিল অসাধারণ সামরিক বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক এক রাজনীতিকের। প্রতিটি বাঙালি সেদিন তাঁর এই সামরিক প্রস্তুতির তাৎপর্য অনুভব করেছিলেন। পাকিস্ড়ান সেনাবাহিনীতে অবস্থিত বাঙালি সামরিক অফিসাররাও বঙ্গবন্ধুর এই সামরিক সিগন্যালকে ধরতে পেরেছিলেন। এর ফলেই ২৫শে মার্চ রাতের পর দ্র"তই বাঙালি সেনা অফিসাররা প্রতিরোধ যুদ্ধে নামতে সক্ষম হয়েছিলেন। ছাত্ররাও ৭ই মার্চের পরপরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে ডামি রাইফেল নিয়ে সামরিক ট্রেনিং শুর" করে দেয়।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণার বিষয়টি বিবেচনা করা যায়। বাংলাদেশের তখনকার রাজনৈতিক বাস্ড়বতার আলোকে বিচার করলে একমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই এই ঘোষণা দেবার লব্ধ অধিকারী ছিলেন। কারণ ১৯৭০- এর সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে তাঁর নির্বাচনি লব্ধতা ও জনগণের পক্ষে সিদ্ধান্ড় নেওয়ার ম্যান্ডেট ছিল। দ্বিতীয়ত, ৩রা মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ড় অসহযোগ আন্দোলনের সময় বাংলাদেশের বেসামরিক প্রশাসনের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বঙ্গবন্ধু যে কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেছিলেন তাঁর কাছে হস্ড়ান্ড়রিত হয়েছিল। পূর্ব বাংলায় শুধু ক্যান্টনমেন্টসমূহেই পাকিস্ড়ানের কিছুটা কর্তৃত্ব টিকেছিল। গোটা রাষ্ট্রযন্ত্র বঙ্গবন্ধুর কর্তৃত্বের কাছে আনুগত্য প্রকাশ করেছিল। পূর্ব বাংলার সরকারি প্রশাসন, উচ্চ আদালত, ব্যাংক ও অর্থনৈতিক সংস্থা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ, সেবা খাত, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, এমনকি ব্যবসায়ীরা পর্যন্ড় বঙ্গবন্ধুর আদেশ-নির্দেশ নিয়ে তাদের দৈনন্দিন কর্মকা" চালিয়েছেন। অন্য কারো এই আইনত ভিত্তি (জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত বিজয়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলনেতা) ও জনগণের দেওয়া নির্বাচনি বৈধতা ছিল না।

বাঙালির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিকাশধারার সঙ্গে পাকিস্ড়ানের কেন্দ্রীয় শাসকদের পূর্ব পাকিস্ড়ানের জন্য প্রণীত আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক নীতির দ্বন্দ্ব-সংঘাত-অভিঘাতের প্রতিক্রিয়ায় বাঙালিদের মনে যে নতুন জাতীয় চেতনার সৃষ্টি হয়, তারই ফলে গড়ে ওঠে বাঙালি জাতীয়তাবাদভিত্তিক স্বাধিকার ও স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন। এই আন্দোলনের কর্মী, সংগঠক, সমর্থক, বিশেষ করে এর নেতৃপুর"ষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় জনসমর্থন ও গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে পাকিস্ড়ানের ফেডারেল কাঠামোর মধ্যে পূর্ব বাংলার সর্বোচ্চ স্বায়ত্তশাসন অর্থাৎ স্বশাসনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু পাকিস্ড়ান রাষ্ট্রের আধিপত্যবাদী সামন্ড়তান্ত্রিক-মৌলবাদীচক্র এবং তাদের সহযোগী সামরিক ও ছদ্ম-সামরিক স্বৈরশাসকরা গণতন্ত্র ও নির্বাচন ব্যবস্থাকে বানচাল করার লক্ষ্যে বার বার সামরিক শাসন জারি করে পূর্ব বাংলায় বাঙালির স্বতন্ত্র জাতিসত্তা ও তাদের স্বকীয় সংস্কৃতির বিকাশকে ধ্বংস করার প্রয়াস পায়। এই লক্ষ্যে তারা ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করে পূর্ব বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ কায়েম করে। পাকিস্ড়ানি শাসকদের এই হীন কৌশল উপলব্ধি করেই ১৯৫৮ থেকে ১৯৭০ এই এক যুগ ধরে বাঙালি জাতির আপোশহীন নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ১৯৬০-৬১ সাল থেকেই প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যেসব পদ্ধতি-পন্থা অবলম্বন করে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে তুঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন তার সফল পরিসমাপ্তির রাজনৈতিক ও মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশলের এক চমৎকার রূপরেখা তাঁর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ। এই ভাষণে স্বাধীনতা সংগ্রামকে মুক্তিযুদ্ধে রূপান্ড়রিত করার কৌশল এবং তাতে সাফল্য লাভের দিকনির্দেশনা দেওয়া আছে।

লেখক: উপসচিব, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

১৭ই মার্চ: জাতীয় শিশু দিবস

বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির অহংকার

মোহাম্মদ নজরুল হাসান

একটি দেশ ও একটি জাতি কাকে নিয়ে গর্ব-অহংকার করতে পারে? যে দেশকে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত করতে পারে, একটি স্বাধীন দেশের মানচিত্র জাতিকে উপহার দিতে পারে। দেশের আপামর জনতার কথা যে সর্বদাই ভাবে। তাঁকেই তো দেশ ও জাতি ভালোবাসবে। দেশ ও জাতি তাঁকে নিয়েইতো অহংকার করবে। আমরা বাঙালি জাতি কাকে নিয়ে এ ধরনের অহংকার করতে পারি? উত্তরটি মনে হয় আমাদের সবারই জানা। সবাই একই সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বলবে, আমাদের দেশ ও জাতির অহংকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে একটি স্বাধীন ভূখণ্ড উপহার দিতে পেরেছিলেন, পেরেছিলেন একটি স্বাধীন দেশের মানচিত্র বাঙালি জাতির হাতে তুলে দিতে। একটি লাল-সবুজের পতাকা দিয়ে তিনি আবৃত করেছিলেন বাঙালির আপামর জনগণকে একত্রে একই বন্ধনে।

১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন নবাব সিরাজউদ্দৌলা রাজসভার কতিপয় লোভী ও কপট রাজ-কর্মচারীর বেঈমানীর কারণে ইংরেজদের কাছে পরাজয় বরণ করেন। তাঁকে ফাঁসির মঞ্চে ঝুলানো হয়। সেই থেকে বাঙালি জাতি পরাধীন জীবন শুরু করে। প্রথমে ইংরেজদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে মিরজাফর ও এর দোসররা গোলামী জীবন বেছে নেয়। শুরু হয় বাঙালির পরাধীন জীবন। সেই ১৭৫৭ থেকে ১৯৭১ অবধি দুইশত বছরেরও বেশি সময় বাঙালি পরাধীন জীবনযাপন করে। এর মাঝে অনেক সিংহ পুরুষ জন্ম নিয়েছে। স্বদেশকে স্বাধীন করতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়েছে। কিন্তু তারা সফল হতে পারেনি। যে একজন পেরেছেন এই পরাধীনতার গ্লানি দূর করে দেশকে স্বাধীন করতে, তিনি হচ্ছেন শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৪৭ সালে ইংরেজরা এদেশ ছেড়ে গেলেও আবার পাকিস্তানের খপ্পড়ে পড়তে হয় এই দেশের জনগণকে। পাকিস্তানিরাও বাঙালি জাতিকে নানাভাবে ঠকাতে থাকে। বাঙালির জনসংখ্যা বেশি এবং পাকিস্তানের জনসংখ্যা কম হওয়া সত্ত্বেও তারাই রাষ্ট্র পরিচালনার ভার হাতে তুলে নেয়। কিছু অসাধু বাঙালিকে হাতে রেখে তারাই পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান এবং এ দেশকে পূর্ব পাকিস্তান নামে অভিহিত করে দেশ শাসনের কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। এদের বিরুদ্ধে অনেকেই প্রতিবাদ করে। নিজ ভাষা বাংলাকে টিকিয়ে রাখার জন্য, রাষ্ট্রভাষা করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা মিছিল বের করে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রফিক, শফিউর, বরকত, জব্বার ও সালাম পাকিস্তানি সৈনিকের গুলিতে শহিদ হন। এর প্রতিবাদে আবারো মিছিল বের হয়। এভাবেই চলতে থাকে মিটিং-মিছিল, হরতাল-অবরোধ ঐ পাকিস্তানিদের দেশ থেকে তাড়াবার জন্য।

নিজ দেশকে পরাধীনতার বন্ধন থেকে মুক্ত করতে শেখ মুজিবুর রহমান আন্দোলন-সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তার নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের ব্যানারে নির্বাচনে অংশ নিয়ে এমপি, মন্ত্রী হয়েছেন। আবার রাজপথে নেমে আন্দোলন-সংগ্রামের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে কারাবরণ করেছেন, জেলে গিয়েছেন, ভাষার দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। আইয়ুবের কঠিন মার্শাল ল' তথা সামরিক শাসনকে উপেক্ষা করে তিনি ৬ দফার ভিত্তিতে বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন। ৬ দফা ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ। ৬ দফার পক্ষে জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি বাংলার আনাচে-কানাচে মিছিল-মিটিং, সমাবেশ করেছেন, গ্রামে-গ্রামে, পাড়া-মহল্লায় কমিটি গঠন করে ৬ দফার সমর্থনে জনমত গড়ে তুলেছেন। তাঁর নেতৃত্বে ৬ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। অবস্থা বেগতিক দেখে শেখ মুজিবকে আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছিল। তখন 'জেলের তালা ভাঙ্গবো, শেখ মুজিবকে আনবো'– এই স্লোগানে প্রকম্পিত হয়েছিল সারাদেশ। তুমুল আন্দোলনের মুখে সামরিক জান্তা শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। কারামুক্তির পর আন্দোলনমুখী ছাত্র-জনতা শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন। তখন থেকেই তিনি 'বঙ্গবন্ধু'–বাঙালির প্রাণপ্রিয় নেতা, প্রাণের মানুষ। তখন থেকে 'বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাড়িটি হয়ে ওঠে বাঙালির ঠিকানা–আশ্রয়স্থল।

এরপর সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ বঙ্গবন্ধুকে আরেক উচ্চতায় নিয়ে যায়। ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নে সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান আর পিপলস পার্টির প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে শুরু হয় আলোচনা। সেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন বঙ্গবন্ধু। কারণ তিনিই ছিলেন মেজরিটি পার্টির প্রধান। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বিভিন্ন সময়ে নির্দেশনা জারি করতে থাকে। ১লা মার্চ ১৯৭১ থেকে এসব নির্দেশনার আলোকে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনযন্ত্র কাজ করতে থাকে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব, পুলিশের আইজি ও দপ্তর প্রধানগণ কার্যত সরকারি কার্য সম্পাদনের জন্য বঙ্গবন্ধুর নির্দেশের অপেক্ষা করতে থাকেন।

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। ২৫শে মার্চের রাতে বঙ্গবন্ধু তাঁর দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের সহকর্মীদেরকে ভারতে আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শ দিয়ে নিজে কারাবরণ করেন। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করতে না পারলে হানাদারবাহিনী আরও নৃশংস হতে পারে, চালাতে পারে আরও ভয়াবহ বাঙালি নিধন– এ আশঙ্কায় বঙ্গবন্ধু তাঁর নিজ বাড়িতেই গ্রেফতার হয়ে নিজেকে অন্য এক উচ্চতায় নিয়ে গেলেন। সারা পৃথিবী অবাক দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করল বঙ্গবন্ধু'র সাহসিকতা ও বাঙালি প্রিয়তাকে।

১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে লন্ডন হয়ে ঢাকায় ফিরে বাঙালি জনতার উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে বলেন, '২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে বন্দি হওয়ার পূর্বমুহূর্তে আমার সহকর্মীরা আমাকে চলে যেতে অনুরোধ করেন। তখন আমি তাদের বলেছিলাম, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে বিপদের মুখে ফেলে রেখে আমি যাব না। মরতে হলে আমি এখানেই মরব।' তাঁর এই আবেগভরা কথায় তাজউদ্দীন ও তাঁর অন্যান্য সহকর্মীরা কাঁদতে শুরু করেন। যে নিজ দেশের মানুষকে বাঁচাতে নিজে মরতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, সেই তো আমাদের বাঙালির অহংকার!

দেশে ফেরার পর বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে দেখার জন্য বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান, সংস্থা প্রধানগণ ছুটে আসেন শুভেচ্ছা নিয়ে এবং সাহায্যের হাত প্রসারিত করতে। বঙ্গবন্ধু নিজে বিভিন্ন দেশ সফর করেন এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সম্মেলনে যোগদান করেন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শে, বঙ্গবন্ধুর লালিত স্বপ্নে, বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাশিত বাংলাদেশ বিনির্মাণে সবাই তখন ঝাঁপিয়ে পড়লেন একটা আগুনে পোড়া ঝলসে যাওয়া বাংলাদেশকে সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলতে।

দেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু বলেন, লাখো শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে এ স্বাধীনতা। বিশ্বের কোনো শক্তিই আর এ স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে পারবে না। বিশ্বের ইতিহাসে আমাদের মতো

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ই মার্চ ২০১৭ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন উপলক্ষে টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে ফাতেহা পাঠ ও মোনাজাত করেন–পিআইডি

এত বড়ো মূল্য দিয়ে কেউ স্বাধীনতা অর্জন করে নি! তিনি আরও বলেন, বিশ্বের যে-কোনো অংশে মুক্তিসংগ্রামের সমর্থনে বাংলাদেশের মানুষ চিরদিন তাদের পাশে থাকবে। এমন মহৎ কথা যে বলতে পারে, তাঁকে নিয়েইতো বাঙালি জাতি অহংকার করতে পারে।

১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দুইশত বছরের শোষণ ও পরাধীনতার শিকল ছিন্ন করে বাঙালি জাতির ৩০ লাখ শহিদের রক্তে লেখা দলিল– বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান গণপরিষদে গৃহীত হয়। সাড়ে সাত কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক এ সংবিধান গৃহীত হওয়ার সাথে সাথে অধিবেশন কক্ষ খুশির আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। বঙ্গবন্ধুর চোখে নেমে আসে আনন্দ-অশ্রুর বন্যা। তিনি বলেন, রক্তে লেখা এ সংবিধান সাড়ে সাত কোটি মানুষের মৌলিক অধিকার ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। সাংবাদিকদের উদ্দেশে বললেন, 'নির্বাচনের আগে আমি আমার মানুষের কাছে যে ওয়াদা করেছিলাম আজ তা পূর্ণ হলো। এর চেয়ে আনন্দ আর হয় না।'

১৯৭৪ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামি শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের জন্য অনুরোধ জানাতে সংস্থাটির সেক্রেটারি জেনারেল তোহাসী ঢাকায় আসেন এবং বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণ জানান। তখনও পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। একথা তিনি তোহাসীকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন। পাকিস্তান বঙ্গবন্ধুর ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তার কাছে নতি স্বীকার করে ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় এবং ২৩ ও ২৪শে ফেব্রুয়ারি লাহোরের এ সম্মেলনে তিনি যোগদান করেন।

১৯৭৪ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বড়ো রকমের সাফল্য লাভ করে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। বঙ্গবন্ধু আমন্ত্রণ পেলেন জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে যোগদানের। ২৫শে সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ভাষণ দেন। বঙ্গবন্ধুই প্রথম জাতিসংঘে নিজের মাতৃভাষা বাংলায় ভাষণ দিয়ে সারা বিশ্ববাসীকে অবাক করে দেন।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন শান্তিপ্রিয় এবং শান্তিবাদী। তিনি মানুষে-মানুষে, দেশে-দেশে এবং জাতিতে-জাতিতে শান্তি ও মৈত্রীতে বিশ্বাস করতেন। শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্বের সকল শোষিত, নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষ যাতে শোষণ, নিপীড়ন ও নির্যাতন থেকে মুক্তি পায় এজন্য তিনি কাজ করে গেছেন। তিনি ছিলেন ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, লাওস, অ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক ও গিনিবিসাউ-এর উপনিবেশবিরোধী ও নির্যাতিত মানুষের পক্ষে। তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন, গোটা বিশ্ব আজ দুই দলে বিভক্ত– একদল শোষক, আরেক দল শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে। বিশ্বব্যাপী শান্তি পক্ষের সৈনিকেরা তাই বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা জানাতে ভুল করেননি।

১৯৭২ সালের ১০ই অক্টোবর বিশ্বশান্তি পরিষদ বঙ্গবন্ধুকে 'জুলিও কুরি' শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করে। ১৯৭৩ সালের ২৩শে মে এ শান্তি পদক প্রদানের আয়োজন করা হয় বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত শান্তির সৈনিকদের উপস্থিতিতে বিশ্বশান্তি পরিষদের সেক্রেটারি জেনারেল শ্রী রমেশ চন্দ্র বিশ্বে শান্তি, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের অতন্দ্রপ্রহরী এবং নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু হিসেবে অভিহিত করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বিশ্ব বন্ধু' বলে অভিহিত করেন। বঙ্গবন্ধু এ অনুষ্ঠানে বলেন, 'জুলিও কুড়ি শান্তি পদক সমগ্র বাঙালি জাতির। এটা আমার দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের, এটা কোনো ব্যক্তি বিশেষের জন্য নয়। উপনিবেশবাদী শাসন আর শোষণের নাগপাশ ছিন্ন করে ৩০ লক্ষ শহিদের প্রাণের বিনিময়ে আমরা ছিনিয়ে এনেছি জাতীয় স্বাধীনতা, তাই বাংলাদেশের মানুষের কাছে শান্তি ও স্বাধীনতা একাকার হয়ে মিশে গেছে।' তিনি আরও বলেন, বিশ্বশান্তি আমার জীবনদর্শনের মূলনীতি।

রাজনৈতিক মতাদর্শ, দলীয় চিন্তা-চেতনার ভিন্নতা কিংবা মত পার্থক্য থাকতেই পারে; কিন্তু আমরা বঙ্গবন্ধুকে রাখতে চাই সকল কিছুর উর্ধ্বে। আমরা চাই বঙ্গবন্ধু সকলের কাছে সবসময় সকল আয়োজনে, সকল প্রয়োজনে গ্রহণীয় হয়ে থাকবেন।

বঙ্গবন্ধু একজন মানুষ ছিলেন, একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন, একজন নেতা ছিলেন, একজন সাহসী যোদ্ধা ছিলেন। বাঙালি জাতির বিশাল কাণ্ডারী ছিলেন। যত ঝড়, যত প্রলয়, যত তাণ্ডব তিনি রুখে দাঁড়িয়েছেন, প্রতিরোধ করেছেন। তাঁর মধ্যে যেমন ছিল সরলতা তেমনি ছিল কঠোরতা। একজন জাতির পিতা হতে হলে হয়তো এইসব গুণ থাকতেই হয়। তাইতো বঙ্গবন্ধু হতে পেরেছেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি।

আমাদের জাতির দারিদ্র্য ও পশ্চাৎপদতা নিরসন করে একটি উন্নত সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে দুনিয়ার বুকে স্বাধীনভাবে মাথা উঁচু করে মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার লক্ষ্য অর্জনের জন্য বঙ্গবন্ধু সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন শিক্ষাকে। এজন্য স্বাধীনতা উত্তর বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক প্রণীত ১৯৭২ সালের সংবিধানে শিক্ষাকে সর্বোচ্চ স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সংবিধানের ১৭নং অনুচ্ছেদে (ক) এই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা প্রবর্তন এবং নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদান (প্রাথমিক স্তর থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত) (খ) সমাজের প্রয়োজনের সাথে শিক্ষাকে সংগতিপূর্ণ করা এবং (গ) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণে রাষ্ট্র কর্তৃক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়। শুধু সাংবিধানিক

স্বীকৃতি দিয়েই বঙ্গবন্ধু সরকার থেমে থাকেননি। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এরমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কালাকানুন বাতিল করে ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক আদেশ ১৯৭৩ প্রবর্তন, চল্লিশ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ; কয়েক লক্ষ প্রাথমিক শিক্ষককে সরকারি কর্মচারীর মর্যাদা দান, এগারো হাজার নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের নির্দেশ–সর্বোপরি একটি বিজ্ঞানভিত্তিক ও অভিন্ন গণমুখী জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ২৬শে জুলাই বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. কুদরত-এ-খুদাকে চেয়ারম্যান করে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যে মানুষ নিজ দেশের শিক্ষা বৃদ্ধির জন্য দেশের জনগণকে সর্বোতভাবে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এত বড়ো ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে তিনিইতো আমাদের বাঙালি জাতির অহংকার।

বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে মুগ্ধ হয়ে বিশ্বসেরা নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে তাঁর সম্পর্কে প্রশংসনীয় মন্তব্য করেছেন। কিউবার সংগ্রামী নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রো বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন, আমি হিমালয় দেখিনি; কিন্তু আমি শেখ মুজিবকে দেখেছি। ব্যক্তিত্ব ও সাহসিকতায় হিমালয়ের মতো (বাংলা ট্রিবিউন ১৭ই মার্চ ২০১৬)। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর মধ্যে তিনি পর্বত-প্রমাণ উচ্চতার একজন মানব-মানবতা ও শক্তি খুঁজে পেয়েছিলেন। মুসলিম দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে গঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের গোঁজামিলের শাসন ও শোষণের হাত থেকে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে মুক্ত করার লক্ষ্যে প্রথমে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলা এবং ১৯৭১ সালে তা সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে পরিণত করার মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু এ পর্বত-প্রমাণ উচ্চতায় পৌঁছেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বিদেশি সাংবাদিক সিরিল ভান বলেন, বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে শেখ মুজিবই একমাত্র নেতা যিনি রক্তে, বর্ণে, ভাষায়, কৃষ্টিতে এবং জন্মসূত্রেও ছিলেন খাঁটি বাঙালি। তাঁর দীর্ঘ দেহ, বজ্রকণ্ঠ, মানুষকে মুগ্ধ করার মতো বাগ্মিতা এবং জনগণকে নেতৃত্বদানের ব্যক্তিত্ব ও সাহস তাঁকে এ যুগের এক বিরল মহানায়কে রূপান্তর করেছে।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রেক্ষাপট উল্লেখ করে ১৯৭১ সালের ১৫ই আগস্ট জাতিসংঘ মহাসচিব উ থান্ট বলেছিলেন, পূর্ব পাকিস্তানের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহের অভিযোগ এনে গোপন বিচার করা হলে পূর্ব বাংলার অবস্থা ভয়াবহ হবে। ১৯৭৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু বাংলা ভাষায় জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ভাষণ দিয়ে মঞ্চ থেকে নামার মুহূর্তে বঙ্গবন্ধুকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন তাঞ্জেনিয়ার প্রেসিডেন্ট জুলিয়াস নায়ারে। তিনি বলেছিলেন, মুজিব তুমি শুধু বাঙালি জাতির নেতা নও, এমন দিন আসবে যেদিন তুমি তৃতীয় বিশ্বের সমগ্র নির্যাতিত- বঞ্চিত মানুষের নেতৃত্ব দিবে।

কিউবার প্রেসিডেন্ট ফিদেল ক্যাস্ট্রো বঙ্গবন্ধুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, মুজিব, তোমার মতো আমারও শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের সংগ্রাম। কিন্তু বন্ধু, সাবধান, সুযোগ পেলেই শোষকশ্রেণি তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তির দূত নেলসন ম্যান্ডেলা বঙ্গবন্ধুকে শোষিতের অকৃত্রিম বন্ধু বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন, স্বাধীনতা ও জনগণের সার্বিক সংগ্রামের ইতিহাসে শেখ মুজিবুরের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

১৯৭৪ সালের ২৯শে জানুয়ারি জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের অগ্রনায়ক যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো ঢাকায় আসেন। তিনি বলেছিলেন, শেখ মুজিব বিশ্বশান্তির একজন মহান অগ্রদূত। টিটো নিজে বিশ্বশান্তি, ঐক্য ও প্রগতির অগ্রদূতের প্রথম সারিতে ছিলেন। এবার তিনি এ সারিতে বঙ্গবন্ধুকে যুক্ত করলেন। মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুতে মুষড়ে পড়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তৃতীয় বিশ্ব একজন যোগ্য নেতৃত্বকে হারালো।

১৯৭৪ সালে বন্যাজনিত খাদ্যাভাব ও খাদ্য ঘাটতি মোকাবিলা করার জন্য বেশ কয়েকটি দেশের সঙ্গে খাদ্যশস্য ক্রয়ের চুক্তি সম্পাদন করেন বঙ্গবন্ধু। এ সময় হঠাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্যশস্য সরবরাহকারী কোম্পানিগুলো কয়েকটি চালান বাতিল করে দেয়। পি এল ৪৮০-এর অধীনে যে খাদ্যশস্য পাঠানোর কথা ছিল অজ্ঞাত কারণে তাও বিলম্বিত হয়। এর কিছুদিন পর ২৯শে অক্টোবর মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশ সফরে আসেন এবং বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দুই ঘণ্টাব্যাপী বৈঠকে মিলিত হন। বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে তিনি বলেন, 'A man of vast conception had rarely met a man who is the Father of his nation and this was a particularly unique experience for me'–এভাবে হেনরি কিসিঞ্জারও বঙ্গবন্ধুকে জাতির জনক বলে স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন।

বিবিসি এক জরিপে বিশজন বাঙালিকে চিরকালের সেরা বাঙালি ঘোষণা করেছে। এতে যাদের নাম এসেছে তাঁরা চিরকালের ভাস্বর বাঙালি। এদের অনেকে বাংলাদেশি নয়, তাঁরা বাঙালি। যে বিশজন নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁরা হলেন:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, লালন শাহ, শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক, মজলুম জননেতা ভাসানী, মহাবীর তিতুমীর, রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বেগম রোকেয়া, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, ভাষা আন্দোলনের চারজন শহিদকেও সেরা বাঙালির তালিকায় আনা হয়েছে।

আরো এ তালিকায় আসতে পারতেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র, সূর্যসেন, প্রীতিলতা, ইলামিত্র, শ্রী চৈতন্য দেব, মহাকবি আলাওল, আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ– এদের মতো আরও অনেকে। তবে শ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে বঙ্গবন্ধুকে নির্বাচন করে অসংখ্য শ্রোতা একটি চিরভাস্বর এবং অবিনশ্বর সিদ্ধান্ত দিয়ে রেখে গেল। বাঙালির মর্যাদা, বাঙালির মহিমা নতুন করে নতুন প্রজন্মের কাছে আবার জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল। একটি জাতির জন্য জরিপ বড়ো দরকার ছিল। সর্বশেষ উজ্জ্বল সংবাদটি হলো, বাংলার স্বাধীনতার প্রধানতম স্থপতি, স্বাপ্নিক, নির্ভীক এবং বাংলাপ্রেমী বঙ্গবন্ধুর সর্বশ্রেষ্ঠ আসনটি স্থায়ী হয়েছে। তাই আমরা বলতে পারি বঙ্গবন্ধু আমাদের বাঙালি জাতির অহংকার। ১৭ই মার্চ ১৯২০ সালে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় এ মহামানব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মদিবসকে ১৯৯৭ সাল থেকে 'জাতীয় শিশু দিবস' হিসেবে পালন করা হচ্ছে। এমন দেবতুল্য মানুষই এদেশের আগামী প্রজন্মের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হতে পারে। তাই ১৭ই মার্চ জাতীয় শিশু দিবসের প্রাক্কালে তাঁর স্মৃতির প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা। আজকের শিশুদের মধ্য থেকে গড়ে উঠুক হাজারো বঙ্গবন্ধু–এটাই প্রত্যাশা।

বঙ্গবন্ধুই বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ ও দেশের মানুষের মনকে জয় করেছেন, জয় করেছেন নির্যাতিত-নিপীড়িত এবং শোষিত বিশ্ববাসীর হৃদয়ও। বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাঙালির প্রাণের মানুষ। বাংলাদেশের মানুষ বঙ্গবন্ধুকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন। বঙ্গবন্ধু আজীবন বাঙালির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য কাজ করেছেন। বাংলাদেশের মানুষের জন্যই তিনি জেল-জুলুম, অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করেছেন। জীবন দিয়ে বাঙালির মুক্তির জন্য কাজ করেছেন। বাঙালি জাতিকে এবং বাংলার মানুষকে তিনি দৃঢ় মনে বিশ্বাস করতেন। ১৭ই মার্চ এই অপূর্ব গুণাবলিসম্পন্ন মানুষটির জন্মদিনে আমাদের শিশুদের সমস্বরে বলি, 'বঙ্গবন্ধু আমাদের বাঙালি জাতির অহংকার।'

লেখক: সাংবাদিক

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ বিশ্বপ্রামাণ্য ঐতিহ্য

বীরেন মুখার্জী

ইউনেস্কোর 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারে' অন্তর্ভুক্ত হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ। তথ্য মতে, ইউনেস্কোর 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড' (এমওডব্লিউ) কর্মসূচির ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডভাইজরি কমিটি ২৪ থেকে ২৭শে অক্টোবর প্যারিসে দ্বিবার্ষিক বৈঠক শেষে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণসহ মোট ৭৮টি দলিলকে 'ডকুমেন্টারি হেরিটেজ' হিসেবে 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারে' যুক্ত করার সুপারিশ দেয়। এরপর মহাপরিচালক ইরিনা বোকোভা ওই সুপারিশে সম্মতি দিয়ে বিষয়টি ইউনেস্কোর নির্বাহী পরিষদে পাঠিয়ে দেন এবং ৩০শে অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে সেই তথ্য প্রকাশ করেন। 'ডকুমেন্টারি হেরিটেজ' হলো সেইসব নথি বা প্রামাণ্য দলিল, বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে যার ঐতিহ্যগত অবদান আছে। আর সেসব ঐতিহ্যের তালিকা হলো 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার'। এসব দলিল সংরক্ষণের পাশাপাশি বিশ্বের মানুষ যাতে এ বিষয়ে জানতে পারে সেজন্য ১৯৯২ সালে এ কর্মসূচি শুরু করে ইউনেস্কো। এতদিন এই তালিকায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মোট ৪২৭টি নথি ও প্রামাণ্য দলিল ছিল। ২০১৬ ও ২০১৭ সালে আসা প্রস্তাবগুলোর মধ্যে ৭৮টিকে 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারে' যুক্ত করার সুপারিশে সমর্থন দেওয়ার পর ইউনেস্কোর মহাপরিচালক ইরিনা বোকোভা বলেছেন, 'আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এসব স্মৃতি ও দলিল সংরক্ষণের এ কর্মসূচি এমনভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত, যাতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আলোচনা, সহযোগিতা, পারস্পরিক বোঝাপড়া ও শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়।' আর ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পাওয়ার খবরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাহমুদ আলী বলেন, 'একাত্তরের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণ ছিল অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধার স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দেওয়ার অনুপ্রেরণার উৎস। আজও দেশে বিভিন্ন জাতীয় দিবসে বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণ মাইকে বাজতে শোনা যায়। আজও সেই ভাষণ বাঙালির হৃদয়ে উদ্দীপনা জাগায়। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ এখনো যেভাবে মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে, আগামী প্রজন্মকেও একইভাবে অনুপ্রেরণা জোগাবে।'

বলার অপেক্ষা রাখে না, একটি জাতির জাগরণে, একটি রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে, দিনের পর দিন সশস্ত্র গেরিলা ও তাদের সমর্থক, সহায়তাকারী, আশ্রয়দাতা নিরস্ত্র মানুষকে উদ্দীপ্ত রাখতে একাত্তরের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক দিকনির্দেশনামূলক ওই ভাষণের ভূমিকা কতটা সুদূরপ্রসারী তা শুধু বাঙালিই নন, বিশ্ববাসীও প্রত্যক্ষ করেছেন। একাত্তরে বাঙালির জাতীয় জীবনের টানটান উত্তেজনার গভীরতম সংকটের পটভূমে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধুর অবস্থান নানা সময়ে নানাভাবে আলোচিত হয়েছে। ৭ কোটি মানুষকে জাতীয় চেতনায় উদ্বেলিত ও ঐক্যবদ্ধ করে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের মাধ্যমে অধিকার আদায়ের লড়াইকে এমন এক সন্ধিক্ষণে তিনি নিয়ে এসেছিলেন, যেখানে বর্বর সামরিক শক্তির মুখোমুখি হয়ে আগামীর পথে অগ্রসর হওয়ার শক্তি ও সম্ভাবনা সম্পূর্ণই নির্ভর করছিল তাঁর ওপর। বঙ্গবন্ধু সেই ঐতিহাসিক দায় কীভাবে মোচন করেছিলেন এবং অবিস্মরণীয় এক ভাষণের মধ্য দিয়ে কীভাবে মুক্তিপথে পরিচালনার মাধ্যমে সংহতরূপে দাঁড় করিয়েছিলেন বাংলার মানুষকে, দীর্ঘদিন পর হলেও ইউনেস্কোর স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে তা আবারো প্রতিষ্ঠিত হলো। বাঙালির রাজনৈতিক মহাকাব্য খ্যাত বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি বিশ্ব জয় করার মধ্য দিয়ে বাঙালির গৌরবের মুকুটে আরেকটি সোনালি পালক যুক্ত হলো।

৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণটিকে নানাভাবে বিশ্লেষণ ও গবেষণা করেছেন দেশি-বিদেশি বিশ্লেষকরা। বিভিন্ন গবেষণায় প্রতিফলিত হয়েছে ভাষণটির অন্তঃস্থিত রাষ্ট্রচেতনা, কাব্যময়তা, সমাজচেতনা, জাতীয়তা এবং লোকঐতিহ্যের নানাদিক। এ ভাষণে প্রতিরোধ আন্দোলনের পাশাপাশি প্রত্যাঘাতের আহ্বান 'লোকভাষায়' ব্যক্ত করে বঙ্গবন্ধু মহান এক লোকনায়কের ভূমিকায় উন্নীত হন, যার তুলনীয় নেতৃত্ব জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিশ্ব প্রেক্ষাপটেও বিরল। পৃথিবীতে অনেক অবিস্মরণীয় ভাষণ আছে। আর আছেন চিরঞ্জীব বক্তা। সাহিত্য-সংস্কৃতির ভাষ্যকার বুদ্ধিবাদী মানুষের অভাব নেই। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে বক্তার সংখ্যা খুব বেশি নেই। প্রাচীন গ্রিসের ডিমোস্থেনেস (খ্রিষ্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২) সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক বক্তা হিসেবে পরিচিত। স্বদেশের মুক্তির জন্য তাঁর তিনটি বক্তৃতা অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। শোনা যায়, বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে এ মহান বক্তা শেষে আত্মহত্যা করেছিলেন। আর ছিলেন অ্যাডমন্ড বার্ক (১৭২৯-৯৭)। তিনি ভারতের গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংসের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রথম দৃষ্টি উন্মোচনকারী অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন। ফরাসি বিপ্লবের বিরুদ্ধে তিনিই প্রথম বিরূপ ধারণা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতা চিরকালের সম্পদ হয়ে আছে। আর একটি বক্তৃতা আছে প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের। অতি সাধারণ মানুষ থেকে অধ্যবসায় ও সাধনার জোরে নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে। ১৮৬৩ সালের ১৯শে নভেম্বর গেটেস্‌বার্গের যুদ্ধে শহিদের সমাধিভূমি উদ্‌বোধনের কারণে মাত্র দুই মিনিট বক্তৃতা করেছিলেন আব্রাহাম লিংকন। গৃহযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত আমেরিকান সংহতি ও স্বদেশের কল্যাণের জন্য লিংকন অতি ক্ষুদ্র একটি বক্তব্য উপস্থিত করেছিলেন। বলেছিলেন, গভর্নমেন্ট অব দ্য পিপলস, ফর দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল। বঙ্গবন্ধুও জাতির এই ক্রান্তিকালে স্বাধীনতাকামী ৭ কোটি বাঙালির উদ্দেশে মাত্র ১৯ মিনিটের যুক্তিপূর্ণ অথচ আবেগময়, সংক্ষিপ্ত অথচ সুদূরপ্রসারী, ইঙ্গিতপূর্ণ অথচ অর্থবহ বাক্য ব্যবহার করে যে ভাষণ দেন, তা আজও আপামর বাঙালিকে একাত্তরের মতোই সমভাবে উদ্দীপ্ত করে। ভাষণের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও গবেষণায় নিত্যনতুন দিকও উন্মোচিত হচ্ছে। আর এ ভাষণের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি বিশ্ব ইতিহাসের নতুন এক শিখরে পৌঁছে গেল।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ 'বিশ্বপ্রামাণ্য ঐতিহ্যে'র স্বীকৃতি অর্জন উপলক্ষে ২৫শে নভেম্বর ২০১৭ ঢাকায় আনন্দ শোভাযাত্রার একাংশ–পিআইডি

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ভাষণ প্রদানের জন্য বঙ্গবন্ধু যখন সভামঞ্চে এসে দাঁড়ালেন তখন শ্রোতামণ্ডলীর কাছে বড়ো হয়েছিল আশু সংকটময়তা, গণতান্ত্রিক রায় পদদলনকারী পাকিস্তানি সামরিক শাসকগোষ্ঠীর কবল থেকে মুক্তির জন্য কী হবে চূড়ান্ত পদক্ষেপ তা জানা। বঙ্গবন্ধু ভাষণের ছত্রে ছত্রে সেই

জাতীয় কর্তব্যের রূপরেখা মেলে ধরেছিলেন। তিনি জাতীয় মুক্তির গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ভবিষ্যৎমুখী আন্তর্জাতিক মাত্রা ও গ্রহণযোগ্যতা জুগিয়েছিলেন উচ্চকণ্ঠে সংগ্রামের গণতান্ত্রিক অধিকার ও দাবি উত্থাপন করে। তিনি কথা বলেছিলেন কেবল বাংলার প্রতিনিধি হয়ে নয়, পাকিস্তানের ইতিহাসের ২৩ বছরে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতাপ্রাপ্ত দলের নেতা হিসেবে। তিনি বলেছিলেন, 'আমি শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে (ইয়াহিয়া খানকে) অনুরোধ করলাম ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না।' আরেকবার তিনি বলেছিলেন, 'আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ, আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে'। গণতন্ত্র ও শান্তিপূর্ণ সংগ্রামের প্রত্যয় ব্যক্ত করেই বঙ্গবন্ধু ডাক দিয়েছিলেন সম্ভাব্য সশস্ত্র আঘাত মোকাবিলায় উপযুক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলার। অসাধারণ প্রজ্ঞার পরিচয় প্রতিভাত তাঁর ঘোষণায়, যার ফলে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম স্নায়ুযুদ্ধপীড়িত বিশ্বে কোনো এক পক্ষের সংগ্রাম না হয়ে অর্জন করে সর্বজনীন সমর্থন, যে সমর্থনের বীজ নিহিত ছিল ৭ই মার্চের ভাষণে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলার লোকঐতিহ্য ও জীবনধারার গভীর থেকে উঠে আসা ব্যক্তি হিসেবে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের নেতৃত্ব ভূমিকায়। জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে তিনি যে কতটা সার্থক হয়ে উঠেছিলেন, তার পরিস্ফুটন ঘটেছিল সংকটময় মার্চ মাসে তাঁর অবস্থান ও ভূমিকা এবং ৭ই মার্চের ভাষণের মধ্যে। তিনি বক্তব্যে যেমন গভীরভাবে জাতীয়তাবাদী, তেমনি আন্দোলনের স্বাদেশিক রীতির নব রূপায়ণ এবং প্রসার ঘটালেন সার্বিক ও সক্রিয় অসহযোগের ডাক দিয়ে, যে অসহযোগে শামিল ছিল ব্যাপক জনতা এবং সব সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। অসহযোগ আন্দোলন ও ৭ই মার্চের ভাষণের আবেদন উপচে পড়েছিল। পাকিস্তানি রাষ্ট্রকাঠামোতে সামরিক-আধা সামরিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সব বাঙালি সদস্যের ওপর এবং এর প্রতিফল জাতি লাভ করল মুক্তিযুদ্ধের সূচনা থেকেই। বক্তৃতার রূপ হিসেবেও প্রচলিত রাজনৈতিক ভাষণের কাঠামো সম্পূর্ণভাবে পরিহার করে বঙ্গবন্ধু এমন এক সৃজনশীলতার পরিচয় দিলেন, যা দেশের মাটির গভীরে শেকড় জড়িত করা ও গণসংগ্রামের দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়া অনন্য নেতার পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল।

তিনি বক্তৃতা শুরু করেছিলেন 'ভায়েরা আমার' সম্বোধন দিয়ে। সব রকম পোশাকি রীতি ও আড়ম্বর বর্জন করে লাখো মানুষের মুখোমুখি হয়ে এমন অন্তরঙ্গ, প্রায় ব্যক্তিগত সম্বোধন যে সম্ভব, তা কে কখন ভাবতে পেরেছিল! ভাষণের প্রথম বাক্যটিও একান্ত ব্যক্তিগত ভঙ্গিতে বলা যায়, যেন ঘনিষ্ঠজনের কাছে মনের নিবিড়তম অনুভূতির প্রকাশ, 'আজ দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি'। এরপর তিনি যখন বাংলার মানুষের আত্মদানের কথা বললেন, তাদের মুক্তি-আকুতির প্রকাশ ঘটালেন, তখন সেই অন্তরঙ্গ ভঙ্গি রূপ পেল জনসভার ভাষণে; কিন্তু তারপরও হারালো না বিষয়ের সঙ্গে নিবিড় সম্পৃক্তি। তিনি বললেন, 'আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়'। তিনি বাঙালির এমন গম্ভীর ও সংকটময় সময়ে দাঁড়িয়েও বাংলার লৌকিক শব্দ ও ক্রিয়াপদ ব্যবহারের মাধ্যমে ভাষণটিকে মৃত্তিকাসংলগ্ন করে তুললেন।

১. আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই যে,

২. যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়,

৩. রক্তে পাড়া দিয়ে, শহিদের ওপর পাড়া দিয়ে এসেম্বলি খোলা চলবে না।

৪. সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না।

৫. আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না।

৬. রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইন্‌শাল্লাহ্।

'আমার লোককে, রক্তে পাড়া, দাবায় রাখতে, ইনশাল্লাহ, এসেম্বলি খোলা' শব্দগুলোর সৌরভ ও মহিমা নিয়ে ৭ই মার্চের ভাষণ বাংলায় প্রকৃত এবং লোকায়ত ভাষণ হয়ে উঠল। এমন অকৃত্রিম ব্যঞ্জনা ও শব্দ সম্পদ দ্বারা আলোকিত প্রকৃত ও প্রাকৃত বাংলা আর কে দেবে?' ভাষণে যখনই তিনি মানুষের কথা বলেছেন, সেখানে আর কোনো নৈর্ব্যক্তিকতার অবকাশ থাকেনি, এই মানুষেরা যে তাঁরই মানুষ, একান্ত আপনজন। বুকভরা ভালোবাসা ও বেদনা নিয়ে তিনি বলেছেন, '৭ই জুনে আমাদের ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।' 'জামার পয়সা দিয়ে যে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে আমার দেশের গরিব, দুঃখী, আর্তমানুষের মধ্যে, তাদের বুকের ওপর হচ্ছে গুলি'। 'কার সঙ্গে বসব, যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে তাদের সঙ্গে বসব'? 'গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে'। 'আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়',–এভাবে বারবার তিনি উচ্চারণ করেছেন আমার মানুষ, আমার দেশের গরিব-দুঃখী, আমার লোক। এসব উচ্চারণ উৎসারিত হয়েছে মানুষের সঙ্গে নিবিড় একাত্মতার মধ্য দিয়ে এবং প্রায় তিন দশকের দীর্ঘ ও কঠিন গণসংগ্রামের পথ বেয়ে বঙ্গবন্ধু অর্জন করেছিলেন গণমানুষের সঙ্গে এই বিশেষ সম্পৃক্ততা। বক্তৃতার শেষে অমোঘ ঘোষণার মধ্য দিয়ে ইতিহাসের গতিপথ নির্ধারণ করে দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বললেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। এ দুটি বাক্য উচ্চারণের মধ্য দিয়ে সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তেই বাংলাদেশ হয়ে গেল স্বাধীন, যদিও আইনগত ও বস্তুগত ভিত্তি রচনা তখনো ছিল বাকি। তবে সর্বজনের মানসলোকে স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করে সেই পথ তো উন্মোচন করে দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। ব্যতিক্রমী লেখক আহমদ ছফা বঙ্গবন্ধুকে বলতেন 'বাংলার ভীম', মধ্যযুগের বাংলার লোকায়ত যে নেতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্বাধীন রাজ্যপাট, নির্মাণ করেছিলেন মাটির দুর্গ, ভেতর গড়ে যে দুর্গ প্রাচীর এখনো দেখতে পাওয়া যায়, মাটির হলেও পাথরের মতো শক্ত। বাংলার ইতিহাসের এমন অনন্য নির্মাণ কীর্তির তুলনীয় আর কিছু যদি আমাদের খুঁজতে হয়, তবে বলতে হবে ৭ই মার্চের ভাষণের কথা। যেমন ছিল মধ্যযুগের বাংলার রাজা ভীমের গড়া পাথরের মতো শক্ত মাটির দুর্গ, তেমনি রয়েছে বিশ শতকের বাংলার লোকনেতা মুজিবের ভাষণ, যেন বা মাটি দিয়ে গড়া, তবে পাথরের মতো শক্ত।

দুঃখজনক নির্মম বাস্তবতা হলো, মানবতা ও বাংলাদেশের শত্রুপক্ষ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সপরিবার বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করতে পারলেও, বাঙালির মন থেকে বঙ্গবন্ধুকে মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি এবং হবেও না। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরও বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের জন্য আরো বেশি প্রাসঙ্গিক ও অপরিহার্য হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। বলা হয়ে থাকে, জীবিত মুজিব থেকে মৃত মুজিব আরো বেশি শক্তিশালী। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর বাংলাদেশ পুনরায় অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে থাকে এবং পাকিস্তানিকরণ শুরু হয়। কিন্তু এখন বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনা দেশের নানা বৈরী বাস্তবতা মোকাবিলা করে বাংলাদেশকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছেন। উন্নয়নের স্পর্শে বদলে যাচ্ছে শহর-বন্দর-গ্রাম। তথ্যপ্রযুক্তির বিশাল বিস্তার ঘটেছে, নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে পদ্মা সেতু। নারীর ক্ষমতায়নসহ নানা ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য এখন প্রতিবেশী দেশগুলোর জন্যও দৃষ্টান্ত। আর বঙ্গবন্ধুর ভাষণের 'বিশ্বপ্রামাণ্য ঐতিহ্য'র স্বীকৃতিও বর্তমান সরকার তথা আওয়ামী লীগের বিশাল অর্জন বললেও অত্যুক্তি হয় না।

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক এ ভাষণটি বিশ্ব স্বীকৃতি পাওয়ায় বিশ্ববাসী এখন জাতির পিতা এবং বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবে। বর্তমানে ও ভবিষ্যতেও বিশ্বের অবহেলিত, নির্যাতিত, বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে এ ভাষণ বিপুল অনুপ্রেরণা জোগাবে। বিশ্বের কালজয়ী এই মহাকাব্যটি এখন থেকে বিশ্বের প্রথম ও সর্বশেষ মুখে উচ্চারিত মহাকাব্যের অনুপম দৃষ্টান্ড় হয়ে থাকবে, বাঙালির কাছে এর চেয়ে পরম গৌরবের আর কিছু হতে পারে না।

লেখক: কবি, গবেষক ও গণমাধ্যমকর্মী

ভাস্কর্যে মুক্তিযুদ্ধ

শামস সাইদ

ত্রিশ লক্ষ শহিদের জীবন, অসংখ্য মানুষের রক্ত ও তিন লক্ষ মা-বানের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি মাতৃভূমির স্বাধীনতা। তাঁদের এ আত্মত্যাগের বিনিময়ে জন্ম হয়েছে 'বাংলাদেশ' নামে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র। আমাদের সেই মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রতীক ভাস্কর্য। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে যুদ্ধের রূপক সাক্ষ্য হিসেবে তৈরি হয়েছে এসব ভাস্কর্য। যা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ব্রোঞ্জের শরীরে প্রতীকী ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করার চেষ্টা করেছে। এসব ভাস্কর্যের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে বাঙালির প্রতিবাদ, মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি, ত্যাগ, তিতিক্ষা, গতি-উদ্যম, বীরত্ব, গণহত্যাসহ অসংখ্য চিত্র। ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিশালাকার ম্যুরাল-স্মৃতিপীঠ নির্মিত হয়েছে অনেক। নিম্নে কয়েকটি ভাস্কর্যের কথা তুলে ধরা হলো।

স্বাধীনতা সংগ্রাম ভাস্কর্য

স্বাধীনতা সংগ্রাম বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো ভাস্কর্য। এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুলার রোডের সলিমুল্লাহ হল, জগন্নাথ হল ও বুয়েট সংলগ্ন সড়কদ্বীপে স্থাপিত। ভাস্কর শামীম শিকদার ১৯৮৮ সালে 'অমর একুশে' নামে একটি বিশাল ভাস্কর্য নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে ভাস্কর্যটির অবয়ব পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে 'স্বাধীনতা সংগ্রাম' নাম দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের আলোকে নতুনভাবে নির্মাণ করেন। একইসঙ্গে সড়কদ্বীপটিকেও তিনি নিজের মনের মতো গড়ে তোলেন। ১৯৯৯ সালের ৭ই মার্চ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এটি উদ্‌বোধন করেন।

স্বাধীনতা সংগ্রাম ভাস্কর্যটি বাঙালি জাতির গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রামের ইতিহাসকে ধারণ করে নির্মিত।

মূল ভাস্কর্য স্বাধীনতা সংগ্রামকে ঘিরে রয়েছে দেশ-বিদেশের শতাধিক কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক, বিপ্লবী, রাজনীতিক, বিজ্ঞানীর আবক্ষ মোট ১১৬টি ভাস্কর্য। সবগুলো ভাস্কর্যের রং শ্বেত-শুভ্র। শ্বেতবর্ণের এ ভাস্কর্যের উচ্চতা ৭০ ফুট। পরিসীমা ৮৫.৭৫ ফুট। একটি গোলাকার ফোয়ারার মাঝখানে এটি উপস্থাপিত।

অপরাজেয় বাংলা

সারা দেশের মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্যের আইকন বলা হয় 'অপরাজেয় বাংলা'কে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের সামনে বেদিতে দাঁড়ানো আছে তিন মুক্তিযোদ্ধার অবয়ব এই ভাস্কর্যটি। ১৯৭৩ থেকে '৭৯– সাত বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম, বাধাবিপত্তি পেরিয়ে শেষ হয় মুক্তিযুদ্ধের এ স্মারক ভাস্কর্য নির্মাণ। এটি মূর্ত করে তুলেছেন শিল্পী আব্দুল্লাহ খালিদ।

একাত্তরে এখানেই প্রথম উড়েছিল স্বাধীনতার পতাকা। ভাস্কর্যটি ত্রিকোণ বেদি– মাটি থেকে ১৮ ফুট উঁচু, বেদির ওপর ১২ ফুট উঁচু তিনটি ফিগার। দৃপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়ানো সশস্ত্র দুই যোদ্ধা পুরুষ, ফার্স্ট এইড বক্স নিয়ে শুশ্রূষার উৎস এক নারী।

স্বোপার্জিত স্বাধীনতা ভাস্কর্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি সড়কদ্বীপে অবস্থিত বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্মারক ভাস্কর্য 'স্বোপার্জিত স্বাধীনতা'। ১৯৭১-এর রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মরণে এই ভাস্কর্যটি স্থাপিত হয়েছে। ভাস্কর্যটি মাটি থেকে ১৩ ফুট উঁচু, ৮ ফুট ৪ ইঞ্চি প্রস্থ এবং ১২ ফুট ৪ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য একটি বেদির ওপরে স্থাপিত হয়েছে।

১৯৮৮ সালের ২৫শে মার্চ অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক এ ভাস্কর্যটির আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করেন। ভাস্কর্যটি নির্মাণ করেন চারুকলা ইনস্টিটিউটের শিক্ষিকা অধ্যাপিকা শামীম সিকদার। ভাস্কর্য কর্মে সহায়তা করেন হিমাংশু রায় ও আনোয়ার চৌধুরী।

সাবাস বাংলাদেশ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক দিয়ে ঢুকলেই মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেরা ভাস্কর্যগুলোর একটি 'সাবাস বাংলাদেশ'। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনের দক্ষিণে ১৯৯১ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ৪০ বর্গফুট জায়গার ওপর ভাস্কর্যটি দাঁড়িয়ে আছে। রয়েছে দুজন বীর মুক্তিযুদ্ধার প্রতিকৃতি। একজন রাইফেল উঁচু করে দাঁড়িয়ে, যা গ্রামবাংলার যুবকের প্রতিনিধিত্ব করে। অন্যজন রাইফেল হাতে দৌড়ের ভঙ্গিতে রয়েছে। যেটি শহুরে যুবকের প্রতীক। পরনে প্যান্ট, মাথায়

এলোমেলো চুলের প্রাচুর্য যেন আধুনিক সভ্যতার প্রতীক। পেছনে ৩৬ ফুট উঁচু একটি দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে। দেয়ালের উপরের দিকে এক শূন্য বৃত্ত, যা দেখতে সূর্যের মতো। ভাস্কর্যটির নিচের দিকে ডান ও বাম উভয় পাশে ৬ ফুট বাই ৫ ফুট উঁচু দুটি ভিন্ন চিত্র খোদাই করা হয়েছে। ডানদিকের দেয়ালে রয়েছে দুজন যুবক-যুবতীর চিত্র। যুবকের কাঁধে রাইফেল, মুখে কালো দাড়ি, কোমরে গামছা বাঁধা, যেন এক বাউল প্রতিকৃতি। আর গাছের নিচে যুবতীর হাতে একতারা। বাম দিকের দেয়ালে রয়েছে আরেক চিত্রপট। মায়ের কোলে শিশু, দুজন যুবতী–একজনের হাতে পতাকা। গেঞ্জি পরা এক কিশোর পতাকার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে।

চেতনা '৭১

চেতনা '৭১ ভাস্কর্য শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত। এই বেদিটি তৈরি লাল ও কালো সিরামিক ইট দিয়ে।

তিনটি ধাপের নিচের ধাপের ব্যাস ১৫ ফুট, মাঝের ধাপ সাড়ে ১৩ ফুট এবং উপরের ধাপটি ১২ ফুট। প্রত্যেকটি ধাপের উচ্চতা ১০ ইঞ্চি। বেদির ধাপ ৩টির উপরে মূল বেদিটি ৪ ফুট উঁচু, তার উপরে রয়েছে ৮ ফুট উচ্চতার মূল ফিগার।

দূর থেকে দেখলে মনে হয় খোলা আকাশের নিচে ভাস্কর্যটি নির্ভীক প্রহরীর মতো স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার জন্য মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এর নকশা প্রণয়ন করেন নৃপল খান।

সংশপ্তক

সংশপ্তক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিতর্পণমূলক ভাস্কর্যগুলোর অন্যতম। এটি ভাস্কর হামিদুজ্জামানের তৈরি। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে এক পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে এ ভাস্কর্যটি। ১৯৯০ সালের ২৬শে মার্চ এই ভাস্কর্যটি নির্মাণ করা হয়।

বেদির উচ্চতা ১৫ ফুট এবং মূল ভাস্কর্যের উচ্চতা ১৩ ফুট। মূল ভাস্কর্যটি ব্রোঞ্জ ধাতুতে তৈরি। সংশপ্তক হলো ধ্রুপদী যোদ্ধাদের নাম। আগামী প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চেতনাকে দৃশ্যমান করার লক্ষ্যেই 'সংশপ্তক' প্রতিষ্ঠা করা হয়।

রায়েরবাজার শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ

১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয়ের মাত্র দুদিন আগে অপহৃত হন অনেক বুদ্ধিজীবী। পরে তাঁদেরকে নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। এই বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতির উদ্দেশ্যেই নির্মিত হয়েছে রায়েরবাজার শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ। ঢাকার মোহাম্মদপুরে ঢাকা শহর রক্ষা বাঁধের পাশে এটির অবস্থান। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের দুদিন পরে যে ইটখোলায় বুদ্ধিজীবীদের মরদেহগুলোর সন্ধান পাওয়া যায় সেই স্থানেই শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এটি নির্মাণ করা হয়। সৌধটির নকশা করেন যৌথভাবে স্থপতি ফরিদ উদ্দিন আহমেদ ও স্থপতি

জামি আল শফি। মূল বেদিটি ভূমি থেকে ২ দশমিক ৪৪ মিটার উঁচু। দুই দিকের কোনার অংশে ভাঙা একটি অমসৃণ লাল দেয়াল সৌধটির অন্যতম প্রধান একটি অংশ।

জাগ্রত চৌরঙ্গী

জাগ্রত চৌরঙ্গী মহান মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের অসামান্য আত্মত্যাগের স্মরণে নির্মিত ভাস্কর্য। আবদুর রাজ্জাক জাগ্রত চৌরঙ্গীর ভাস্কর। এ স্মৃতিসৌধটি ১৯৭৩ সালে নির্মাণ করা হয়। ডান হাতে গ্রেনেড, বাঁ হাতে রাইফেল। লুঙ্গি পরা, খালি গা, খালি পা আর পেশিবহুল এ ভাস্কর্যটি গাজীপুর জেলার জয়দেবপুর চৌরাস্তার ঠিক মাঝখানে সড়কদ্বীপে অবস্থিত। ভিত বা বেদিসহ জাগ্রত চৌরঙ্গীর উচ্চতা ৪২ ফুট ২ ইঞ্চি। ১৬ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৩ নম্বর সেক্টরের ১০০ জন ও ১১ নম্বর সেক্টরের ১০৭ জন শহিদ সৈনিক ও মুক্তিযোদ্ধাদের নাম উৎকীর্ণ করা আছে।

মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর ভাস্কর্য

মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনানায়ক এমএজি ওসমানী। ২৫শে মার্চ ১৯৭১ দখলদার পাকিস্তানি সৈন্যরা গণহত্যা শুরুর পর ২৬শে মার্চ থেকে প্রতিরোধ যুদ্ধ গড়ে ওঠে। সেই মাসেই গোটা দেশকে ভাগ করা হয় ১১টি সেক্টরে। সেক্টরগুলোর নেতৃত্ব দেওয়া হয় এক একজন সেক্টর কমান্ডারের হাতে। সেই ১১ সেক্টর নিয়ে আলাদা ভাস্কর্য করা হয়েছে। ওসমানী উদ্যানে মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর ভাস্কর্যে সাদা দেওয়ালের মাঝখানে খচিত বাংলাদেশের মানচিত্র রয়েছে।

বীরের প্রত্যাবর্তন

গুলশান দুই নম্বর ঘেঁষা ভাটারা ইউনিয়নের মোজাম্মেল হক বীরপ্রতীকের উদ্যোগে স্থাপিত হয়েছে ৫৯ ফুট ৬ ইঞ্চি উঁচু ভাস্কর্য 'বীরের প্রত্যাবর্তন'। ভাস্কর্যটির বেদির উচ্চতা ৪১ ফুট। উঁচু বেদির ওপর স্থাপিত রয়েছে এক মুক্তিযোদ্ধার অবয়ব। ২৮ ফুট উঁচু এ যোদ্ধা বিজয় ছিনিয়ে অস্ত্র কাঁধে বীরের বেশে ফিরছেন। বেদির নিচে ভাস্কর্যের বাকি অংশ গাছের গুঁড়ির আকার নিয়েছে। এখানে আছে একটি পাঠাগার। এই ভাস্কর্যটি সুদীপ্ত মল্লিক সুইডেনের হাতে গড়া।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ভাস্কর্য

একাত্তরের ৯ মাসে প্রাণ দিয়েছে হাজারো রেল কর্মকর্তা-কর্মচারী। তাঁদের স্মরণে রাজধানীর কমলাপুর রেলস্টেশনের সামনে স্থাপিত হয়েছে 'মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ভাস্কর্য'। উঁচু বেদির ওপর বসানো হয়েছে একটি রেলের ইঞ্জিন। তার ওপর মুক্তিযোদ্ধার হাত বেয়নেটসহ রাইফেল উঁচিয়ে ধরেছে। পাশেই উড়ছে বিজয় নিশান। রেল ইঞ্জিনের নিচে বেদির চারপাশে সিমেন্টে তৈরি ম্যুরালে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বাহান্ন থেকে একাত্তরের বিজয়ের ক্ষণ পর্যন্ত।

'৭১-এর গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি ভাস্কর্য

বাংলাদেশের একমাত্র ব্যতিক্রমধর্মী ভাস্কর্য '৭১-এর গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি'। ভাস্কর্যটি অবস্থিত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশমুখে নতুন ভবনের সামনে। ভাস্কর্যটির সামনে ও পেছনে দুটি অংশ রয়েছে। অত্যন্ত সুনিপুণ হাতে ভাস্কর্যটি তৈরি করেছেন ভাস্কর রাসা। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের

প্রস্তুতির চিত্রকে তিনি উপস্থাপন করেছেন তাঁর শৈল্পিক ভাস্কর্যের মাধ্যমে। এই শিল্পকর্মে তাকে সহযোগিতা করেছিলেন সহকারী ভাস্কর রাজীব সিদ্দিকী, রুমী সিদ্দিকী, ইব্রাহিম খলিলুর রহমান ও মিয়া মালেক রেদোয়ান। ভাস্কর্যটির কাজ শুরু হয় ১৯৮৮ সালে।

অদম্য বাংলা, ঠাকুরগাঁও

ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ পৌর শহরের শহিদ অধ্যাপক গোলাম মোস্তফা সড়কের পাশে আজাদ স্পোর্টিং প্রাঙ্গণে স্থাপিত এই ভাস্কর্যটি। ভাস্কর্যটি ৮ ফুট মূল স্তম্ভের ওপর ও পাঁচ ফুট উচ্চতা নিয়ে একজন মুক্তিযোদ্ধার স্মারক ভাস্কর্য। শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের মুক্তিযোদ্ধা হয়ে ওঠা ফুটিয়ে তুলতে ভাস্কর্যটিতে লুঙ্গি মালকাছা মারা, স্যান্ডো গেঞ্জি পরা কাদামাটি লাগা একজন কৃষকের অবয়ব তৈরি করা হয়েছে।

অদম্য বাংলা, খুলনা

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত এই ভাস্কর্যটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীকী রূপ হিসেবে মানা হয়। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদমিনারের সামনে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক হিসেবে এটি দণ্ডায়মান। একটি উঁচু বেদির ওপর স্থাপিত এই ভাস্কর্যটি। ভাস্কর্যটির উচ্চতা ২৩ ফুট। একজন নারীসহ চারজন মুক্তিযোদ্ধার প্রতিকৃতিতে এই ভাস্কর্যটি তৈরি। বেদির চারদিকের ম্যুরালে পোড়ামাটির প্রাচীর চিত্রে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ, বধ্যভূমির বর্বরতা, জাতীয় চার নেতার প্রতিকৃতি ও পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীর আত্মসমর্পণের চিত্র ফুটিয়ে তোলা

হয়েছে। ভাস্কর গোপাল চন্দ্র পাল অদম্য বাংলা ভাস্কর্যটি নির্মাণ করেন।

মুক্তবাংলা

মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নতুন প্রজন্মের মনে চির জাগ্রত রাখতে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্মিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম স্মারক ভাস্কর্য 'মুক্তবাংলা'। এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার শিক্ষক-শিক্ষার্থীর প্রাণের সঙ্গে মিশে আছে। আধুনিক স্থাপত্য

শিল্পের আঙ্গিকে ১৯৯৬ সালের ১৬ই ডিসেম্বর মেইন গেটের উত্তর পাশে স্থাপিত হয় এই 'মুক্তবাংলা'। খ্যাতিমান স্থপতি রশিদ আহমেদের নকশার ভিত্তিতে একে অপরূপ সৌন্দর্যে রূপ দেওয়া হয়। 'মুক্তবাংলা'র সাতটি স্তম্ভ সংবলিত গম্বুজের ওপর রয়েছে দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ মুক্তিযুদ্ধের হাতিয়ার রাইফেল, যা সাত সদস্যের মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রিসভার প্রতীক।

জয় বাংলা

মুক্তিযুদ্ধের বিমূর্ত স্মৃতি সদা উদ্ভাসিত রাখার প্রয়াসেই পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে 'জয় বাংলা' নামে একটি মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি ভাস্কর্য নির্মাণ করা হয়। ভাস্কর্যটির নকশা করেন বাংলাদেশের খ্যাতনামা ভাস্কর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের প্রফেসর হামিদুজ্জামান খান। স্বাধীনতার দীপ্ত স্লোগান 'জয় বাংলা' এদেশের মানুষকে যেমনভাবে উদ্বেলিত করেছে, তেমনভাবেই চিরদিন এই বলিষ্ঠ উচ্চারণ আপামর জনগণের কণ্ঠে ধ্বনিত হবে– সে প্রত্যাশায় ভাস্কর্যটির নাম দেওয়া হয় 'জয় বাংলা'।

মহান মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সমন্বয় রেখে ভাস্কর্যটির পাদদেশটি লাল রঙের সিরামিক ইট দিয়ে ঘেরা। এর ঠিক মাঝ বরাবর কালো গ্রানাইট পাথর দ্বারা সুসজ্জিত একটি আরসিসি বেদির ওপর ১৯ ফুট উঁচু স্টেনলেস স্টিলের তৈরি প্রতীকী এক মুক্তিযোদ্ধা, যার কাঁধে ঝুলানো আছে একটি রাইফেল, মাথায় গামছা বাঁধা ও হাতে রয়েছে স্বাধীন বাংলার পতাকা। ২০১১ সালের মার্চের শেষের দিকে নির্মিত হয় ভাস্কর্যটি।

ঘৃণিত রাজাকার

নতুন প্রজন্ম যেন রাজাকারদের ঘৃণা জানাতে পারে সেজন্য ২০০৯ সালে কুষ্টিয়ায় নির্মিত হয়েছে ভাস্কর্য 'ঘৃণিত রাজাকার'। কুষ্টিয়া শহরের মজমপুর গেটে স্থায়ীভাবে স্থাপন করা হয়েছে এই ঘৃণিত রাজাকার চত্বর। চত্বরে নির্মিত রাজাকারের ভাস্কর্যটি ২৫ ফুট লম্বা। এ ভাস্কর্যটি নির্মাণ করেন শিল্পী ইতি খান। ভাস্কর্যে তিনি রাজাকারদের রক্তাক্ত লোলুপ জিহ্বার পাশাপাশি হৃদয়ে পাকিস্তানি মনোভাব অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

অঙ্গীকার

চাঁদপুর জেলার মুক্তিযোদ্ধা সড়কের পাশের লেকে হাসান আলী সরকারি হাইস্কুল মাঠের সামনে একাত্তরের শহিদদের স্মরণে নির্মিত হয়েছে 'অঙ্গীকার' ভাস্কর্য। শিল্পী সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ ভাস্কর্যটির স্থপতি। সিমেন্ট, পাথর আর লোহা দিয়ে তৈরি ভাস্কর্যটিতে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা স্টেনগান উর্ধ্বে ধরে আছেন।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

বঙ্গবন্ধু থেকে বিশ্ববন্ধু

শ্যামল দত্ত

তাঁর কথা বলতে গেলেই মধুমতী নদীটি যেন থমকে দাঁড়ায়। ঝলমল করে ওঠে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রাম। তিনি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের মহান স্থপতি। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ টুঙ্গিপাড়ার শেখ পরিবারে তাঁর জন্ম। ১৯৪৮ থেকে শুরু করে '৫২-র ভাষা আন্দোলন, '৫৪-র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, '৬৬-র ৬ দফা, '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, '৭০-এর সাধারণ নির্বাচন এবং '৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রাম– ইংরেজ শাসনের পর বাঙালির অধিকার আদায়ের প্রতিটি সংগ্রামে সোচ্চার তাঁর বজ্রকণ্ঠ।

১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। জাতীয় পরিষদে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি এবং প্রাদেশিক পরিষদে ৩০০ আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন পেয়ে জয়ী হয়। কিন্তু পাকিস্তানি শাসক এই বিজয়কে মেনে নিতে পারে না। জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৭১-এর ১লা মার্চ সংসদ অধিবেশন স্থগিত করে দেন। স্বৈরশাসকের এই হঠকারিতার জবাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ডাকে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। আন্দোলনের চূড়ান্ত এক পর্যায় ৭ই মার্চ। এদিন তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু জাতির উদ্দেশে এক ভাষণ দেন। এই ভাষণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর বাসভবন ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে নেতাকর্মীদের প্রায় সারাদিন বৈঠক চলে। বৈঠকে ভাষণের একটি খসড়াও তৈরি করা হয়। বিদগ্ধ রাজনৈতিক নেতারা সেদিন তাঁকে অনেক পরামর্শও দিয়েছিলেন। কিন্তু ঘর থেকে বের হবার আগে সহধর্মিণী বেগম ফজিলাতুন নেছা স্বামীকে বলেছিলেন, কারো শেখানো কথা বলার দরকার নেই। তোমার মন থেকে যে কথা আসে, তাই বলবে। বঙ্গবন্ধু স্ত্রীর এই কথাটি রেখেছিলেন।

রেসকোর্স ময়দানে দিনভর অপেক্ষমান অসংখ্য জনতার সামনে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তা ছিল একান্তই তাঁর মনের কথা। বঙ্গবন্ধু সেদিন হয়ত ভুলেই গিয়েছিলেন তিনি সাড়ে সাত কোটি মানুষের নেতা। নিজেকে তিনি তাঁর সামনে অপেক্ষমান জনতারই একজন ভেবেছিলেন। আর তাই ভাষণে নিজের ঘরোয়া ভাষায় তিনি জনসাধারণের সামনে নিজেকে মেলে ধরেছিলেন। এই ভাষণের কিছু বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কখনো গভীর আবেগ আবার কখনো তেজোদীপ্ত কণ্ঠস্বর। এই ভাষণের মধ্য দিয়ে তিনি ১৯৪৭ পরবর্তী বাঙালির বঞ্চনার ইতিহাস যেমন বর্ণনা করেছেন, তেমনি ১৯৭০-এর নির্বাচনে জয়ী বাঙালি জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা না হলে তার পরিণতির কথাও উল্লেখ করেছেন স্পষ্ট ভাষায়। শুরুতেই শ্রোতা-দর্শকের সামনে নিজেকে তাদেরই একজন হিসেবে উপস্থাপন করেছেন: 'ভায়েরা আমার, আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি'। এরপর তিনি ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত বঞ্চিত বাঙালির করুণ ইতিহাসের কথা বর্ণনা করেছেন। সাধারণ নির্বাচনের পর পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী কীভাবে বিজয়ী বাঙালিকে তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখেছে, সেই প্রেক্ষাপটও উঠে আসে ভাষণে। আর সেই মুহূর্তেই তিনি ঘোষণা করেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না, আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাচারি, আদালত, ফৌজদারি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে'।

কিন্তু অনির্দিষ্টকালের জন্য সবকিছু বন্ধ করে দেওয়ার পর সাধারণ মানুষের যাতে অসুবিধা না হয়, সেজন্য তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বললেন, 'গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য... রিকশা, ঘোড়ারগাড়ি, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে।... ২৮ তারিখে কর্মচারীরা যেয়ে বেতন নিয়ে আসবেন'। এ ধরনের অসহযোগের ফলে শাসকগোষ্ঠী যদি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তারজন্য কী ব্যবস্থা নিতে হবে তারও স্পষ্ট নির্দেশনা ছিল তাঁর ভাষণে। বলেছেন, 'আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়, তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে'। স্বৈরশাসক বাঙালির ওপর নিপীড়ন চালাতে পারে, এই আশঙ্কা থেকে তিনি সেনানিবাসে থাকা সৈন্যদের উদ্দেশে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। বলেছেন, 'আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আমার বুকের ওপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না'।

গৃহযুদ্ধের এই চরম পরিস্থিতিতে অরাজকতা সৃষ্টি হতে পারে, সেই আশঙ্কাও ছিল তাঁর। সেজন্য প্রত্যেকের উদ্দেশে সতর্কবাণীও উচ্চারণ করেছেন, 'মনে রাখবেন শত্রুবাহিনী ঢুকেছে। নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি-ননবাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আপনাদের ওপর। আমাদের যেন বদনাম না হয়'। আরো বলেছেন, 'প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ্'। ঠিক এর পরই তিনি ঘোষণা করেছেন এই ভাষণের মর্মবাণী, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'।

সম্পূর্ণ অলিখিত একটি ভাষণের মধ্য দিয়ে গোটা জাতিকে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত করা ছিল এই ভাষণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। বোধহয় এই কারণেই বিশ্বের বরেণ্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যেও তিনি অনন্য, অসাধারণ। ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে জোট নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে ভাষণ দিয়েছিলেন। তাঁর সেই ভাষণও বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি বলেছিলেন, 'বিশ্ব শোষক আর শোষিত এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত, আমি শোষিতের পক্ষে'। তাঁর কথার সুরে সুর মিলিয়ে কিউবার প্রেসিডেন্ট বিপ্লবী নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রো বলেছিলেন, 'শোষিতের বাঁচার সংগ্রামে আমিও মুজিবের সাথী'। তিনি আরো বলেছিলেন, 'আমি হিমালয় দেখিনি কিন্তু শেখ মুজিবকে দেখেছি। ব্যক্তিত্ব ও সাহসিকতায় তিনিই হিমালয়'।

বিশ্বমানবতা ও শান্তির পক্ষে দৃঢ় অবস্থানের জন্য বঙ্গবন্ধু দেশে-বিদেশে নন্দিত হয়েছেন সবসময়। যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো তাঁকে শান্তি, ঐক্য ও প্রগতির মহানায়ক বলে উল্লেখ করেছেন। ১৯৭২-এর ১৭ই মার্চ, ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ঢাকায় এক জনসভায় বলেছিলেন, শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের বন্ধু। জাতিসংঘে প্রথম বাংলায় ভাষণ দিয়েও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। কেননা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর তিনিই প্রথম বিশ্বপরিমণ্ডলে বাংলা ভাষার মর্যাদা সমুন্নত করেছেন। নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষের পক্ষে কথা বলার পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠাতেও তাঁর ভূমিকা ছিল অসাধারণ। আর সেজন্য ১৯৭৩ সালে বিশ্ব শান্তি পরিষদের মহাসচিব রমেশচন্দ্র তাঁকে 'জুলিও কুরি' শান্তি পদকে ভূষিত করে বলেন, শেখ মুজিব শুধু বঙ্গবন্ধু নন, আজ থেকে তিনি বিশ্ববন্ধু।

যুক্তরাষ্ট্রের ষোড়শ প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন, ভারতের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী, শ্রীলঙ্কার স্বাধীনতার মূলনায়ক বন্দরনায়েকে, কিউবা বিপ্লবের রূপকার চে গুয়েভারা, কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের মুক্তির প্রতীক মার্টিন লুথার কিংসহ বিশ্ববরেণ্য অনেক নেতাকে আততায়ীর হাতে অথবা নির্মমভাবে প্রাণ দিতে হয়েছে। ঠিক

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ 'বিশ্বপ্রামাণ্য ঐতিহ্যে'র স্বীকৃতি অর্জন উপলক্ষে ২৫শে নভেম্বর ২০১৭ ঢাকায় আনন্দ শোভাযাত্রায় অংশ নেয় রাষ্ট্রপতির কার্যালয়–পিআইডি

সেভাবেই প্রাণ দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তবে তাঁর এই মৃত্যুর ঘটনা আরো নির্মম। স্বাধীনতার পরাজিত শত্রুদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট তাঁকে সপরিবার হত্যা করা হয়। ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতার রূপকার ও জাতির জনক আহমেদ সুকর্ণ জীবনের অন্তিমকাল নির্জন কারাগারে অতিবাহিত করেছেন। অথচ স্বাধীনতার এই মহানায়কেরা প্রত্যেকেই নিজের দেশ ও জাতির জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন।

১৭৭৫ সালের ২৩শে মার্চ যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া থেকে পেট্রিক হেনরি ব্রিটিশ আধিপত্যের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার ডাক দিয়ে বলেছিলেন, আমাকে স্বাধীনতা দাও, নয় দাও মৃত্যু। ১৮৬৩ সালের ১৯শে নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে পেনসেলভেনিয়ার গেটিসবার্গে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের পর আব্রাহাম লিংকন শুনিয়েছিলেন গণতন্ত্রের মূলকথা: জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা সরকার এবং জনগণের জন্য সরকার। ১৯৪০ সালের ১৩ই মে যুক্তরাজ্যের উইনস্টন চার্চিল দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে দেশের জনগণের উদ্দেশে বলেছিলেন, দেওয়ার মতো কিছুই নেই আমার। আছে শুধু রক্ত, কষ্ট, অশ্রু আর ঘাম। ১৯৪২ সালের ৮ই আগস্ট ভারতে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী জাতিকে স্বাধীনতার জন্য অহিংস আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে উচ্চারণ করেছেন চরম হুঁশিয়ারি, ভারত ছাড়ো। ১৯৫৩ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদবিরোধী নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠীকে শ্বেতাঙ্গ শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান করে বলেছেন, স্বাধীনতা অর্জনের কোনো সহজ পথ নেই। ১৯৬৩ সালের ২৮শে আগস্ট বর্ণবাদের বিষবাষ্পে উত্তাল যুক্তরাষ্ট্রেও কৃষ্ণাঙ্গ নেতা মার্টিন লুথার কিং বলেছিলেন, আমি স্বপ্ন দেখি– একদিন জাতি জেগে উঠবে, কারণ জন্মসূত্রে সবাই সমান।

বিশ্বনেতৃবৃন্দের এসব ঐতিহাসিক ভাষণের পাশাপাশি ১৯৭১-এর ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ভাষণটি এতদিন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের অনন্য দলিল হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু এখন বিশ্বের এক অমূল্য সম্পদ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে এই ভাষণ। জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা ইউনেস্কো ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণকে 'বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য দলিল' হিসেবে সম্প্রতি স্বীকৃতি দিয়েছে। ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক পরামর্শক কমিটি 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড' কর্মসূচির আওতায় এই স্বীকৃতি দেয়। ইউনেস্কো ১৯৯২ সালে এই কর্মসূচি চালু করে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের দালিলিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের তাগিদে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিপূর্বে ব্রিটিশ ঐতিহাসিক জ্যাকব এফ ফিল্ড বিশ্বের সেরা বক্তৃতাগুলোর একটি সংকলন গ্রন্থ বের করেন: 'উই শ্যাল ফাইট অন দ্য বিচেস: দ্য স্পিচেস দ্যাট ইন্সপায়ার হিস্ট্রি'। এই গ্রন্থেও স্থান পায় বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ফিল্ম ডিভিশন ৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর পুরো ভাষণটি ৩৫ মিলিমিটার ফিল্মে চিত্রায়ন করেছিল। পরে অনেক ঝুঁকি নিয়ে ফিল্ম ডিভিশনের বাঙালি কর্মীরা সযত্নে রক্ষা করেছিলেন জাতির ঐতিহাসিক প্রামাণ্য দলিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণ হিসেবে স্বীকৃত। এই ভাষণ এখনো বিদেশি শিক্ষাবিদ-গবেষকদের আগ্রহের বিষয়। তাঁরা মনে করেন, বিশ্বমানবতা ও মুক্তির দাবিতে অনবদ্য এই ভাষণ। জাতির স্বাধীনতা আদায়ের সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু কেবল নিজেকে উৎসর্গ করেননি, আন্দোলনের প্রতিটি স্তরে নেতৃত্ব দিয়েছেন। বিশ্বের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে যা সত্যিই বিরল। তাই সংগীতের সুর-মূর্ছনা আর শিল্পীর রংতুলি সবখানেই তিনি অসাধারণ। সাহিত্য-সংস্কৃতির মঞ্চেও বঙ্গবন্ধুর উজ্জ্বল উপস্থিতি। তাঁর আগ্রহে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা' গানটি দেশের জাতীয় সংগীত এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'চল্ চল্ চল্' গানটি রণ সংগীত হিসেবে গৃহীত হয়েছে। বাঙালি কবিদের চোখে বঙ্গবন্ধু সবসময়ই অসাধারণ। কবি জসীমউদ্‌দীনের কবিতায়:

মুজিবুর রহমান
ওই নাম যেন বিসুভিয়াসের অগ্নি-উগারি বাণ।

কবি সুফিয়া কামালের লেখায়:

তোমার শোণিতে রাঙানো এ মাটি কাঁদিতেছে নিরবধি
তাই তো তোমায় ডাকে বাংলার কানন গিরি ও নদী।

কবি শামসুর রাহমানের ভাষায়:

ধন্য সেই পুরুষ, যাঁর নামের উপর
পতাকার মতো
দুলতে থাকে স্বাধীনতা।

কবি মহাদেব সাহার কবিতায়:

আমি আমার বুক পকেট থেকে ভাঁজ করা একখানি
দশ টাকার নোট বের করে শেখ মুজিবের ছবি দেখেছিলাম
বলেছিলাম, দেখো এই বাংলাদেশ।

সৈয়দ শামসুল হকের লেখায়:

তাঁরই ইতিহাস প্রেরণায় আমি বাংলার পথ চলি।
চোখে নীলাকাশ, বুকে বিশ্বাস, পায়ে উর্বর পলি।

বিদেশি কবিরাও বঙ্গবন্ধুকে যথার্থ মূল্যায়ন করেছেন। সুইডেন প্রবাসী উর্দুভাষী কবি আসিফ শাহাকরের ভাষায়:

বঙ্গবন্ধু, এ স্বাধীনতার জন্য অভিবাদন তোমাকে
এ স্বাধীনতার অনেক মূল্য আছে জানি।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম কবি অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেন:

যতকাল রবে পদ্মা, যমুনা, গৌরী, মেঘনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণটি ছিল বাঙালির স্বাধীনতার বীজমন্ত্র। কারণ এই ভাষণ সেদিন গোটা জাতিকে দল-মত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী সামান্য কিছু মানুষ ছাড়া সারাদেশের মানুষ হয়ে উঠেছিল লড়াকু সৈনিক। তাদের হাতে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ছিল না কিন্তু বুকে ছিল অসীম সাহস। স্বাধীনতার জন্য এ জাতি দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করেছে। প্রতিনিয়ত প্রতীক্ষা করেছে স্বাধীনতার। কিন্তু ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে যখন বললেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'– ঠিক তখন থেকেই নিজেকে স্বাধীন ভাবতে শুরু করেছে দেশের প্রতিটি মানুষ। কবি নির্মলেন্দু গুণ তাই যথার্থই বলেছিলেন, 'সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের'।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মাতা

বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল দেশ

আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন

বাংলাদেশ আর স্বল্পোন্নত দেশ নয়, বাংলাদেশ এখন একটি উন্নয়নশীল দেশ। ভিশন-২০২১ অনুযায়ী মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার পথে এটি একটি বড়ো স্বীকৃতি। ১৮ই মার্চ ২০১৮ জাতিসংঘ বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে ঘোষণা করতে যাচ্ছে। এজন্য ২২শে মার্চ ২০১৮ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সংবর্ধনা প্রদান করা হবে। ২০০৯ সালের ৬ই জানুয়ারি সরকার গঠনের পর বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য বর্তমান সরকার ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। গত নয় বছরে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন সূচকে অগ্রগতির ফলে আজ বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি লাভ করছে।

গত কয়েক বছরে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ডে দেশে আর্থিক খাতে সুস্থিতি এসেছে। আর্থিক খাতের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্যের হার, গড় আয়ুসহ অনেক সূচকেই ইতিবাচক পরিবর্তন এখন লক্ষণীয়। দারিদ্র্য প্রায় ২৪ ভাগের নিচে এবং অতি দরিদ্রের হার প্রায় ১২ ভাগের নিচে নেমে এসেছে। এই হার আগামী দিনে আরো দ্রুত কমবে বলে আশা করা যায়। টাকার মূল্যমান স্থিতিশীল ও জোরালো অবস্থায় রয়েছে। দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য, রেমিট্যান্স ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ তেত্রিশ বিলিয়ন ডলারের মাইলফলক অতিক্রম করেছে। বৈদেশিক অর্থনৈতিক খাতের শক্তির জোরেই বাংলাদেশ নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর মতো বড়ো প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারছে। বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি মন্দার পরিবেশেও গত এক দশক ধরে গড়ে ৬.২ শতাংশেরও বেশি জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করে চলেছে বাংলাদেশ। মাথাপিছু আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬১০ মার্কিন ডলার। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের পরিচয় পেয়ে গেছে। এখন উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি অর্জনের মাধ্যমে পুরোপুরি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে যাচ্ছে।

উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে বিগত এক দশকের যাত্রাপথে বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কৌশল নিয়ে এগিয়েছে। ২০১৭-১৮ বাজেট প্রণয়নকালে অর্থমন্ত্রী ঝালকাঠিতে কৃষকদের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন এবং সেখানে গ্রামের সম্মানিত একজন কৃষক বাজেট ঘাটতি ও এর কাম্য মাত্রা সম্পর্কে মতামত প্রদান করেন। যা সরকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় ও এর সফলতার অনন্য উদাহরণ। আজ নিম্ন আয়ের মানুষের দশ টাকার ব্যাংক হিসাব সংখ্যা দেড় কোটির বেশি এবং তাদের মোট সঞ্চয় ১৪০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও ব্যাংক হিসাব খুলে সঞ্চয় করতে পারছে। কম খরচে ও দ্রুত টাকা পাঠানোর জন্য চালু হওয়া দেশব্যাপী মোবাইল ব্যাংকিং সেবার দ্রুত প্রসার ঘটেছে। প্রায় ৪ কোটি মানুষ হিসাব খুলে এ সেবা নিচ্ছে। জনস্বার্থে গ্রিন ব্যাংকিং, সিএসআর, এজেন্ট ব্যাংকিং, আর্থিক শিক্ষার মতো সামাজিক দায়বোধ প্রণোদিত নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গরিব-দুখী মানুষের উন্নয়নে সিএসআর খাতে ব্যাংকগুলো এখন ৫০০ কোটি টাকার বেশি ব্যয় করছে। এমনকি বাংলাদেশ ব্যাংকেও একটি সিএসআর তহবিল গঠন করা হয়েছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যাংকিং, দরিদ্রের ক্ষমতায়ন ও সামাজিক দায়বদ্ধতার এই নতুনধারা বাংলাদেশকে একটি মানবিক ও উন্নয়নমুখী দেশে পরিণত করেছে।

বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বিশ্বের কাতারে শামিল করা এবং ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ১লা জুন ২০১৭ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে 'উন্নয়নের মহাসড়কে বাংলাদেশ : সময় এখন আমাদের' শীর্ষক বক্তৃতার মধ্য দিয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেট উপস্থাপন করেন। এবারের বাজেটের আকার ৪ লক্ষ ২৬৬ কোটি টাকা, যা মোট জিডিপি'র ১৮ শতাংশ। এই বাজেটে অনুন্নয়নসহ অন্যান্য খাতে ব্যয় ধরা হয়েছে ২ লক্ষ ৪১ হাজার ২৫৩ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ১০.৮ শতাংশ। এছাড়া উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে ব্যয় ধরা হয়েছে ১ লক্ষ ৬৪ হাজার ৮৫ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৭.৪ শতাংশ। অর্থমন্ত্রীর ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় উপস্থাপিত তথ্যের ভিত্তিতে দেশের অর্থনৈতিক চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো–

ক) বার্ষিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি

২০৪১ সালে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য অর্জনে বার্ষিক ৮-১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করা জরুরি। ২০১৫-১৬ সালে ৭.০৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৭.১১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৭.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৭.২৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়; যার অর্থ বিগত ২ বছর যাবৎ বাংলাদেশ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করে চলেছে। বাজেট কাঠামোয় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার হবে ৭.৪ শতাংশ এবং বছর শেষে মূল্যস্ফীতির হার ৫.৫ শতাংশে নেমে আসবে; সুদের হার ক্রমহ্রাসমান ধারায় ও নমিনাল বিনিময় হার স্থিতিশীল থাকবে; ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধির প্রভাবে অভ্যন্তরীণ absorption পূর্বের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়বে। ফলে, চলতি হিসাবের ভারসাম্যে সামান্য ঘাটতি সৃষ্টি হবে। তবে, মূলধন ও আর্থিক হিসাবে পর্যাপ্ত উদ্বৃত্ত থাকায় সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত থাকবে; কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রবৃদ্ধি সহায়ক মুদ্রা ও ঋণ নীতি অব্যাহত থাকবে; কর-রাজস্ব আয়

জিডিপি'র ১.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। রূপকল্প অনুযায়ী, ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের বাজেটের আকার ট্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করতে হবে। বিগত ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে প্রাক্কলিত বাজেটের তুলনায় গড় বাস্তবায়নের বার্ষিক হার হয়েছে ৮৮.৮ শতাংশ।

খ) রপ্তানি ও রেমিট্যান্স প্রবাহ

২০১৬-১৭ অর্থবছরের এপ্রিল নাগাদ আমদানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১১.৭ শতাংশ এবং একই অর্থবছরের মে নাগাদ রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩.৭ শতাংশ। একই অর্থবছরের এপ্রিল মাসে ব্যক্তি খাতে ঋণ প্রবাহের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৬.২১ শতাংশ, যা বিগত অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ১৫.৫৯ শতাংশ। প্রবাসীদের রেমিট্যান্স আয় প্রবাহ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের মে মাসে ৪.৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং একই সময়ে মোট ৮ লাখ ৩৭ হাজার ব্যক্তি বিদেশে নিয়োগ পেয়েছে, যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ৬ লাখ ২২ হাজার। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নির্দেশক অন্যান্য চলকগুলোর মধ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উৎপাদন সূচক ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ডিসেম্বর নাগাদ ৭.৪১ শতাংশ ও ২.৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যাংক ব্যবস্থায় সুদের হার ও হার ব্যবধান (spread) অব্যাহতভাবে হ্রাস পাচ্ছে। একই অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়ে নিট সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩০.৭ শতাংশ। টাকার বিনিময় হার ২০১৬ সালের জুন মাসের তুলনায় ২০১৭ সালের জুন মাসে ২.৭ শতাংশ অবমূল্যায়ন (Depreciation) হয়েছে, যা দেশের রপ্তানি খাতকে উজ্জীবিত করছে। সর্বোপরি স্বস্তিদায়ক বৈদেশিক মুদ্রার মজুত, লেনদেন ভারসাম্যে অনুকূল অবস্থান, ক্রমহ্রাসমান মূল্যস্ফীতি, সরকারের প্রাজ্ঞ রাজস্বনীতির পাশাপাশি সহায়ক মুদ্রানীতির অনুসরণ ইত্যাদির কারণে দীর্ঘদিন যাবৎ দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রয়েছে। এটি টেকসই উচ্চ প্রবৃদ্ধির জন্য একটি আবশ্যকীয় পূর্বশর্ত।

গ) কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়ন

২০০৮ সালের বিশ্বমন্দার পর বিশ্বব্যাপী কর্মসংস্থানবিহীন যে প্রবৃদ্ধি হয়েছে, তা বাংলাদেশে পরিলক্ষিত হয়নি। সম্প্রতি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রকাশিত জরিপে দেখা যায়, বাংলাদেশে বেকারত্বের হার ২০১৩ সালের ৪.৩ শতাংশ থেকে ২০১৫-১৬ সালের শেষ প্রান্তিকে ৪.০ শতাংশে নেমে এসেছে, যা যে-কোনো বিচারে কর্মসংস্থান সঞ্চারী প্রবৃদ্ধি না হলে সম্ভব হতো না। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এখন কাঠামোগত পরিবর্তন হচ্ছে।

এজন্য কৃষি থেকে শ্রমশক্তি শিল্প ও সেবা খাতে স্থানান্তরিত হচ্ছে। ২০১৩ সালে কৃষি খাতে ২ কোটি ৬২ লাখ শ্রমিক নিয়োজিত ছিল, যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরের শেষ প্রান্তিকে ২ কোটি ৪৪ লাখে নেমে এসেছে। অন্যদিকে ২০১৩ সালে শিল্প ও সেবা খাতে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা যথা ট্রমে ১ কোটি ২১ লাখ ও ১ কোটি ৯৮ লাখ ছিল, যা বেড়ে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের শেষ প্রান্তিকে যথাট্রমে ১ কোটি ২৯ লাখ ও ২ কোটি ২৬ লাখে দাঁড়িয়েছে। সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে জনগোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়নের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছে। শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নের সাথে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে এবং সমন্বয় সাধনের জন্য একটি National Skills Development Authority (NSDA) গঠন করা হয়েছে। তাছাড়া দক্ষতা উন্নয়ন কার্যট্রমে নিরবচ্ছিন্ন অর্থের জোগান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে National Human Resources Development Fund (NHRDF) গঠন করা হয়েছে। শিল্প খাতে মধ্যম ও উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা ঘাটতি দূর করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি খাতের যৌথ উদ্যোগে Executive Development Program (EDP) শীর্ষক একটি কার্যট্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

ঘ) বিনিয়োগ বৃদ্ধি

উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধিকে সচল রাখার বিষয়কে সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে। বিশেষ করে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার ও বাস্তবায়ন হার ক্রমান্বয়ে বাড়ানো হচ্ছে। যেখানে ২০০৫-০৬ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রকৃত ব্যয় ছিল ১৯ হাজার ৬৩৩ কোটি টাকা, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে তা দাঁড়িয়েছে ৭৯ হাজার ৩৫১ কোটি টাকা। চলমান ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার ১ লক্ষ ৬৪ হাজার ৮৫ কোটি টাকা, যা এ যাবৎকালে সর্বোচ্চ। পর্যায়ট্রমে শিল্প স্থাপনের বাধাসমূহ দূরীকরণে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BIDA) কর্তৃক ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু, পিপিপি'র দক্ষ ও গতিশীল আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি, বেসরকারি বিনিয়োগ অর্থায়নে ফান্ড স্থাপন ইত্যাদি বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এসব চলমান উদ্যোগসমূহ পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষা পূরণে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি সাধিত হবে।

ঙ) ১০টি ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্প ও বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি

২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাজেটে নিট বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ছিল ২.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেটে ৫.০৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। পদ্মা সেতু প্রকল্প, রূপপুর পারমাণবিক পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণ প্রকল্প, রামপাল ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী সুপার তার্মাল পাওয়ার প্রজেক্ট, মাতারবাড়ি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট উন্নয়ন প্রকল্প, এল.এন.জি টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প, পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ প্রকল্প, পদ্মা ব্রিজ রেল লিংক প্রকল্প, দোহাজারী-রামু-কক্সবাজার-রামু-ঘুনধুম রেলপথ প্রকল্প ও সোনাদিয়া গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ প্রকল্পের মতো প্রবৃদ্ধি সঞ্চারী বড়ো বিনিয়োগের ১০টি Fast Track প্রকল্পের বাস্তবায়নে বৈদেশিক অর্থায়নের ফলে বৈদেশিক বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই Fast Track প্রকল্পগুলোর মধ্যে পদ্মা সেতু ও সোনাদিয়া গভীর সমুদ্রবন্দর ব্যতীত অন্যান্য প্রকল্পের জন্য ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ১৮ হাজার ৭৩৫ কোটি টাকা, যা মোট প্রস্তাবিত বৈদেশিক সাহায্যের প্রায় ৩৩%। চলতি অর্থবছরে Fast Track প্রকল্পসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহে মোট ২৩ হাজার ৯০৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বৈদেশিক সাহায্যের ৪১.৯ শতাংশ। বর্তমান সরকারের নয় বছরে বৈদেশিক সহায়তা আহরিত হয়েছে মোট ৫৯২৮৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী ৩৮ বছরে ছিল মাত্র ৫৩৪৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

চ) শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বাজেট বরাদ্দ

সরকারের নয় বছরে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন (এমডিজি) ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নের পাশাপাশি শিক্ষার মানোন্নয়ন ও স্বাস্থ্যসেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ খাতের বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে বাড়ানো হয়েছে। বর্তমানে সাক্ষরতার হার ৭১%, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৬%, জীবন প্রত্যাশা ৭১.৬ বছর। বিগত বছরগুলোর মতোই চলমান ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেটেও শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাতসহ সার্বিক মানবসম্পদ উন্নয়নকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে বরাদ্দ ছিল ৫২ হাজার ৯১৪ কোটি টাকা, যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ৬৫ হাজার ৪৪৪ কোটি টাকা। জিডিপি'র অনুপাতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ বরাদ্দ ছিল জিডিপি'র ২.৬ শতাংশ, যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে জিডিপি'র ২.৯ শতাংশে। জনমিতিক লভ্যাংশের সুবিধা কাজে লাগানোর জন্য কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক প্রসার করার উদ্যোগ গ্রহণ

করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার এবং উচ্চশিক্ষার প্রসারে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের সকল মানুষের জন্য মানসম্মত ও সহজলভ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পূর্বের ধারাবাহিকতায় ৪৩ হাজার ৪ শত ৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫ বছর মেয়াদি স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত কর্মসূচি চলমান রয়েছে। চলমান ২০১৭-১৮ অর্থবছরে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২০ হাজার ৬৭৯ কোটি টাকা, যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ছিল ১৭ হাজার ৫১৬ কোটি টাকা অর্থাৎ এক বছরে স্বাস্থ্য খাতের বরাদ্দ ১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। দরিদ্র, গ্রামীণ ও প্রান্তিক মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে বিদ্যমান ১৩ হাজার ৩৩৯টির অতিরিক্ত আরো ৩৯২টি কমিউনিটি ক্লিনিক পর্যায়ক্রমে চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের টেলিমেডিসিন সেবা কেন্দ্র এবং ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ছ) কৃষি খাত

কৃষি খাতে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে দানাদার খাদ্যে ও মৎস্য চাষে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। এখন ধান, গম ও ভুট্টা মিলিয়ে বাৎসরিক প্রায় ৪ কোটি মেট্রিক টন দানাদার খাদ্য উৎপাদন হয়। এছাড়া প্রায় ৪২ লক্ষ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদন করে মৎস্য উৎপাদনে বিশ্বে চতুর্থ স্থানে বাংলাদেশ অবস্থান করছে। কৃষি খাতের ঊর্ধ্বমান উৎপাদনের ধারাকে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে এ খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করে সরকার কৃষি বিষয়ক গবেষণাকে গুরুত্ব দিচ্ছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে কৃষি খাতে বরাদ্দ ছিল মাত্র ৯ হাজার কোটি টাকায়, যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেটে প্রায় ১৭ হাজার কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কৃষকের উন্নয়নে বৈরী পরিবেশে অভিযোজনে সক্ষম ধানের জাত উদ্ভাবন, ফসলের সংগ্রহোত্তর ক্ষতি কমানো, কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন, উন্নতমানের বীজ সরবরাহ, সেচ সম্প্রসারণ, নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত আমদানি নিশ্চিতকরণে সঙ্গনিরোধ কেন্দ্র স্থাপন, জেনেটিক্যালি মোডিফাইড প্রযুক্তির প্রচলন, প্রতিকূলতা সহিষ্ণু পাটের জাত উদ্ভাবন এবং বহুমুখী পাটপণ্য উদ্ভাবন সংক্রান্ত গবেষণা, পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি, কৃষি খাতে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি, Value Chain ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি কৃষি গবেষণালব্ধ ফলাফল, কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি এবং কৃষি সেবা কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে সারাদেশে ২৩৫টি কৃষক সেবা কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। সার ও সেচ কাজে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ ও অন্যান্য কৃষি উপকরণে প্রণোদনা বাবদ ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেটে ৯ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদান করা হয়েছে।

জ) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত

২০২১ সালের মধ্যে দেশের শতভাগ জনগোষ্ঠীর সবার জন্য যৌক্তিক মূল্যে মানসম্মত বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এজন্য 'শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ' কার্যক্রম বাস্তবায়নে বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১০ সালে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতাভুক্ত জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৪৮ শতাংশ, যা ইতোমধ্যে দাঁড়িয়েছে ৮৩ শতাংশে। সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিদ্যুতের স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা বিগত আট বছরে ৪ হাজার ৯৪২ মেগাওয়াট থেকে ১৬ হাজার ৩৫০ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান ২০১০ অনুযায়ী, ২০২১ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৪ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে নির্মাণাধীন ১১ হাজার ২১৪ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৩৩টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অতিরিক্ত ১১ হাজার ১২৪ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৪২টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ৩০ নভেম্বর ২০১৭ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। বিদ্যুৎ খাতে সরকারের এ সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে রামপাল, মাতারবাড়ি, পটুয়াখালীর পায়রা এবং বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া বৈদেশিক সহযোগিতায় মহেশখালীতে ৪টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার আওতায় বিদ্যুৎ আমদানির পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। একইসাথে গ্যাসভিত্তিক পুরাতন বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর সংরক্ষণ ও মেরামতের কার্যক্রমের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রায় ১০ হাজার কিলোমিটার নতুন সঞ্চালন লাইন এবং ১ লক্ষ ৫০ হাজার কিলোমিটার বিতরণ লাইন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বিগত নয় বছরে ১ লক্ষ ২৪ হাজার নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে এবং প্রায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৩৩টি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। বিদ্যুতের সিস্টেম লস হ্রাস, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায়, লোড ম্যানেজমেন্ট এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে ২ কোটি প্রিপেইড মিটার স্থাপনের লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

সরকার দেশে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও টেকসই জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০২১ সালের মধ্যে ১৫% এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ২০% জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এলক্ষ্যে ইতোমধ্যে 'Energy Efficiency & Conservation Master Plan' প্রণয়নের কাজ শুরু হয়েছে। গ্যাসের মজুত ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২১ সালের মধ্যে বাপেক্স কর্তৃক ৫৩টি অনুসন্ধান কূপ, ৩৫টি উন্নয়ন

বাংলাদেশের স্বপ্নসোপান

কূপ এবং ২০টি ওয়ার্কওভার কূপ খনন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ব্যাপক মজুতসহ ভোলায় একটি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। কক্সবাজারের মহেশখালীতে ভাসমান এলএনজি টার্মিনালের মাধ্যমে এপ্রিল ২০১৮ থেকে দৈনিক ৫০০ এমএমসিএফএলএনজি জাতীয় গ্রিডে সরবরাহের লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

ঝ) ডিজিটাল বাংলাদেশ

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ডিজিটাল বাংলাদেশ একটি বড়ো নিয়ামক। রূপকল্প-২০২১ এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সার্বিক তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়নে আইটি/আইটিইএস সেবার দ্রুত প্রসার এবং আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ওপর সরকার গুরুত্ব প্রদান করছে। এর ফলে বাংলাদেশে বর্তমানে মোবাইল ব্যবহারকারী ১৪.৩ কোটি এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারী প্রায় ৮ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। ইতোমধ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে ১২টি আইটি পার্ক স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। কালিয়াকৈর, যশোর ও সিলেটে হাইটেক পার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ এগিয়ে চলছে। দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল SFA-ME-WE-5-এর সাথে বাংলাদেশ সংযুক্ত হয়েছে এবং পটুয়াখালীর কুয়াকাটায় ল্যান্ডিং স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-০১-এর নির্মাণ কাজ শেষের পথে এবং স্লট পাবার সাথে সাথে এপ্রিল ২০১৭-তে উৎক্ষেপণের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। এছাড়া, দেশের সাতটি স্থানে আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে উচ্চগতির ফাইবার অপটিক ক্যাবল সম্প্রসারণের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে।

ঞ) সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের আলোচনায় আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলসহ সর্বত্র যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয় তা আমাদের অন্তর্ভুক্তিমূলক উচ্চতর প্রবৃদ্ধি। সাধারণত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রাথমিক পর্যায়ে সম্পদ বণ্টনে যে অসমতা দেখা যায় অনেক দেশের মতো তা বাংলাদেশে তেমন পরিলক্ষিত হয়নি। এর মূল কারণ হলো অর্থনৈতিক অগ্রগতির বিবেচনায় অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রমের বিস্তৃতি ব্যাপক। বর্তমানে বয়স্ক ভাতাভোগী, বিধবা, স্বামী নিগৃহীতা ও দুস্থ মহিলা, ভিজিডি কর্মসূচি'র উপকারভোগী দুস্থ মহিলা, প্রতিবন্ধী ও হিজড়া-বেদে-অনগ্রসর জনগোষ্ঠী ও মাতৃত্বকালীন ভাতাভোগীসহ মোট ভাতাভোগীর সংখ্যা প্রায় ৬০ লক্ষ। ক্রমান্বয়ে ভাতাভোগীর সংখ্যা ও ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া ৮ লক্ষ ৮৫ হাজার অসচ্ছল প্রতিবন্ধীকে ভাতা এবং ৮০ হাজার প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে চার স্তরে শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিদ্যমান মাথাপিছু সম্মানী ভাতার পাশাপাশি ১০ হাজার টাকা হারে বছরে দুটি উৎসব ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে জিডিপি'র ২.৪৪ শতাংশ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা খাতে আমাদের এ সকল নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় সরকার সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। ২০১৭ সালের বন্যা ও দুর্যোগে হাওর এলাকার প্রকৃত দুস্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত ৩ লক্ষ ৩০ হাজার পরিবারকে প্রতি মাসে ৩০ কেজি করে চাল প্রদানের বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি মাসিক ভিত্তিতে নগদ সহায়তা প্রদানের জন্য মোট ৫৭ কোটি টাকার বিশেষ বরাদ্দও প্রদান করা হয়েছে। ইজিপিপি'র (Employment Generation Program for the Poorest) আওতায় ৯১ হাজার ৪৪৭ জন উপকারভোগীকে ৮২ কোটি ৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। সরকারের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক অঞ্চলভিত্তিক বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে চর, হাওর ও পশ্চাৎপদ এলাকার স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেটে ২০০ কোটি টাকা বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক খাতে অগ্রগতির চিত্র নিম্নের ছকে দেখানো হলো–

বঙ্গবন্ধু বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তির মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ জাতি

বছর	প্রত্যাশিত গড় আয়ু (বছর)	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (%)	দরিদ্র জনসংখ্যা (%)	অতিদরিদ্র জনসংখ্যা (%)	সাক্ষরতার হার (৭+বৎসর) (%)	এক (১) বছরের নিচে শিশুমৃত্যু হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে)
২০০৭	৬৬.৬	১.৪৭	৩৬.৮	২২.৬	৫৬.১	৪৩.০
২০০৮	৬৬.৮	১.৪৫	৩৫.১	২০.৯৮	৫৫.৮	৪১.০
২০০৯	৬৭.২	১.৩৬	৩৩.৪	১৯.৩	৫৬.৭	৩৯.০
২০১০	৬৭.৭	১.৩৬	৩১.৫	১৭.৬	৫৬.৮	৩৬.০
২০১১	৬৯.০	১.৩৭	২৯.৯	১৬.৫	৫৫.৮	৩৫.০
২০১২	৬৯.৪	১.৩৬	২৮.৫	১৫.৪	৫৮.৮	৩৩.০
২০১৩	৭০.৪	১.৩৭	২৭.২	১৪.৬	৫৭.২	৩১.০
২০১৪	৭০.৭	১.৩৭	২৬.০	১৩.৮	৫৮.৬	৩০.০
২০১৫	৭০.৭	১.৩৭	২৪.৮	১২.৯	৬৩.৬	২৯.০
২০১৬	৭১.৬	১.৩৬	২৩.২	১২.১	৭১.০	২৮.০

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ

গঠনের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। একটি বাড়ি একটি খামার, কমিউনিটি ক্লিনিক, আশ্রয়ণ, ডিজিটাল বাংলাদেশ, শিক্ষা সহায়তা, নারীর ক্ষমতায়ন, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ, সামাজিক নিরাপত্তা, পরিবেশ সুরক্ষা ও বিনিয়োগ বিকাশ ইত্যাদি ১০টি কর্মসূচি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার ও সামাজিক নিরাপত্তা বলয় বৃদ্ধিতে ব্যাপক অবদান রাখছে। মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে বিগত এক দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যে অভাবনীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তার পেছনে রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনার প্রজ্ঞা ও দূরদর্শী উন্নয়ন দর্শন। উন্নয়নের মহাসড়কে আজ বাংলাদেশের দৃপ্ত পদচারণায় সচকিত বিশ্ববাসী।

মাথাপিছু আয় (Per Capita Income), মানবসম্পদ সূচক (Human Resource Index) ও অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক (Economic Vulnarability Index) জাতিসংঘ ঘোষিত এই তিনটি মানদণ্ডেই বাংলাদেশ ইতোমধ্যে প্রত্যাশিত শর্তাবলি পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার জন্য মাথাপিছু আয়ের মানদণ্ড ১২৩০ মার্কিন ডলারের স্থলে বাংলাদেশে ১৬১০ মার্কিন ডলার, মানবসম্পদ সূচকের মানদণ্ড ৬৬-এর স্থলে আমাদের বর্তমানে ৭২.৯ এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতার সূচকের মানদণ্ড ৩২-এর কম এর স্থলে বাংলাদেশ বর্তমানে ২৪.৩ অর্জন করেছে। বাংলাদেশের এ অগ্রগতির স্বীকৃতি হিসেবেই জাতিসংঘ এদেশকে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উত্তীর্ণের ঘোষণা দিচ্ছে। এটি বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে আমাদের সকলের জন্য গৌরবের ও সম্মানের। আসুন, ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গঠনের বৃহত্তর উদ্দেশ্যে সকলে একতাবদ্ধভাবে সুখী ও শান্তিময় বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখি।

লেখক: সম্পাদক, সচিত্র বাংলাদেশ

জাতির পিতার জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস

কনক চৌধুরী

বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার তৎকালীন গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শেখ লুৎফর রহমান ও মাতা সায়েরা খাতুনের চার কন্যা এবং দুই পুত্রের সংসারে তিনি ছিলেন তৃতীয়। বঙ্গবন্ধুর জন্ম সাল অনুসারে ২০১৮-এর ১৭ই মার্চ হবে তাঁর ৯৮ তম জন্মবার্ষিকী। বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন হওয়ায় দিনটি মহাসমারোহে সারাদেশে পালিত হওয়ার পাশাপাশি জাতীয় শিশু দিবস হিসাবেও উদযাপিত হয়ে আসছে। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নামে দেশে-বিদেশে পরিচিত হলেও তাঁর আরো একটি নাম ছিল আর সে নামটি হলো 'খোকা'। অমিত সাহসী সেই ছেলেটি ছেলেবেলা থেকেই ছিল ন্যায় ও অধিকারের পক্ষে সোচ্চার। সেই ছেলেটিই পরবর্তীতে হয়ে ওঠে নির্যাতিত-নিপীড়িত বাঙালির মুক্তির দিশারি। গভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, আত্মত্যাগ এবং গণ-মানুষের প্রতি মমত্ববোধের কারণে পরিণত বয়সে হয়ে ওঠেন বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা।

১৭ই মার্চ ২০১৭ টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধু সমাধিসৌধ কমপ্লেক্সে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে আয়োজিত শিশু সমাবেশে শিশু-কিশোরদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা–পিআইডি

তিনি আবহমান বাংলার আলো-বাতাসে বেড়ে উঠেছেন। তিনি শাশ্বত গ্রামীণ সমাজের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ছেলেবেলা থেকেই গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন। আর পড়শি দরিদ্র মানুষের দুঃখ-কষ্ট তাঁকে ব্যথিত করেছে। সাধারণ দুঃখী মানুষের প্রতি তাঁর ছিলো অগাধ ভালোবাসা। বস্তুতপক্ষে সমাজ ও পরিবেশ তাঁকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের সংগ্রাম করতে উদ্বুদ্ধ করে। তাই পরবর্তী জীবনে তিনি কোনো শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করেননি বা মাথানত করেননি।

ছাত্রাবস্থায় রাজনীতিতে জড়িত হন এবং মুসলিম লীগের পক্ষে দেশ ভাগের আন্দোলন, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় শান্তি রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ, দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ ভাগের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন তিনি। দেশ ভাগের পর পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর বৈমাত্রিক আচরণ, অন্যায়, অবহেলা, ন্যায্য অধিকার না দেওয়ায় এই সাহসী বীর বাঙালির আত্মমর্যাদা ও অধিকার আন্দোলনে ব্রতী হন। পশ্চিম পাকিস্তানের অশুভ চক্রান্তের বিরুদ্ধে এবং বাঙালির অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে জুন সৃষ্টি হয় 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামে একটি নতুন রাজনৈতিক সংগঠন, যার পৃষ্ঠপোষকতায় ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, সভাপতি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক। তখন যুবক বঙ্গবন্ধু কারাবন্দি অবস্থাতেই এ দলের যুগ্ম সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন।

বছরের পর বছর বাঙালির অধিকার আন্দোলনের লড়াইয়ে তাঁকে জেলজুলুম সইতে হয়। দেশ ভাগের পর মুসলিম লীগের গণবিচ্ছিন্ন রাজনীতি, দলীয় পক্ষপাত, পশ্চিম পাকিস্তানের তাবেদারি বঙ্গবন্ধু মুজিব মেনে নিতে পারেননি। এসব কারণেই বঙ্গবন্ধু স্বশাসনের আন্দোলনের ডাক দেন ৬ দফা দাবি আদায়ের মাধ্যমে। এরপরই বঙ্গবন্ধুকে আগরতলা মামলায় জড়ানো হয়। কিন্তু তাঁর প্রতি অকুণ্ঠ ভালোবাসায় এদেশের মানুষ প্রচণ্ড আক্রোশে ফেটে পড়ে। শুরু হয় ১৯৬৯ সালের গণ-আন্দোলন। জনতার মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণে নিহত হন নবকুমার ইনস্টিটিউশনের নবম শ্রেণির ছাত্র মতিউর রহমান। এর আগে ২০শে জানুয়ারি শহিদ হন আসাদুজ্জামান। উত্তাল আন্দোলনের মুখে আইয়ুব সরকার বাধ্য হয় তাঁকে বিনাশর্তে মুক্তি দিতে। '৭০-এর নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেলেও সামরিকজান্তা ইয়াহিয়া খান পার্লামেন্ট ডাকতে টালবাহানা শুরু করে। আলাপ আলোচনা করে কালক্ষেপণের চেষ্টা করলেও পরে তা ভেঙে যায়। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রমনার রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু এদেশের জনগণকে স্বাধীনতার সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দেন। এর ফলশ্রুতিতে সামরিকজান্তা ইয়াহিয়া বঙ্গবন্ধুকে ২৫শে মার্চ গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোর কারাগারে আটকে রাখে। এদেশের মানুষ তাঁর দেওয়া দিকনির্দেশনা মাফিক মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ৩০ লক্ষ শহিদের রক্ত ও ৩ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর জন্ম নেয় বিশ্বমানচিত্রে নতুন একটি দেশ বাংলাদেশ এবং সে দেশের পিতা হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাই বাঙালি জাতি চিরকাল শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে তাঁকে স্মরণ করবে। তাঁর এ সুমহান অবদানের কথা স্মরণীয়-বরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে প্রতিবছর জাতির পিতার জন্মদিন পালনের পাশাপাশি দিনটি জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

১৯৯৭ সালের ১৭ই মার্চ প্রথম এই দিনটি শিশু দিবস হিসেবে সরকারিভাবে উদযাপিত হয়। এই দিনটি শিশুদের দিন হিসেবে নির্দিষ্ট করার যথেষ্ট কারণ ও যুক্তি রয়েছে। কেননা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিশুদের অত্যন্ত আদর করতেন। শিশুদের তিনি মনেপ্রাণে ভালোবাসতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। আগামীতে দেশ গড়ার নেতৃত্ব তাদেরই দিতে হবে। এজন্য তিনি চাইতেন শিশুরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে, মর্যাদা ও মহিমায় সমৃদ্ধ হোক। সৃজনশীল ও মুক্তমনের মানুষ হিসেবে গড়ে উঠুক। বঙ্গবন্ধু কোনো শিশুদের সমাবেশে গেলে বা শিশুরা বঙ্গভবনে তাঁর সংস্পর্শে আসলে তিনি তাদের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতেন। কেননা বঙ্গবন্ধুর ছিল একটি শিশুসুলভ মন। এই কোমল মনের কারণেই তিনি কোমলমতি শিশুদের আনন্দ-খুশিতে শরিক হতে পারতেন অবলীলায়।

শিশু দিবস পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময় পালিত হয়ে থাকে। বিশ্বব্যাপী শিশুদের সম্মান করতেই এ দিবসটি চালু করা হয়। শিশু দিবসটি প্রথমবারের মতো পালিত হয়েছিল তুরস্কে, ২৩শে এপ্রিল, ১৯২০। ১৯৯৬ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিনটিকে শিশু দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তাই আমাদের দেশে প্রতিবছর ১৭ই মার্চ পালিত হয় জাতীয় শিশু দিবস।

এদিনে আমাদের প্রিয় বাংলাদেশকে শিশুদের জন্য নিরাপদ আবাসভূমিতে পরিণত করার নতুন শপথ নিতে হবে সবার। শেখ মুজিবুর রহমানের কর্ম ও রাজনৈতিক জীবন অসামান্য গৌরবের। তাঁর এ গৌরবের ইতিহাস থেকে প্রতিটি শিশুর মাঝে গভীর দেশপ্রেম ও চারিত্রিক দৃঢ়তার ভিত্তি গড়ে উঠুক– এটাই জাতীয় শিশু দিবসের প্রত্যাশা।

লেখক : কবি ও প্রাবন্ধিক

বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের প্রাণ জনসংগীত

ড. শিল্পী ভদ্র

প্রগতি আন্দোলন ভিত্তিক দেশগান তথা দেশাত্মবোধক জনতার গান, তথা জনগণসংগীত– যে প্রকরণটিকে রবীন্দ্রনাথ বলতেন জনসংগীত।

জনসংগীত বলতে শোষণমুক্তির জন্য নিপীড়িত-নির্যাতিত মানুষ দেশ বা সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে জোট-বেঁধে, সিনা টান করে, শৃঙ্খল-ভাঙার যেসব গান গায় তাদেরই বুঝায়।

এ শ্রেণির গানের উদ্ভব একদিকে যেমন ৪০ দশকে বলা যেতে পারে, অন্যভাবে হাজার বছরের নিম্নবর্গের প্রতিবাদী লোকসংগীতের মধ্যে এর বীজ সুপ্ত ছিল তাও বলা যায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়:

'একথা সত্য যে, এটি কোনো দেশজ ধারা থেকে উদ্ভাবিত নয়; আবার একেবারে বিদেশিও নয়, তবে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দেশজ আঙ্গিকের সাথে বৈশ্বিক সমন্বয়ে বিকশিত। এক পর্যায়ে দেখা যায়, বাংলার সহস্র বছরের ঐতিহ্যবাহী সংগীতের মধ্যে গণচেতনায় যে সংগীতিক সুপ্ত বীজ লুকায়িত ছিল, তা গণসংগীত বিকাশের সূত্র ধরে আবিষ্কার করা সম্ভব হলো। অতএব গণসংগীতের শিল্পরীতিকে যেমন লোক-সংগীতের কাতারে ফেলে রাখা সমীচীন নয়, আবার হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করাও যথার্থ হবে না। দেশজ শিল্পের সাথে আত্মিক যোগাযোগ থাকলেও তার উদ্দেশ্য যেহেতু ভিন্ন, ফলে– পরিবেশনা পদ্ধতি, দর্শনগত স্বকীয়তা ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য অনুযায়ী গণসংগীতের ভূমিকা স্বতন্ত্র মূল্যবোধের সৃষ্টি করেছে।'

দেশাত্মবোধক জনতার গান বা জনসংগীতকে 'গণ সংগীত'ও বলা হবে এ কারণে যে, এ গানগুলো মানুষের জীবন দর্শন, রাজনীতি, সমাজনীতিতে নতুন অর্থের গভীরতা আনে। শুধু তাই নয়, জনসাধারণ, শ্রেণি বা সম্প্রদায়ের ভেতর কাঙ্ক্ষিত অবস্থা সৃষ্টিতে বা প্রাপ্তিতে প্রবল আবেগও সঞ্চারিত করে এ শ্রেণির গান । অনেক দেশাত্মবোধক বা স্বদেশি গান জনসংগীত বা 'দেশাত্মবোধক জনতার গান' বা 'গণসংগীতের' কাতারে গণ্য হতে পারে তবে তার বিশেষত্ব হতে হবে অধিকার-সচেতক বা শ্রেণিচেতনার উদ্‌বোধক। সাধারণ অর্থে বলা যায়, Togather People or things togather in large numbers. It indicates a number more than one, The common people. They are not leader. The ordinary people in society. কোনো কোনো শব্দ সময়ের বিবর্তনে নতুন অর্থ-গভীরতা প্রকাশ করে থাকে। এক্ষেত্রে 'গণ' বা 'জন' শব্দটি সংগীতের সংযোগে ১৯৪০ সনে বিশেষ তাৎপর্য লাভ করে। তখন থেকেই গণতন্ত্র, গণচেতনা, গণমানুষ, গণমত, গণসংগীত ইত্যাদি ব্যবহৃত হতে থাকে বেশি। গণসংগীতের রূপকার হেমাঙ্গ বিশ্বাস বলেন–

'স্বদেশ চেতনা যেখানে গণচেতনায় মিলিত হয়ে শ্রমিকশ্রেণির আন্তর্জাতিকতার ভাবাদর্শের সাগরে মিশল সেই মোহনাতেই গণসংগীতের জন্ম।'

তিনি আরো বলেছেন, 'স্বাদেশিকতার ধারা যেখানে সর্বহারার আন্তর্জাতিকতার সাগরে গিয়ে মিশেছে সেই মোহনায় গণসংগীতের জন্ম।'

ভূপেন হাজারিকার মতে–

'স্বদেশ-প্রেম কেবল দেশকে স্বাধীন করার প্রচেষ্টাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ভারতীয় সমাজের অন্যায়, অবিচার, দারিদ্র্য, শ্রমিক নির্যাতন ইত্যাদির বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করেছিল। ... আমার যে গানগুলির মধ্যে সাম্যবাদ অথবা রাজনৈতিক মতবাদের সংকেত রয়েছে সেই গানগুলিকেই আমি বিদ্রোহের গান বা জনসংগীত বলে বিবেচনা করি।'

জার্মানির প্রখ্যাত মিউজিক কম্পোজার Hanns Eisler বলেছেন– 'Mass song is the fighting song of the modern working class and to a certain degree folk song at a higher stage than before, because it is international.' গণসংগীতের বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না। কারণ কোনো গভীর সংকট মোচন নিমিত্তে, যে সংকট হঠাৎ নয় বহুদিনের শোষণ-ত্রাসের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে শাসক-শোষক বিরোধী আন্দোলনে জনসাধারণ বা শিল্পী-সাহিত্যিকদের আন্দোলনজাত সংগীত এগুলো।

ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বমানব সমাজের কাছে সহযোগিতার আহ্বান জানান। ১৯৩৭ সালে বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক রমাঁ রোলা ও আরি বারবুসের আহ্বানে প্রতিষ্ঠিত League against Fascism and war- এর সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক হন যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯৪১ সালের ২২শে জুন নাৎসি জার্মানি অতর্কিতে আক্রমণ করে নতুন সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নকে। সারা দুনিয়ার জনসাধারণ ফ্যাসিবাদী নগ্ন হামলার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদে গর্জে ওঠে। ঢাকায় গঠিত হয় 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'। ১৯৪২ সালের ৮ই মার্চ ঢাকায় আয়োজিত হয় 'ফ্যাসিবিরোধী সম্মেলন'। সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়ে ভাড়াটে গুপ্তবাহিনীর হাতে সোমেন চন্দ নির্মমভাবে নিহত হন। এর প্রতিবাদে সমস্ত দেশ কেঁপে ওঠে। এর প্রতিক্রিয়ায় ২৮শে মার্চ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইনস্টিটিউটে আয়োজিত সভায় সমবেত কবি শিল্পী, লেখক-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সবাই মিলে 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' গঠন করেন। অতুল গুপ্ত হন এর সভাপতি। সম্পাদক হন কবি বিষ্ণু দে ও কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। এই সভাতেই লেখা হয় ভারতের প্রথম ফ্যাসিবিরোধী গান–

বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ
রুখব দস্যু দলকে আজ
দেবো না জাপানি উড়োজাহাজ
আমরা নই ভীরুর জাত
দুষবে ভাবী সমাজ।

১৯৪৩ সালে অর্থাৎ ১৩৫০ বাংলা সনের মন্বন্তর বা '৫০-এর মন্বন্তরকে লড়বার জন্য শ্রমিক আন্দোলনের নেতা, ভারতীয় গণনাট্য আন্দোলনের অগ্রনায়ক এবং গণসংগীতের পথিকৃৎ বিধান রায় একটি সাংস্কৃতিক স্কোয়াড গড়ে তোলেন। এতে প্রেম ধাওয়ান, হরীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যোগ দিলেন– গড়ে উঠল গণ সংগীতের দল 'ভয়েস অব বেঙ্গল'। এই গণ-শিল্পীদল কলকাতা, দিল্লী, মুম্বাই, এলাহাবাদ, লাহোর প্রভৃতি শহরে গান দিয়ে বাংলার ভয়াবহ পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের চিত্র তুলে ধরলেন। মানুষ তাতে প্রচণ্ড আলোড়িত হয়ে ভ্রাতৃপ্রেমে উদ্বেলিত হলো, তখন তারা পেল দুর্বিপাকের বিরুদ্ধে লড়বার শক্তি ও সাহস। সৃষ্টি হলো–

ম্যায় ভুখা হুঁ

ভূপেন হাজারিকা

অনাথ হামারা লাড়কা-লাড়কি
রাস্তে পে ঘুরদুয়ার
হ্যায় হাম মউতে জিম্মাদার

প্রভৃতি গানের। এরপর ১৯৪৩ সালের মে মাসে প্রগতি লেখক ও শিল্পীদের ৩য় নিখিল ভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনেই ভারতীয় গণনাট্য সংঘ (IPTA) গঠিত হয়। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি পিসি যোশী এ সংগঠন সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থায় অত্যন্ত সাহায্য করেন। এর লক্ষ্য ছিল :

(১) সাধারণ মানুষকে ঐক্যের সচেতন প্রয়াসে সংঘবদ্ধ করে তাদের ইপ্সিত নতুন দুনিয়া গড়া।

(২) জনগণকে সজাগ করে তোলা তাদের সমস্যা ও তার সমাধান সম্পর্কে।

(৩) সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়তে সংস্কৃতিকে প্রস্তুত করা প্রভৃতি।

এই গণসংস্কৃতি সংগঠনে যুক্ত হন বিজয় রায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিজন ভট্টাচার্য, গোপাল হালদার, হিরেন মুখার্জী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সলিল চৌধুরী, শম্ভুমিত্র, সুধী প্রধান, চিন্মোহন সেহানবীশ, বিনয় ঘোষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গোপাল ঘোষ, সুনীল জানা এলেন, উদয় শঙ্কর, বুলবুল চৌধুরী, জয়নুল আবেদীন। গণসংগীতে একত্রিত হলেন দেবব্রত বিশ্বাস (জর্জ বিশ্বাস), পঙ্কজ মল্লিক, হেমন্ত মুখার্জী, শচীন দেব বর্মন, কলিম শরাফী, সুচিত্রা মিত্র, সুরপতি নন্দী, মোহিত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

ভারতব্যাপী শাসক ও শোষকবিরোধী অসংখ্য গণ-অভ্যুত্থান, পরিশেষে স্বাধীনতা, দেশভাগ সবই স্বাভাবিকভাবে প্রবল আলোড়িত করেছিল সাধারণ মানুষ তথা শিল্পী সাহিত্যিকদের। এজন্য জনসংগীতের বিশেষ রূপকল্পের সামাজিক প্রতিষ্ঠা থাকলেও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের বিপ্লব, শ্রেণি সংঘাত, রাজনীতির প্রেক্ষাপট-ভিন্নতায় এ শ্রেণির গানের বিষয় ও সুরের বিচিত্রতা লক্ষণীয়। অনেক গানই আছে যা গণসংগীতের সংজ্ঞায় আসে না অথচ জনগণ তাকে গ্রহণ করেছে, আবার অনেক গান আছে গণসংগীতের শর্ত নিরিখে রচিত হয়েও খুব একটা গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। এজন্যই জনসংগীতের সংজ্ঞার্থ বিচারে এর মূল্যায়ন করা দুরূহ কাজ।

চল্লিশের দশকে দেশ বিভক্তির পর এদেশে জনসংগীতের গীতিকার সুরকারের অভাব ছিল প্রকট। তখন ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রচলিত জনসংগীত সেই সাথে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্ত, জসীমউদ্‌দীনের কিছু গানের পুনরাবৃত্তি করা হতো। কিছু কবিতায় সুরারোপ করা হয়। পাশাপাশি অল্প কিছু গান ধীরগতিতে হলেও রচিত হচ্ছিল এরপর আইপিটি-এর সলিল চৌধুরী ও হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গান জনমনে জাগরণ আনে। এছাড়া পারভেজ শাহেদী, প্রেম ধাওয়ান, পরেশ ধর, দিলীপ সেনগুপ্ত প্রমুখের হিন্দি, উর্দু, বাংলা ভাষায় রচিত গণসংগীত সময় এবং আন্দোলন-প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছে। অনেক সময় আধুনিক, কাওয়ালি, কীর্তন, জারি, পাঁচালি প্রভৃতির সুরেও জনসংগীত গাওয়া হয়েছে। আবার নাম-না জানা কিছু রচয়িতার গান জনপ্রিয়ই শুধু হয়নি তা আজো স্বদেশি গানের মর্যাদার আসনে আসীন। প্যারোডি গান বা সিনেমার ভালোলাগা গানগুলো সভা সমাবেশে উপস্থাপিত হয়েছে। জনমনকে আকর্ষণ, উজ্জীবিত করাটাই সেখানে মুখ্য বিষয় ছিল। এখানে স্লোগানগুলোও সংযোজিত হয়েছে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ বলে। প্রগতিশীল আন্দোলনে অর্থাৎ সরকারবিরোধী আন্দোলনের সূচনাতে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে গণশিল্পীর খুব অভাব ছিল। এর ভার এসে পড়ে রাজনীতি-সচেতন কর্মীদের ওপর। তারা সেখানে আন্তরিক ছিলেন। খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, মোহাম্মদ ইমাদুল্লাহ, গাজীউল হক, স্বপরিবার প্রকৌশলী মোশাররফ উদ্দিন আহমদ– সবাই কণ্ঠ মেলাতেন। এদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ঢাকায় ছিলেন শেখ লুৎফর রহমান, আব্দুল লতিফ, হাকিম, মোমিনুল হক, শাহাবুদ্দিন (বালুচর), আলতাফ মাহমুদ, মুসলেহ উদ্দিন, নিজামুল হক, শামসুল আলম, জাহানারা লাইজু, আব্দুল রাজ্জাক, জুলফিকার প্রমুখ। চট্টগ্রামে ছিলেন কবিয়াল রমেশ শীল। অচিন্ত্য চক্রবর্তী, হরি প্রসন্ন পাল, গোপাল বিশ্বাস, চিরঞ্জীব দাস শর্মা, কলিম শরাফী, মলয় ঘোষ দস্তিদার, রুনু বিশ্বাস, সুচরিত চৌধুরী, অমলেন্দু বিশ্বাস; পাবনায় জ্যোতি চাকী, দীপ্তি চাকী, প্রসাদ রায়, শম্ভু জোয়ার্দার; সিলেটে নির্মলেন্দু চৌধুরী, বরুণ রায়; ময়মনসিংহের নিবারণ পণ্ডিত, মহানন্দ দাস, ফজলুল হক খোকা; কুষ্টিয়ায় গারিসউল্লা; কুমিল্লায় সুখেন্দু চক্রবর্তী, কুলেন্দু দাস, ফজলে নিজামী; রংপুরে বিনয় রায়, হরলাল রায়, নূরুল ইসলাম, অজিত রায়; বরিশালে কাজী বাহাউদ্দিন আহমদ, জিয়াউদ্দিন আহমদ, কেশব চ্যাটার্জী, নারায়ণ সাহা, পঞ্চানন ঘোষ, বরুণ প্রসাদ বর্মন, নরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী, খুলনায় হিমাংশু চক্রবর্তী, সাধন সরকার, শামসুদ্দিন আহমদ প্রমুখ।

আলতাফ মাহমুদ

আকর্ষণীয় জনগণী ভঙ্গিরূপ পেয়েছে গম্ভীরাতে। কিন্তু গণসংগীতে এ ধারা দিন দিন বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে উপযুক্ত লালনের অভাবে।

গণবিরোধী চক্রান্ত রুখে দিতে সাধারণ মানুষ গণসংগীতের মাধ্যমে একত্রিত হয়েছে। তারা দলবেঁধে রুখে দাঁড়িয়েছে সাহসের সাথে গানের বিপ্লবী মন্ত্রে–

'এদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার হানাহানির ইতিহাসে নির্মম পাশবিকতার অধ্যায় রচনা করলেও প্রগতিশীল সচেতন রাজনৈতিক কর্মধারায় প্রবাহিত ও সুসংগঠিত গণসংগীত স্কোয়াড মানুষকে মৈত্রীর বন্ধনে উদ্বুদ্ধ করেছে, রাজনৈতিক চেতনাবোধে দীক্ষিত করেছে। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি গণসংগীত কর্মীদের অভিযাত্রা মানুষকে নতুন চেতনায় সঞ্জীবিত করেছে। ১৯৪৬ সালে কলকাতায়, '৪৮-এ নোয়াখালীতে কিংবা '৫০-এ ঢাকার রাজনীতি সচেতন গণসংগীত কর্মীরা সাম্প্রদায়িক হানাহানির চক্রান্তকারী রূপ ও তার ভয়াবহ পরিণতি তুলে ধরে উজ্জীবিত করেছেন, দিয়েছেন সাহস গণবিরোধী চক্রান্তকে রুখে দাঁড়াতে।'

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট জন্ম নেওয়া পাকিস্তানের নব রাষ্ট্রপ্রধান ১৯৪৮ সালের ১৯শে মার্চ ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের বিশাল জনসভায় বললেন, 'উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা' শুরু হলো মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। শাসকগোষ্ঠীর গুলিতে শহিদ হলেন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউর রহমান প্রমুখ। সেই সময় বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতিতে এমন এক মৌলিক পরিবর্তন আসে– যার কারণে সৃষ্টি হয় নতুন চেতনার কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক। বাঙালিরা তখন জাতি এবং জাতীয় সত্তা সংরক্ষণে প্রতিজ্ঞা করে ভাষা আন্দোলনের এবং নিজ সভ্যতা-সংস্কৃতির শেকড় তারা খুঁজে ফেরেন। সে সময় থেকেই পূর্ববঙ্গের গণসংগীতের দৃষ্টিভঙ্গি একটি স্বতন্ত্র ধারায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এদেশের মানুষরা সেই ক্ষণে নিজেদের প্রকৃত পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করতে সংগীতের প্রেরণা-মন্ত্রে সংগ্রামের পর সংগ্রামে মাতে। ১৯৫৪-র নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিপুল পরাজয়, ৬ দফা আন্দোলন, আইয়ুবের শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রাম, ষাটের দশকে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম। সংগ্রাম ও যুদ্ধের এই দীর্ঘ পথযাত্রায় এদেশের সাংস্কৃতিক কর্মী, শিল্পী, লেখক, ছাত্র, সর্বোপরি সাধারণ মানুষ প্রতিটি আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিল। শোষণহীন সমাজ গড়ার স্বপ্নে এবং অধিকার আদায়ের মানসে রাজনৈতিক আন্দোলনের

পাশাপাশি সাংস্কৃতিক আন্দোলন এক বিশাল ভূমিকা রাখে। রাজনৈতিক আন্দোলনকে 'শারীরিক' আর সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে 'মানসিক' আন্দোলন বলা হয়। শরীর যেমন মন ছাড়া অপূর্ণ, মনও তেমনি শরীর ব্যতিরেকে অর্থহীন। তাই এ দু'শ্রেণির আন্দোলনের মিলনেই পূর্ণ হয়েছে অধিকার আদায়ের স্বপ্ন।

অতএব বলা যায়, বাংলার বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়, প্রতিবাদ-আন্দোলন ও প্রেরণা-সৃষ্টিতে মানুষের রচিত ও সংগৃহীত সামগ্রিক সংগীতই বাংলাদেশের প্রেরণা সৃষ্টিমূলক দেশাত্মবোধক গান/ দেশাত্মবোধক জনতার গান/জনসংগীত/ জনগণ সংগীত বা গণসংগীত। এমনকি যেসব বিদেশি লেখক, শিল্পী, শিক্ষাবিদদের গান, কবিতা, স্লোগান প্রভৃতি আমাদের সংগ্রামকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছাতে সাহায্য করেছে তাদের সৃষ্টি, তাদের অবদানকেও স্মরণ করা কর্তব্য বলে মনে করি। এরা অনেকেই হয়ত অজানার আড়ালেই রয়েছেন তবু তারা আমাদের পরম বান্ধব। তাদের সৃষ্টিকে অবনত মস্তকে শ্রদ্ধা জানাই।

আমাদের ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের খ্যাতনামা কবি, শিল্পী, গায়ক, বিজ্ঞানী ও অন্যান্য সংস্কৃতসেবী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অবস্থান নিয়েছিলেন। বাংলার মানুষের বীরত্ব, আত্মত্যাগ, অসহায়ত্ব হৃদয় দিয়ে তারা বুঝেছিলেন। তাই আমাদের জীবনের সবচে দুর্যোগপূর্ণ দিনগুলোতে তাদের ভালোবাসার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

সে সময় নিউইয়র্কে ম্যাডিসিন স্কোয়ারে, লন্ডনের অ্যালবার্ট হল, বার্লিনের আলেকজান্ডার প্ল্যাৎমা, দিল্লির সংগীত-নাটক একাডেমি অথবা কলকাতার রবীন্দ্রসদন মুখরিত হয়েছিল বাংলাদেশের স্বপক্ষে সংস্কৃতির প্রতিরোধ চেতনায়। এখানে অগ্রণী ছিলেন– পণ্ডিত রবিশংকর, বিটল গ্রুপের অন্যতম জর্জ হ্যারিসন, মার্কিন লোক-প্রতিবাদী গানের অবিসংবাদিত রাজা বব ডিলান, যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের কণ্ঠশিল্পী জোয়ান ব্যেজ কিংবা রিঙ্গো স্টার প্রমুখ শিল্পী।

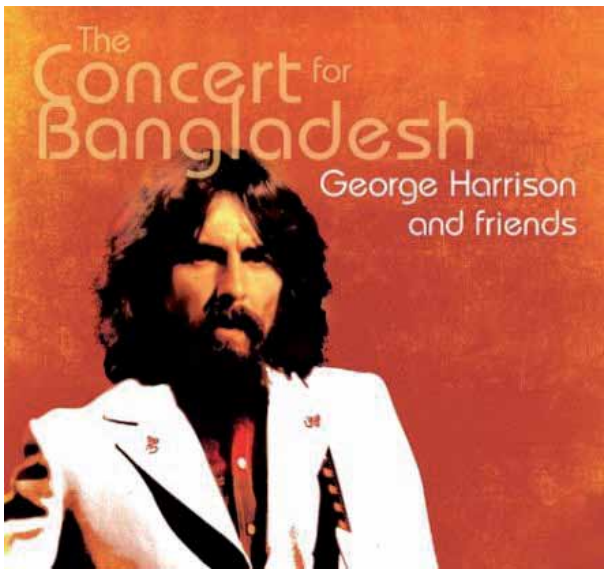

জর্জ হ্যারিসন

ভারতের সত্যজিৎ রায়, লতা মুঙ্গেশকর, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, দেববব্রত বিশ্বাস, ঋত্বিক ঘটক, সুচিত্রা মিত্র, ভূপেন হাজারিকা, সলিল চৌধুরী, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণুদে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মূলকরাজ আনন্দ প্রমুখ বাংলার সংগ্রামে সহযোগী হয়েছিলেন। সাহিত্যিক আঁন্দ্রে মালরো, আমেরিকার কবি অ্যালেন গিন্সবার্গ, রুশ দেশের কবি আদ্রেই ভজনেসত্রনস্কি– সকলেই ছিলেন আমাদের সহযোদ্ধা। কবি অ্যালেন গিন্সবার্গ লেখেন 'যশোর রোডে সেপ্টেম্বর' (পরে এটি গানে পরিণত করেন তিনি নিজেই–যা ছিল তার খুব প্রিয় গান)।

'৭১-এর বাংলাদেশ নিয়ে সবচে বড়ো অনুষ্ঠান ছিল নিউইয়র্কের ম্যাডিসিন স্কোয়ার গার্ডেনে। এই অবিস্মরণীয় সংগীত সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয় ১লা আগস্টে। অনুষ্ঠানটির উদ্যোক্তা ছিলেন বিটলস চতুষ্টয়ের অন্যতম জর্জ হ্যারিসন এবং বিশ্ববিখ্যাত সেতার-বাদক পণ্ডিত রবিশংকর। 'দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' নামক এই অনুষ্ঠানে ৪০ হাজার দর্শক-শ্রোতা ছিলেন। উদ্যোক্তারা ২,৪৩,৪১৮,৫০ ডলার সংগ্রহ করে প্রদান করেন ইউনিসেফের বাংলাদেশ শিশু সাহায্য তহবিলে। ৪০টি মাইক্রোফোনে অনুষ্ঠানের গান ও কথা রেকর্ড করে ৩টি লং প্লে নিয়ে ১টি বড়ো অ্যালবাম প্রকাশিত হয়। এজন্য পণ্ডিত রবিশংকর তৈরি করেন 'বাংলাদেশ ধুন' নামের একটি নতুন সুর। তার সাথে যুগলবন্দি হয়ে বাজান ওস্তাদ আলী আকবর খান। বব ডিলান গেয়েছিলেন ৬টি গান। ছিল তার লেখা ও সুর করা ৫০ লাইনের বিখ্যাত গান 'এ হার্ড ব্রেন ইজ গোননা ফল'। জর্জ হ্যারিসন-এর অনুষ্ঠানের জন্য নতুন গান লেখেন– 'দুচোখে দুঃখ নিয়ে বন্ধু এল কাছে, সাহায্য চাই, দেশ বুঝি যায় ভেসে/যদিও অনুভব করতে পারি নাই তার দুঃখ/ তবু জানতাম আমার কাছে প্রয়াসের প্রয়োজন'। এটি অনুষ্ঠানের শেষ গান ছিল। তার এ গান আর্তনাদের মতো করুণ অথচ দৃঢ় কণ্ঠের। এ গান আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সংহতি-প্রকাশের এক সমুজ্জ্বল স্মরণীয় অধ্যায় হবার দাবি রাখে। এতে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের নেত্রী, কণ্ঠশিল্পী জোয়ান ব্যেজ অংশ নিতে পারেননি। তবে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নিদারুণ হত্যাকাণ্ড তার হৃদয়কে নাড়া দেয়। তিনি লিখেন– '... সূর্য অস্ত যায় পশ্চিম আকাশে/বাংলাদেশে লক্ষ মানুষের চিতা জ্বলে/আমরা অকর্মণ্য, সরে দাঁড়াই। শুধু মরণযজ্ঞের দর্শক/দেখি কিশোরী জননীর শূন্য দৃষ্টি চেয়ে থাকে দুর্বল শিশুর দিকে।' তিনি এই গানে সুর দিয়ে বহুবার গেয়েছেন। জোয়ান ব্যেজ আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে সুদূরে থেকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন বলেই গানটির কথা, সুর এত প্রাঞ্জল হয়েছিল। স্বাধীনতার ৯ মাসে বিশ্বের দেশে দেশে কত কিছু ঘটে গেছে আমাদের অজ্ঞাতে, তার সবটুকু কী আমরা জানতে পেরেছি! যেমন পুরোপুরি জানতে পারিনি আর্জেন্টিনার রবীন্দ্র-অনুরাগী ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর অবদানের কথা, সেখানকার লেখক, শিল্পী, শিক্ষাবিদ, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ প্রমুখের অবদানের কথা। কত তথ্য এক যুগ, দেড় যুগ পরে জেনেছি। আবার আমাদেরই গ্রামগঞ্জে-শহরে-বন্দরে এমন অনেক সংস্কৃতিকর্মী আছেন যাদের অবদান আজো আমাদের অজ্ঞাত, তারা নাম-নিশানা লুকিয়ে রেখেই অবদান রেখে গেছেন দেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামকে বেগবান করতে।

জন্ম থেকেই আলাদা সত্তা নিয়ে এ শ্রেণির গানের উদ্ভব। সংগীত মানুষকে আনন্দ দেয় কিন্তু জনসংগীত আদর্শ, প্রেরণা, শান্তি, সাম্য, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, সর্বহারার অধিকার, মানবতার ব্যাপ্তিকরণ প্রভৃতি উদ্দেশ্যে রচিত। বিধি-নিষেধ ভাঙাই এর লক্ষ্য। যত অন্যায়-অবিচার-আবর্জনা-কুসংস্কার– সব ঝেঁটিয়ে বিদায় হয় এর বজ্র-নিণাদে। এই গান অতি সাধারণের, তবে তারা একতাবদ্ধ। তাদের সুরজ্ঞান বা যন্ত্রসংগত-জ্ঞান যথাযথ না থাকলেও অত্যাচারিত হবার তীব্র, তিক্ত জ্বালা আছে মনোগহীনে। এই মানসিক জ্বালাই তাদের মুখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হয়ে বেরিয়ে আসে। তার তীব্রতা এত বেশি যে, মহাশক্তিমান শোষককেও নিঃশেষ করার, উপড়ে ফেলার শক্তি ধরে। জনসংগীতের আবেদন এবং উদ্দেশ্য একই; তার প্রমাণ বিশ্ববরেণ্য শিল্পী-সমাজ অথবা অনুবাদমূলক গান, যেগুলো শুধু বাংলা সংস্কৃতিতেই নয় বিশ্ব সংস্কৃতিতে জনসাধারণের একই প্রেরণা ও উদ্দীপনার মাধ্যম। তবে যাবতীয় লোকসংগীতের ধারা, শাস্ত্রীয় কুসুম, বিদেশি সুরের স্টাইল, আবেদনকে একসঙ্গে ধারণ করার বাংলার যে ক্ষমতা তা পৃথিবীর কোনো শিল্পমাধ্যমেই নেই।

তত্ত্বগত দিক থেকে ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য সংগীতের মধ্যে পদ্ধতিগত বৈপরীত্য অনেক। এদের সমন্বয় অসম্ভব। ভারতীয় সংগীত শিক্ষা পদ্ধতি, পরিবেশনা, বাদ্যযন্ত্র, আয়োজন, পরিচালনা প্রয়োগ, সংগীত তত্ত্ব প্রভৃতি পশ্চিমা সংগীতের একেবারেই বিপরীত। কিন্তু জনসংগীত সব দেয়াল ভেঙে একটি উপভোগ্য মঞ্চে উপস্থাপিত হয়েছে– প্রয়োজনে এবং রাজনৈতিক কঠোরতায় সর্বহারা শ্রমজীবী মানুষের ঐকতান হিসেবে। এর ধারাবাহিকতায় বাংলা আধুনিক গানের বৈশ্বিক বিকাশ সম্ভব হয়েছে।

লেখক : গবেষক ও প্রাবন্ধিক

২৫শে মার্চ গণহত্যা দিবস

কালরাত্রির নির্বিচার গণহত্যা

আবু ফাতাহ মোহাম্মদ কুতুব উদ্দিন

উনিশশ সাতচল্লিশ সালের চৌদ্দ ও পনেরোই আগস্ট ব্রিটিশ ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। রেডক্লিফ রোয়েদাদ অনুসারে বিভক্ত এই দুই স্বাধীন রাষ্ট্রের সীমানা বিভাজনে এক ধরনের অপরিণামদর্শী কৌশলের আশ্রয় নেওয়া হয়। যার পরিণামে প্রায় ২ হাজার কি.মি. ব্যবধানে অবস্থিত দুটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নিয়ে গঠিত হয় পাকিস্তান নামক অদ্ভুত রাষ্ট্র এবং ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত নিয়ে আজও নানা সমস্যা বিরাজিত; যার সর্বশেষ উদাহরণ হলো– ৩১শে জুলাই ২০১৫ দিবাগত মধ্যরাতে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যকার ১৬২টি ছিটমহলের সমস্যা সমাধান।

ভূখণ্ডগত দূরত্ব ছাড়াও পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে কৃষ্টি-সংস্কৃতি, ভাষা ও আচার-আচরণগত সুস্পষ্ট পার্থক্য ছিল। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পূর্বেই রাষ্ট্রভাষা বিতর্ক শুরু হয়। ১৯৪৮ সালে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলন-সংগ্রাম আরম্ভ হয়। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষার দাবিতে রক্তাক্ত ভাষা আন্দোলন পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালি জনগোষ্ঠীর মাঝে জাতীয় স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগিয়ে তোলার পাশাপাশি স্বশাসনের প্রয়োজনীয়তাকে সম্মুখে নিয়ে আসে। যার ধারাবাহিকতা ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ভূমিধস বিজয়, ১৯৬৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বায়ত্তশাসন দাবি করে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ছয় দফা, ছয় দফা পরবর্তী ছাত্রদের এগারো দফা, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ব্যাপক বিজয়। ইতিহাসের এই প্রত্যেকটি ঘটনাপ্রবাহে বাঙালি মুসলিম জনগণের মনে স্বাধীনতার চেতনার একটু একটু করে উন্মেষ ঘটিয়ে চূড়ান্ত স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে। '৭০-এর নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী নানা টালবাহানার মাধ্যমে অহেতুক গড়িমসি করতে থাকে। ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে 'বেলুচিস্তানের কসাই' নামে পরিচিত জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর করে পাঠানো হয়।

একাত্তরের ১লা মার্চ ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করলে সারা বাংলায় আগুন জ্বলে ওঠে। বঙ্গবন্ধু দফায় দফায় হরতাল আহ্বান করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখেন। তাঁর ডাকা অসহযোগ আন্দোলনের ফলে এই জনপদে কার্যত পাকিস্তানি শাসন ও নিয়ন্ত্রণ তিরোহিত হয়ে যায়। সবকিছু চলতে থাকে তাঁরই নির্দেশে। এরই মধ্যে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকায় রমনা রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়ে জাতিকে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। এই ভাষণে তিনি স্বাধীনতার সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেন এই বলে– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলার সাড়ে সাত কোটি বাঙালি স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুতি শুরু করে। অন্যদিকে একই সময়ে জেনারেল ইয়াহিয়া খান আলোচনার নামে কালক্ষেপণের আড়ালে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক গণহত্যা চালিয়ে স্বাধীনতার দাবিকে অস্ত্রের ভাষায় দমনের প্রস্তুতি শুরু করে। ইয়াহিয়া খান ও জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে পরিস্থিতি উন্নয়নের লক্ষ্যে সাজানো বৈঠক ও আলোচনার নামে একদিকে সময়ক্ষেপণ করতে থাকে; অন্যদিকে চট্টগ্রাম বন্দর ও আকাশপথে এ অঞ্চলে গোপনে সৈন্য ও অস্ত্র সমাবেশ বাড়াতে থাকে। সারা দেশে একটি অস্থির শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ। একাত্তরের আশা-নিরাশার এই দোলাচলের মধ্যে ১৯৭১ সালের ১৯শে মার্চ গাজীপুরে বাঙালি ও পাকিস্তানিদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। পরবর্তী কয়েকদিনে সংঘর্ষ হয় চট্টগ্রাম ও দিনাজপুরসহ দেশের আরো কয়েকটি স্থানে। ২৫শে মার্চ বিকেল পর্যন্ত আলোচনা চালিয়ে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করেন। ফলবিহীন আলোচনার এমন বিরতি জনমনে শঙ্কা তৈরি করে। সামরিক হস্তক্ষেপের অজানা আতঙ্ক ঘিরে ধরে ঢাকা সহ দেশের সচেতন মহলকে।

এমনি থমথমে পরিস্থিতিতে ২৫শে মার্চ মধ্যরাত থেকে পাকিস্তানি সামরিকবাহিনী শুরু করে 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড। সেই রাতে এগারোটা বাজতেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাঙালি সেনা সদস্যদের ওপর হামলা চালায়। তারা পিলখানায় পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসের (ইপিআর) সদর দপ্তর, রাজারবাগ পুলিশ সদর দপ্তর, খিলগাঁও আনসার সদর দপ্তর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আবাসিক ভবন ও ছাত্রদের আবাসিক হল, আর্ট কলেজের হোস্টেল, শহিদমিনার, রমনা কালিবাড়ি, স্টেডিয়াম এলাকা, পুরান ঢাকার নয়াবাজার ও শাঁখারীপট্টি, কয়েকটি বস্তিসহ পরিকল্পনা অনুযায়ী নানা স্থানে একযোগে হামলা চালিয়েছিল। এতে শত শত বাঙালি অফিসার, জওয়ান, শিক্ষক, ছাত্র ও সাধারণ মানুষ নির্মমভাবে নিহত হন। অনেক ঘরবাড়ি ও পত্রিকা অফিসে অগ্নিসংযোগ করা হয়। কোথাও কোথাও চালানো হয় মর্টার হামলা। হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাগুলো পুরোপুরি মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়। সকলকে সন্ত্রস্ত করে তোলার জন্য প্রচুর ট্রেসার ছোঁড়া হয়। গোটা নগরীকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার মতো শব্দের তাণ্ডবে নগরবাসী আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ওঠে। রাতের আকাশটা ছুটন্ত আগুনের রেখায় ফালা ফালা হয়। এখানে-ওখানে লকলকিয়ে ওঠে আগুনের লেলিহান শিখা। সে রাতের প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে মনে হয়েছিল– এক রাতেই যেন ঢাকা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। সেই রাতেই প্রায় ৭ হাজার নিরীহ-নিরস্ত্র মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল। হত্যাকাণ্ডের কয়েকদিন পরও বিভিন্ন স্থানে মানুষের লাশ পড়ে থাকতে দেখা গেছে। যে ধ্বংসযজ্ঞ সেদিন শুরু হয়েছিল, তা পরবর্তী দিনগুলোতে ক্রমে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।

২৫শে মার্চ কালরাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে অজানা স্থানে নিয়ে যায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। এই ভয়াল রাতে রাস্তায় বেরোবার সাহস কারো ছিল না। ২৬শে মার্চ সারাদিন কার্ফু বা সান্ধ্য আইন জারি করা হয়। ফলে

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পক্ষ থেকে স্বাধীনতা ঘোষণার পর দেশব্যাপী মুক্তিযোদ্ধারা সংগঠিত হতে শুরু করে। শুরু হয় হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর পালটা হামলা। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তখন মুক্তিযোদ্ধাদের শিবিরসমূহ গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য আকাশপথে বিমান, নৌপথে গ্রামের পর গ্রাম ও শহরে হামলা চালিয়ে নির্দয়ভাবে হত্যা করতে শুরু করে অসহায় সাধারণ মানুষকে। নবজাতক শিশু থেকে অশীতিপর বৃদ্ধ কেউই রেহাই পায়নি তাদের বন্দুক ও বেয়নেট থেকে। লক্ষ লক্ষ মা-বোন গণধর্ষণ ও হত্যার শিকার হন। লুণ্ঠিত হয় বহু মূল্যবান সম্পদ। পাকিস্তানিরা এই বাংলায় পোড়ামাটি নীতি বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিল। ১৯৭১ সালে সবচেয়ে বেশি গণহত্যার শিকার হয় এদেশের কিশোর, তরুণ ও সক্ষম প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিবর্গ।

সেদিন কারো পক্ষে বাড়ি থেকে বেরিয়ে অন্য কারো খবর নেওয়া সম্ভব ছিলো না। ২৬শে মার্চ দিনভর অনেক এলাকাই আগুনে পুড়ছিল। অবরুদ্ধ ঢাকাবাসীর নিকট ২৫শে মার্চ কালরাত্রি ২৭শে মার্চ সকাল পর্যন্ত প্রলম্বিত হয়েছিল। ২৭শে মার্চ সন্ধ্যা আটটা- সাড়ে আটটার দিকে রেডিও পাকিস্তানে ইয়াহিয়া খান ঘোষণা দিলো– 'দেশে রাজনীতি নিষিদ্ধ, আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ এবং সবকিছুর জন্য দায়ী শেখ মুজিবুর রহমান!' এই হলো গণহত্যা পরবর্তী পাকিস্তানি শাসকদের আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া। কোনো সভ্য সমাজে এটি ভাবা যায় না, কল্পনাও করা যায় না।

২৭শে মার্চ সকাল থেকে বিকাল তিনটা পর্যন্ত সান্ধ্য আইনে বিরতি দেওয়া হলো। সাহস করে বিভিন্ন প্রয়োজনে যারা ঘর থেকে বের হলেন, তাদের অনেকেই গণহত্যার খণ্ড খণ্ড চিত্র দেখলেন। রাস্তায় গাড়ি নেই। আতঙ্কগ্রস্ত মানুষ বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার জন্য দলবেঁধে পায়ে হেঁটে ছুটছে বুড়িগঙ্গা পাড়ি দিতে। নীলক্ষেতে, সার্জেন্ট জহিরুল হক হলে, রেললাইনের পাশে, জগন্নাথ হলে, শহিদমিনারের নিচের প্রশস্ত কামরায়, এখানে-সেখানে অসংখ্য লাশ। এক রাতেই হাজার হাজার মানুষ ব্যক্তি পরিচয় হারিয়ে হয়ে গেল 'লাশ'। নারী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলমান, বালক-বৃদ্ধ সকলের একমাত্র পরিচয় 'লাশ'। লাশ সৎকারের ব্যবস্থা নেই, মানুষ নেই। মানুষ থাকলে লাশ বহন করার মতো বাহন নেই, এমনকি ঠেলাগাড়িও নেই। কাফন কেনার সুযোগ নেই, পয়সা থাকলেও কাফন কেনার দোকান খোলা নেই, দোকানে যাওয়ার মতো পরিবেশ নেই। কাউকে কাউকে আশপাশে মাটিচাপা দেওয়া সম্ভব হলেও অনেককেই দাফন করা সম্ভব হলো না। রাস্তায় রাস্তায় বসলো মিলিটারির পাহারা ও চেকপোস্ট নামক হয়রানি।

পরবর্তী এক সপ্তাহের মধ্যে ঢাকার অর্ধেক মানুষ পালিয়ে যায় এবং ৩০ হাজার মানুষ হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়। ১৯৭১-এর এপ্রিল এবং মে মাসে সবচেয়ে বেশি গণহত্যা সংঘটিত হয়। চট্টগ্রামসহ বড়ো বড়ো শহরেও হামলা, অগ্নিসংযোগ ও গণহত্যা শুরু হয়ে যায়। এসময় হানাদারবাহিনীর হামলা থেকে বাঁচতে পূর্ব বাংলার প্রায় ৩ কোটি মানুষ উদ্ভ্রান্তের মতো পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। প্রায় ১ কোটি মানুষ সীমান্ত পার হয়ে ভারতে আশ্রয় নেন। ঢাকা থেকে প্রায় ১০ লাখ মানুষ গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নেয়। কিন্তু সেখানেও রেহাই মেলেনি। পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীর ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বড়ো শহরের পর গ্রামের পর গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজের মাধ্যমে ধ্বংসলীলা অব্যাহত রাখে।

এতকিছুর পরও অকুতোভয় বাঙালি জাতি ভেঙে পড়েনি। পঁচিশ মার্চ রাতে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মাঝে যখন ঢাকা পুড়েছিল, সে আগুন মানুষের বুকে স্বাধীনতার অদম্য ইচ্ছাকে জাগিয়ে দিয়েছিল। ২৬শে মার্চ পাকিস্তানিরা এই বাংলায় পোড়ামাটি নীতি বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিল। ১৯৭১ সালে সবচেয়ে বেশি গণহত্যার শিকার হয় এদেশের কিশোর, তরুণ ও সক্ষম প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিবর্গ।

বীভৎস এই গণহত্যার খবর যেন কোনোভাবে বাইরের বিশ্ব না জানতে পারে সেজন্য প্রেস সেন্সর করা হয়। সংবাদ পাঠানোর সব পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়। পাকিস্তানের মর্নিং নিউজের সাংবাদিক অ্যান্থনি ম্যাসক্যারেনহাস ১৯৭১ এর জুন মাসে সর্বপ্রথম যুক্তরাজ্যের সানডে টাইমসে পূর্ব পাকিস্তানের বীভৎস গণহত্যার একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। ওয়াশিংটন পোস্টের মতো বিশ্ববিখ্যাত সংবাদপত্রে বাংলাদেশের গণহত্যার সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ পায় ১৯৭১-এর জুলাই মাসে, খ্যাতনামা সাংবাদিক সাইমন ড্রিং-এর মাধ্যমে। যা পুরো বিশ্বের সামনে এদেশে গণহত্যার স্বরূপ সুস্পষ্ট করে তুলেছিল।

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের পুরো নয় মাস জুড়েই এ গণহত্যা চলতে থাকে। বিজয়ের প্রাক্কালে এর সাথে যুক্ত হয় বুদ্ধিজীবী হত্যা। এদেশকে বুদ্ধিভিত্তিকভাবে পঙ্গু করার জন্য মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে বিজয়ের প্রাক্কালে সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয় দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান ৮ শতাধিক বুদ্ধিজীবীকে। কোথাও কোথাও হত্যার পর গণকবর দেওয়া হয়েছিল। সারাদেশে গণহত্যার সাক্ষী হিসেবে প্রায় ৫ হাজার গণকবর আছে বলে মনে করা হয়। তবে বাংলাদেশ ওয়্যার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটির (WCCFC) এ যাবৎ ৯৪০টি গণকবর চিহ্নিত করেছে। ঢাকা জেলায় ৭৪টি গণকবর পাওয়া গেছে, যার মধ্যে ২৩টিই মিরপুরে অবস্থিত। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৫২টি গণকবর পাওয়া গিয়েছে ময়মনসিংহ জেলায়। বর্তমানে সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ১২৯টি বধ্যভূমি সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

ত্রিশ লক্ষ শহিদের আত্মাহুতি, তিন লক্ষ মা-বোনের ইজ্জত আর অগণিত সম্পদহানির বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর এল বাঙালির হাজার বছরের কাঙ্ক্ষিত মুক্তির দিনক্ষণ। অর্জিত হলো বিজয়। বাংলার আকাশে হাজার বছর পর উদিত হলো স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য। পৃথিবীর মানচিত্রে জন্ম নিল এক নতুন দেশ, বাংলাদেশ। বাংলাদেশের এই জন্ম ইতিহাসের সাথে একাত্তরের ২৫শে মার্চ কালরাত্রির ইতিহাস একইসূত্রে গাঁথা। সেদিনের নিরীহ-নিরস্ত্র মানুষের আত্মাহুতির বিনিময়ে সূচিত হয়েছিল সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ, সেই মুক্তিযোদ্ধারা ছিনিয়ে এনেছিল স্বাধীনতা। ২০১৭ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদে ২৫শে মার্চকে 'গণহত্যা দিবস' ঘোষণা করেন। তাই যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, ততদিন ২৫শে মার্চ গণহত্যা দিবসে নিরীহ জনগণের ওপর হামলাকারী ও হামলার নির্দেশদাতাদের প্রতি যেমন ঘৃণা জানাবো, ধিক্কার জানাবো; তেমনি আমরা সেদিনের নাম না জানা শহিদদের বিনম্রচিত্তে স্মরণ করব।

লেখক: প্রকৌশলী ও প্রাবন্ধিক

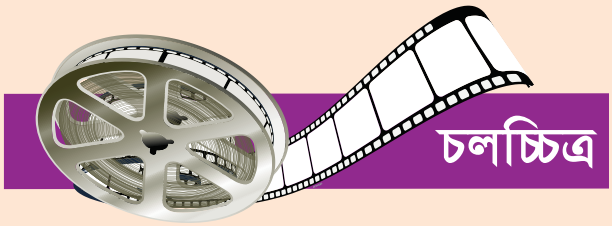

বঙ্গবন্ধুর আমলে চলচ্চিত্রের নানা প্রসঙ্গ

অনুপম হায়াৎ

বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান আমলে প্রাদেশিক মন্ত্রী (১৯৫৬-১৯৫৭) এবং বাংলাদেশ আমলে (১৯৭১-১৯৭৫) রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তাঁর সময়ে চলচ্চিত্র উৎপাদন, শিল্প মাধ্যম, গণমাধ্যম ও সংস্কৃতি মাধ্যম হিসেবে বিকশিত হয়েছে। এ সময়ে চলচ্চিত্র নিয়ে আন্তর্জাতিক ও যৌথ পর্যায়ে চলচ্চিত্র উৎসব, মেলা, প্রদর্শনী, সভা-সেমিনার হয়েছে এবং বিদেশে প্রতিনিধি দল এবং শিক্ষার জন্য বিদেশে ছাত্র প্রেরণ, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় চলচ্চিত্রের উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে। বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো :

চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা গঠন

১৯৫৬ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান। ১৯৫৭ সালে ৩রা এপ্রিল তিনি পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদে বিল পাসের মাধ্যমে 'পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা' প্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে দেশে চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ একটি স্টুডিও ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়, সেই সঙ্গে এদেশে চলচ্চিত্র শিল্পের ভিত্তিভূমি স্থাপিত হয়।

বিভিন্ন ধরনের চলচ্চিত্র

ক) বাংলাদেশের জীবন-সমাজ-সংস্কৃতি নির্ভর চলচ্চিত্র : ১৯৫৭ সালে এফডিসি প্রতিষ্ঠার পর চার-পাঁচটি চলচ্চিত্র নির্মাণের কাজ শুরু হয়। এগুলোর বিষয়বস্তু যেমন ছিল বাংলাদেশের জীবন ও সমাজ সংস্কৃতি নির্ভর তেমনি নির্মাণেও সৃজনশীল। গ্রাম্যজীবন নির্ভর চলচ্চিত্র ছিল– ফতেহ লোহানীর 'আসিয়া' (১৯৫৭-১৯৬০), জেলেজীবন নির্ভর আখতার জং কারদারের 'জাগো হুয়া সাভেরা' (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মা নদীর মাঝি উপন্যাস নির্ভর-১৯৫৯), আধুনিকতা বনাম কুসংস্কার নির্ভর মহিউদ্দিনের 'মাটির পাহাড়' (১৯৫৯), দেশপ্রেম নির্ভর এহতেশামের 'এদেশ তোমার আমার' (১৯৫৯)। এর মধ্যে 'আসিয়া' পায় শ্রেষ্ঠ বাংলা ছবি হিসেবে প্রেসিডেন্ট পুরস্কার (১৯৬০) এবং 'জাগো হুয়া সাভেরা' পায় মস্কো আন্তর্জাতিক উৎসবে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার (১৯৫৯)।

বঙ্গবন্ধুর আমলে ১৯৭২-১৯৭৫ সালের মধ্যে নির্মিত উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রের মধ্যে ছিল মিতার 'এরাও মানুষ' (১৯৭২), সৈয়দ হাসান ইমামের 'লালন ফকির' (১৯৭২), এসএম সফির 'ছন্দ হারিয়ে গেলো' (১৯৭২), কামাল আহমেদের 'অশ্রু দিয়ে লেখা' (১৯৭২), রুহুল আমিনের 'নিজেরে হারিয়ে খুঁজি' (১৯৭২), কাজী জহিরের 'অবুঝ মন' (১৯৭২), আব্দুল জব্বার খানের 'খেলাঘর' (১৯৭২), মহিউদ্দিনের 'দুরন্ত দুর্বার' (১৯৭৩), কামাল আহমদের 'অনির্বাণ' (১৯৭৩), রূপসনাতনের 'দয়াল মুর্শিদ' (১৯৭৩), কবির আনোয়ারের 'স্লোগান' (১৯৭৩), এফ এ ফিল্মস-এর 'শনিবারের চিঠি' (১৯৭৪), রুহুল আমীনের 'বেঈমান' (১৯৭৪), ফয়েজ চৌধুরীর 'মালকা ভানু' (১৯৭৪), বেবী ইসলামের 'চরিত্রহীন' (১৯৭৫), ফজলুল হকের 'উত্তরণ' (১৯৭৫), মহসিনের 'বাঁদী থেকে বেগম' (১৯৭৫)।

খ) সাহিত্য ভিত্তিক চলচ্চিত্র : বঙ্গবন্ধুর আমলে স্বাধীন বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি সাহিত্য ভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। এইসব চলচ্চিত্রের মধ্যে ছিল অদ্বৈত মল্লবর্মনের উপন্যাস অবলম্বনে ঋত্বিক ঘটকের 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৭৩), দিলারা হাসেমের 'ঘর মন জানালা' উপন্যাস অবলম্বনে সুভাষ দত্তের 'বলাকা মন' (১৯৭৩), নীহার রঞ্জন গুপ্তের উপন্যাস অবলম্বনে সি.বি. জামানের 'ঝড়ের পাখি' (১৯৭৩), ইন্দু সাহার 'গঙ্গা পাড়ের খেয়া' উপন্যাস অবলম্বনে রূপকারের 'পলাতক' (১৯৭৩), কাজী আনোয়ার হোসেনের গোয়েন্দা রহস্যকাহিনি নিয়ে মাসুদ পারভেজের 'মাসুদ রানা' (১৯৭৪) প্রভৃতি।

গ) ইতিহাস ভিত্তিক চলচ্চিত্র : বঙ্গবন্ধুর আমলে ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনা নিয়ে কয়েকটি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। এইসবের মধ্যে রয়েছে সৈয়দ হাসান ইমামের 'লালন ফকির' (১৯৭২), এম আলির 'বাংলার ২৪ বছর (১৯৭৪) এবং মহিউদ্দিনের 'ঈশা খাঁ' (১৯৭৪), নিয়াজ ইকবালের 'আজও ভুলিনি' (১৯৭৫)।

ঘ) মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র : বঙ্গবন্ধু আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সকল প্রেরণার উৎস। তাঁর আমলে ১৯৭১ সাল থেকে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে কয়েকটি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। এগুলো ছিল জহির রায়হানের 'স্টপ জেনোসাইড' ও 'এ স্টেট ইজ বর্ন', আমলগীর কবিরের 'লিবারেশন ফাইটার্স' এবং বাবুল চৌধুরীর 'ইনোসেন্ট মিলিয়ন্স'। স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু এবং মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অনেক প্রামাণ্য ও কাহিনিচিত্র নির্মিত হয়। কাহিনিচিত্রের মধ্যে ছিল চাষী নজরুল ইসলামের 'ওরা এগারো জন' (১৯৭২) এবং 'সংগ্রাম' (১৯৭৪), সুভাষ দত্তের 'অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী' (১৯৭২), মমতাজ আলীর 'রক্তাক্ত বাংলা', আনন্দের 'বাঘা বাঙ্গালী' (১৯৭২), আলমগীর কবিরের 'ধীরে বহে মেঘনা' (১৯৭৩), খান আতাউর রহমানের 'আবার তোরা মানুষ হ' (১৯৭৩), আলমগীর কুমকুমের 'আমার জন্মভূমি' (১৯৭৩) এবং মিতার 'আলোর মিছিল' (১৯৭৪)।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু শহিদ হওয়ার পর বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের পর্দা থেকে মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শন ও চেতনা নির্মূল হয়ে যায় পরিবর্তিত রাজনৈতিক কারণে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় চলচ্চিত্রের জন্য ৪ কোটি ১০ হাজার টাকা বরাদ্দ

বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-১৯৭৮) চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নের জন্য ৪ কোটি ১০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়। বরাদ্দকৃত অর্থ ফিল্ম স্টুডিও সম্প্রসারণ, ঢাকা ও চট্টগ্রামে নতুন ফিল্ম স্টুডিও স্থাপন, ফিল্ম ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা এবং সারা দেশে ১০০টি নতুন সিনেমা হল নির্মাণ এবং এর ফলে দেশে ৬ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হওয়ার কথা ছিল।

ফিল্ম ইনস্টিটিউট স্থাপনের উদ্যোগ

বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭৩ সালে একটি ফিল্ম ইনস্টিটিউট স্থাপনের জন্য ১ কোটি টাকা বরাদ্দ করেন। এই উদ্দেশ্যে জ্ঞান অর্জনের জন্য তৎকালীন তথ্য ও বেতার প্রতিমন্ত্রীকে ভারতের পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউটে পাঠানো হয়।

ঐ সময় বেসরকারি পর্যায়ে আলমগীর কবিরের উদ্যোগে ঢাকা ফিল্ম ইনস্টিটিউট চালু হয়। এদিকে ১৯৭৫ সালে ১লা জানুয়ারি থেকে ২১শে জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদের উদ্যোগে একটি চলচ্চিত্র সমীক্ষণ কোর্স পরিচালিত হয়। পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক সতীশ বাহাদুর এই কোর্স পরিচালনা করেন। তিনি বাংলাদেশের জন্য একটি জাতীয় ফিল্ম আর্কাইভের রূপরেখাও তৈরি করে দেন।

চলচ্চিত্র প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে শিক্ষার্থী প্রেরণ

বঙ্গবন্ধুর আমলে চলচ্চিত্র ও অভিনয় এবং অন্যান্য বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে শিক্ষার্থী পাঠানো হয়। চলচ্চিত্র বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য ভারতের পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউটে বাংলাদেশ থেকে সৈয়দ সালাউদ্দিন জাকী, বাদল রহমান ও আনোয়ার হোসেনকে পাঠানো হয়।

চলচ্চিত্র সংসদ

স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশে চলচ্চিত্র সংস্কৃতি বিকাশ ও চর্চার ক্ষেত্রে নব জোয়ারের সৃষ্টি হয়। ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে ১৪/১৫টি চলচ্চিত্র সংসদ গঠিত হয়। ১৯৭৩ সালে গঠিত হয় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ ফেডারেশন।

বাংলাদেশে বিদেশি চলচ্চিত্রের উৎসব

১৯৭৩ সালের ১৮ই মে থেকে ২৪শে মে'র মধ্যে ঢাকায় পোল্যান্ড চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে 'এসেজ এন্ড ডায়মন্ড', 'প্যাসেঞ্জার', 'দি ডল', 'দি গেম', 'দি কার্ডিওগ্রাম' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

১৯৭৪ সালের ৫ই এপ্রিল থেকে ১১ই এপ্রিল পর্যন্ড় ঢাকায় ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এ উৎসবে 'অশনি সংকেত', 'নিমন্ত্রণ', 'স্ত্রীর পত্র', 'সুবর্ণ রেখা', 'উপহার', 'স্বয়ম্ভরম' ও 'মাটির মনিষা' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

বিদেশে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র মেলা, প্রতিনিধি প্রেরণ ও পুরস্কার লাভ

বঙ্গবন্ধুর আমলে বিদেশে বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র মেলা অনুষ্ঠিত হয়, প্রেরিত হয় প্রতিনিধি দল এবং পায় পুরস্কার ও প্রশংসা।

১৯৭২ সালে তাসখন্দ চলচ্চিত্র উৎসবে জহির রায়হানের 'স্টপ জেনোসাইড' পুরস্কার পায়। এটি পরে 'সিডালক' পুরস্কারও পায়। ১৯৭৩ সালে সুভাষ দত্তের 'অর্নোদয়ের অগ্নিসাক্ষী' মস্কোতে এবং ১৯৭৪ সালে খান আতাউর রহমানের 'আবার তোরা মানুষ হ' ও মিতার 'আলোর মিছিল' তাসখন্দ চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়।

অন্যদিকে ১৯৭৪ সালে নয়াদিল্লি, মস্কো এবং তাসখন্দ চলচ্চিত্র উৎসবে বাংলাদেশ থেকে প্রতিনিধি দল অংশ নেয়। এ বছরই বিদেশে চলচ্চিত্র প্রতিনিধি পাঠানোর জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়।

বিদেশি চলচ্চিত্র আমদানি ও প্রদর্শন

বঙ্গবন্ধুর আমলে ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশে উর্দু ভাষায় নির্মিত চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী নিষিদ্ধ করা হয়। একই বছর ভারত থেকে শুধুমাত্র বাংলা চলচ্চিত্র আমদানির সিদ্ধান্ড় নেওয়া হয়। কিন্তু স্থানীয় চলচ্চিত্রকর্মীদের প্রতিবাদের মুখে সেই সিদ্ধান্ড় বাতিল করা হয়। তবে ১৯৭৪ সালে 'প্রধানমন্ত্রী সংস্কৃতিসেবী কল্যাণ তহবিল'-এর জন্য শুধুমাত্র ৫টি বাংলা চলচ্চিত্র প্রদর্শনের অনুমতি দেওয়া হয় এগুলো হলো 'অপুর সংসার', 'দীপ জেলে যাই', 'কাবুলিওয়ালা', 'পৃথিবী আমারে চায়' ও 'সাধারণ মেয়ে'।

অন্যদিকে ব্রিটিশ ও পাকিস্ড়ান আমলে আমদানিকৃত উর্দু, হিন্দি ও ইংরেজি ভাষায় চলচ্চিত্র এদেশীয় আমদানিকারক ও পরিবেশকরা 'বাংলাদেশের সম্পত্তি' হিসেবে প্রদর্শনের অনুমতি চায় কিন্তু বঙ্গবন্ধু সে অনুমতি দেননি।

চলচ্চিত্র রপ্তানি

বঙ্গবন্ধুর আমলে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বিদেশে রপ্তানি শুর্ হয়। বিভিন্ন ছবি রপ্তানি বাবদ আয় হয়েছিল ১৯৭২-১৯৭৩ সালে ২০০০ মার্কিন ডলার, ১৯৭৩-১৯৭৪ সালে ১১০০০ মার্কিন ডলার এবং ১৯৭৪-১৯৭৫ সালে ৫০০০ মার্কিন ডলার।

নতুন সেন্সর আইন ও বিধি প্রবর্তন

বঙ্গবন্ধুর আমলে ব্রিটিশ ও পাকিস্ড়ান আমলে প্রবর্তিত সেন্সর আইন ও বিধি সংশোধন করা হয়। এগুলো হলো:

ক) বাংলাদেশ সিনেমাটোগ্রাফ র্লস, ১৯৭২।

খ) দি সেন্সর শিপ অব ফিল্মস অ্যাক্ট, ১৯৬৩ (অ্যাক্ট নং ১৮, ১৯৬৩), পিও নং ৪১/১৯৭২ দ্বারা সংশোধিত।

সেন্সর শিপ আইন অনুসারে নতুন সেন্সর বোর্ড গঠিত হয়।

বঙ্গবন্ধু 'রূপবান' ও 'নবাব সিরাজদ্দৌলা' দেখেছিলেন এবং 'সংগ্রাম' চলচ্চিত্রের দৃশ্যে অভিনয় করেছিলেন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ব্যস্ড়তম রাজনৈতিক কর্মজীবনের অবসরে বাংলাদেশে নির্মিত 'রূপবান' এবং 'নবাব সিরাজদ্দৌলা' চলচ্চিত্র দেখেছিলেন।

চলচ্চিত্র প্রদর্শক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মিয়া আলাউদ্দিন সূত্রে 'রূপবান' এবং চলচ্চিত্র গ্রাহক মাসুদ উর রহমান সূত্রে 'নবাব সিরাজদ্দৌলা' দেখেছিলেন বলে জানা যায়।

চাষী নজর্ল ইসলাম সূত্রে জানা যায় যে, বঙ্গবন্ধু তাঁর 'সংগ্রাম' ছবিতে অভিনয় করেছিলেন।

প্রধানমন্ত্রীর সংস্কৃতিসেবী কল্যাণ তহবিল গঠন, ১৯৭৪

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে অসুস্থ শিল্পী, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীদের জন্য 'প্রধানমন্ত্রীর সংস্কৃতিসেবী কল্যাণ তহবিল' গঠন করেন। ৫টি ভারতীয় এবং অন্যান্য বিদেশি চলচ্চিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ শুর্ হয়। তথ্য মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের ভিত্তিতে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়।

বঙ্গবন্ধুর ত্রাণ তহবিলে চিত্রকর্মীদের দান

১৯৭৪ সালে বন্যাদুর্গত মানুষের সাহায্যের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে চিত্রকর্মীদের মধ্যে ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই খেলা থেকে অর্জিত আয় ৬ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা বঙ্গবন্ধুর ত্রাণ তহবিলে প্রদান করা হয়। চিত্রকর্মীদের পক্ষে প্রবীণ অভিনেত্রী রহিমা খাতুন এই সমপরিমাণ অর্থের চেক বঙ্গবন্ধুর হাতে তুলে দেন।

বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্যে চলচ্চিত্রকর্মী

অনেক চলচ্চিত্রকর্মী ও সংস্কৃতিসেবী বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্য পেয়ে ধন্য হয়েছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন বিশ্বখ্যাত ভারতীয় চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়, সুগায়ক হেমন্ড়কুমার মুখোপাধ্যায়, গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, জাপানি চলচ্চিত্রকার নাগিসা ওসিমা প্রমুখ।

বাংলাদেশের বহু চলচ্চিত্রকর্মী ও সংস্কৃতিসেবী বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্য পেয়েছেন বিভিন্ন সূত্রে। এদের মধ্যে রয়েছেন– আব্বাসউদ্দীন আহমদ, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন, নাজীর আহমদ, আব্দুল জব্বার খান, ফতেহ লোহানী, এহতেশাম, জহির রায়হান, খান আতাউর রহমান, কামর্ল হাসান, সৈয়দ হাসান ইমাম, সমর দাস, আনোয়ার হোসেন, আবুল খায়ের, রহিমা খাতুন, আলমগীর কবির, কবরী, এমএ মবিন, আলমগীর কুমকুম, সিবলী সাদিক, চাষী নজর্ল ইসলাম, খসর্, রাজ্জাক, আমজাদ হোসেন, দিলীপ বিশ্বাস, মাসুদ পারভেজ, ফার্ক, হায়দার আলী, আবদুল জব্বার, আপেল মাহমুদ, সৈয়দ সালাউদ্দিন জাকী, বাদল রহমান, আজিজুর রহমান বুলি, জাফর ইকবাল, উজ্জ্বল, মাসুদুর রহমান প্রমুখ।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের কার্যক্রম

তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের কার্যক্রম ১৯৭২ সালে নব উদ্যমে বিস্ড়ারিতভাবে শুর্ হয়। বঙ্গবন্ধুর আমলে অনেক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র এই দপ্তর থেকে প্রযোজিত ও নির্মিত হয়। ১৯৭২ সালে ৬টি, ১৯৭৩ সালে ২৩টি, ১৯৭৪ সালে ৪১টি এবং ১৯৭৫ সালে ৯টি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। এইসব চলচ্চিত্রের বেশিরভাগই ছিল মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু এবং উন্নয়নমূলক।

লেখক: চলচ্চিত্র পরিচালক

৮ই মার্চ

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের তাৎপর্য

আফিয়া খাতুন

সময় এখন নারীর: উন্নয়নে তারা
বদলে যাচ্ছে গ্রাম-শহরের কর্ম-জীবনধারা।

মানুষ হিসেবে একজন নারী পূর্ণ সমতার জন্য সুদীর্ঘকাল যে সংগ্রাম করে আসছে, তারই স্বীকৃতি এ নারী দিবস। অন্তত একটি দিনে পৃথিবী স্বীকার করুক নারীরাই এ জগতের সৃষ্টি ও শক্তির উৎস। এখন থেকে ১৬১ বছর আগে ১৮৫৭ সালের ৮ই মার্চ আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে একটি সেলাই কারখানার মহিলা শ্রমিকগণ কর্মক্ষেত্রে মানবেতর জীবন ও ১২ ঘণ্টা কর্মদিবসের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। তাদের ওপর নেমে আসে পুলিশি নির্যাতন। ১৮৬০ সালে ঐ কারখানার মহিলা শ্রমিকেরা 'মহিলা শ্রমিক ইউনিয়ন' গঠন করেন আর সাংগঠনিকভাবে আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন।

১৯১১ সালের ১৯শে মার্চ প্রথমবারের মতো অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, জার্মানি এবং সুইজারল্যান্ডে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়। দিবসটি পালনে এগিয়ে আসে বিভিন্ন দেশের সমাজতন্ত্রীরা। ১৯১৪ সাল থেকে বেশ কয়েকটি দেশে ৮ই মার্চ নারী দিবস হিসেবে পালিত হতে থাকে। ১৯৭৫ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক ৮ই মার্চকে 'নারী দিবস' হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং দিবসটি পালনের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রকে আহ্বান জানায় জাতিসংঘ। তারপর থেকে জাতিসংঘ নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করছে এবং বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, ১৯৭৫ সালকে নারীবর্ষ ঘোষণা, ১৯৭৯ সালে নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডো) গ্রহণ এবং এরপর থেকে চারটি আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। চতুর্থ আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে বেইজিং কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নারীর মর্যাদা বিষয়ক কমিশনের (CSW) উদ্যোগে বেইজিং ৫, বেইজিং ১০, বেইজিং ১৫ এবং বেইজিং ২০ মূল্যায়ন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠার বিষয়টি ক্রমেই জাতিসংঘের কেন্দ্রীয় কর্মসূচি হিসেবে পরিণত হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ই মার্চ ২০১৮ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নারীর উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ শ্রেষ্ঠ জয়িতাদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন–পিআইডি

১৯০৭ সালে জার্মানির স্টুটগার্টে অনুষ্ঠিত হয় সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক নারী সম্মেলন। ১৯০৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ১৫০০০ নারী কর্ম ঘণ্টা, ভালো বেতন ও ভোট দেওয়ার অধিকারের দাবি নিয়ে নিউইয়র্ক সিটিতে মিছিল করেন। এ ঘটনার এক বছর পর ১৯০৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সোসালিস্ট পার্টির ঘোষণা অনুযায়ী প্রথম জাতীয় নারী দিবস পালিত হয়। ১৯১০ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয় ২য় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন। এতে ১৭টি দেশ থেকে ১০০ জন নারী প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সম্মেলনে জার্মানির সমাজতান্ত্রিক নারী নেত্রী ক্লারা জেটকিন প্রতিবছর ৮ই মার্চকে 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' হিসেবে পালন করার প্রস্তাব রাখেন। সিদ্ধান্ত হয় যে, নারীদের সম-অধিকার দিবস হিসেবে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হবে।

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন শুরু হয়েছিল ষাটের দশকের শেষে। প্রগতিশীল নারী নেত্রীরা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে গোপনে নারী দিবস পালন করতেন। ১৯৬৯ সালে গণ-অভ্যুত্থানের সময় মহিলা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে প্রকাশ্যে 'প্রথম নারী দিবস' পালিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৭২ সাল থেকে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ নিয়মিত প্রতিবছর 'নারী দিবস' পালন করে আসছে। বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে এই দিবসটি পালিত হয়।

২০১৮ সালের ৮ই মার্চের বিশ্ব নারী দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে, 'সময় এখন নারীর: উন্নয়নে তারা বদলে যাচ্ছে গ্রাম-শহরের কর্ম-জীবনধারা'। এই প্রতিপাদ্যের সাথে মিলিয়ে বাংলাদেশের নারীদের অবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নারীর অধস্তন অবস্থা বদলাতে সরকারিভাবে নেয়া হচ্ছে নানা ইতিবাচক পদক্ষেপ। এ

সংক্রান্ত নানা নীতিমালা, নারীবান্ধব আইন ও বিধিবিধান প্রণয়নসহ জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট তৈরি করছে সরকার। নির্মাণ শ্রমিক থেকে সেনাবাহিনী–সবক্ষেত্রে রয়েছে নারীর সফল পদচারণা। বাংলাদেশের নারী আজ হিমালয় জয় করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মান লাভ করছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি আনছে যে পোশাক শিল্প সেখানে কর্মরত ৮০ শতাংশই নারী।

কিন্তু তারপরও সত্যিকার অর্থে বদলাচ্ছে না নারীর জীবন। পৃথিবীতে নারী-পুরুষের পূর্ণ সমতা আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের ২০১৭ সালের রিপোর্টে দেখানো হয়েছে যে, জেন্ডার গ্যাপ বা নারী-পুরুষে বৈষম্য ২১৮৬ সালের আগে বিলুপ্ত হবে না। কমপক্ষে আরো ১০০ বছর লাগবে। খুবই হতাশাব্যঞ্জক এ রিপোর্ট, পৃথিবীব্যাপী মজুরি বৈষম্য আর একটি দুষ্ট ক্ষত। আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশনের ২০০৯ -এর এক রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বে পুরুষের চেয়ে নারী ১৬ ভাগ পারিশ্রমিক কম পায়। এমনকি সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, যুক্তরাজ্যের বড়ো বড়ো কোম্পানিগুলো পুরুষের তুলনায় নারীকে অর্ধেক বেতন বা মজুরি দিয়ে থাকে। ২০১৭ সালের অক্টোবর মাসে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে ছোটো কোম্পানিগুলোকে তাদের নারী-পুরুষের মজুরি তালিকা প্রকাশ করতে বলেছেন, যাতে বৈষম্যটি বোঝা যায়। বড়ো কোম্পানিগুলোকে এই তালিকা আগামী এপ্রিল ২০১৮-এর মধ্যে বাধ্যতামূলকভাবে প্রকাশ করতে হবে।

ব্যবসা, রাজনীতি ও সরকারের কেন্দ্রীয় পদসমূহে এমনকি উন্নত দেশেও নারীর উপস্থিতি হাতে-গোনা। গবেষণায় প্রমাণিত যে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং নিপীড়ন ও নির্যাতনের দিক থেকে পুরুষের তুলনায় নারীর হার অনেক বেশি। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে নারী নির্যাতনের হার শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি এবং মজুরি বৈষম্যের হার শতকরা ৯৯ ভাগ। অথচ পরিসংখ্যানে দেখা যায়, পৃথিবীতে নারীরা কাজ করছে ৬৫ ভাগ, বিপরীতে তার আয় শতকরা মাত্র ১০ ভাগ। নারী-পুরুষের সংখ্যানুপাত প্রায় সমান। অথচ পৃথিবীর মোট সম্পদের একশত ভাগের মাত্র এক ভাগের মালিক নারীরা। নারীদের গৃহস্থালি কাজের আর্থিক স্বীকৃতি এখনও দেওয়া হয়নি, যা জিডিপিতে অদৃশ্য থাকে। বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ পোশাক খাতে নারীদের সম মজুরি, কর্মসহায়ক পরিবেশ ও পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নেই। কৃষি কাজের ২২টি ধাপের ১৯টিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকলেও কৃষিজমিতে নারীর প্রকৃত মালিকানা না থাকায় নারী কৃষক হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছে না। শুধুমাত্র নারী হওয়ার কারণে পরিবারে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, হাটবাজারে, রাস্তায় নারী সহিংসতার স্বীকার হচ্ছে। গবেষণায় দেখা যায়, জাতীয় আয়ের ৩ শতাংশ নারীর প্রতি সহিংসতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১৯৯৬ থেকে জাতিসংঘ কর্তৃক নির্ধারিত থিম বা প্রতিপাদ্য

১৯৯৬: অতীত উদ্‌যাপন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা (Celebrating the Past, Planning for the Future)

১৯৯৭: নারী এবং শান্তি (Women and the Peace)

১৯৯৮: নারী এবং মানবাধিকার (Women and Human Rights)

১৯৯৯: নারীর প্রতি সহিংসতামুক্ত পৃথিবী (World Free of Violence Against Women)

২০০০: শান্তি স্থাপনে একতাবদ্ধ নারী (Women Uniting for Peace)

২০০১: নারী ও শান্তি : সংঘাতের সময় নারীর অবস্থান (Women and Peace: Women Managing Conflicts)

২০০২: আফগানিস্তানের নারীদের বাস্তব অবস্থা ও ভবিষ্যৎ (Afghan Women Today: Realities and Opportunities)

২০০৩: লিঙ্গ সমতা ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Gender Equality and the Millennium Development Goals)

২০০৪: নারী এবং এইচআইভি/এইডস (Women and HIV/AIDS)

২০০৫: লিঙ্গ সমতার মাধ্যমে নিরাপদ ভবিষ্যৎ (Gender Equality Beyond 2005; Building a More Secure Future)

২০০৬: সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী (Women in Decision-making)

২০০৭: নারী ও নারী শিশুর ওপর সহিংসতার দায়মুক্তির সমাপ্তি (Ending Impunity for Violence Against Women and Girls)

২০০৮: নারী ও কিশোরীদের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ (Investing in Women and Girls)

২০০৯: নারী ও কিশোরীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে নারী-পুরুষের একতা (Women and Men United to End Violence Against Women and Girls)

২০১০: সমান অধিকার, সমান সুযোগ– সকলের অগ্রগতি (Equal Rights, Equal Opportunities: Progress for All)

২০১১: শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে নারীর সমান অংশগ্রহণ (Equal Access to Education, Training and Science and Technology)

২০১২: গ্রামীণ নারীদের ক্ষমতায়ন-ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের সমাপ্তি (Empower Rural Women, End poverty and Hunger)

২০১৩: নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার এখনই সময় (A promise is a promise : Time for Action to End Violence Against Women)

২০১৪: নারীর সমান অধিকার সকলের অগ্রগতির নিশ্চয়তা (Equality for women is progress for All)

২০১৫: নারীর ক্ষমতায়ন ও মানবতার উন্নয়ন (Empowering Women, Empowering Humanity: Picture it!)

২০১৬: অধিকার-মর্যাদায় নারী-পুরুষ সমানে সমান (Planet 50-50 by 2030: Step it Up for Gender Equality)

২০১৭: নারী-পুরুষ সমতায় উন্নয়নের যাত্রা, বদলে যাবে বিশ্বকর্মে নতুন মাত্রা (Women is the Changing World of work: Planet 50-50 by 2030)

২০১৮: সময় এখন নারীর: উন্নয়নে তারা বদলে যাচ্ছে গ্রাম-শহরের কর্ম-জীবনধারা (Time is Now: Rural and urban activists transforming women's lives)

বিশ্বের অনেক দেশে আন্তর্জাতিক নারী দিবস আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারি ছুটির দিন হিসেবে পালিত হয়। যেমন: আফগানিস্তান, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, বেলারুশ, বুরকিনা ফাসো, কম্বোডিয়া, কিউবা, জর্জিয়া, ইরিত্রিয়া, কাজাখস্তান, কিরগিজিস্তান, লাওস, মলদোভা, মঙ্গোলিয়া, মন্টেনিগ্রো, রাশিয়া, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, উগান্ডা, ইউক্রেন, উজবেকিস্তান, ভিয়েতনাম এবং জাম্বিয়া। এছাড়া চীন, মেসিডোনিয়া, মাদাগাস্কার এবং নেপালে শুধুমাত্র নারীরা এদিনে সরকারি ছুটি ভোগ করেন।

বাংলাদেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে নারীরা বেশ এগিয়েছে। এসব ক্ষেত্রে নারী উন্নয়নে ও নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের অনেক দেশের জন্য রোল মডেল। তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে নারী উন্নয়নের জন্য সমাজ ও রাষ্ট্র নারীদের চাহিদানুসারে কাঙ্ক্ষিত সহায়ক শক্তি হিসেবে আরো অধিক ভূমিকা রাখা প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে 'নারীর অধিকার মানবাধিকার', 'নারীর প্রতি সহিংসতা মানবাধিকার লঙ্ঘন' এবং 'নারী-পুরুষের সমতা মানবতার সমতা'– এ সত্যসমূহ গ্রহণ হোক সকলের অঙ্গীকার।

লেখক: যুগ্মসচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ

ডিএফপি'র অগ্রণী ভূমিকা

নাহিদা সুলতানা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) সরকারের প্রচারধর্মী একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। ডিএফপি'র চলচ্চিত্র শাখা দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের চলচ্চিত্র ও

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৬ই মার্চ ২০১৮ গণভবনে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণকে স্বীকৃতিদানকারী ইউনেস্কো'র প্রত্যয়নপত্র চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি)-এর পক্ষে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনুকে হস্তান্তর করেন। এসময় শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু, তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম, তথ্যসচিব মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ ও ডিএফপি'র মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন উপস্থিত ছিলেন–পিআইডি

ভিডিও ফুটেজ ধারণ ও সংরক্ষণ করে থাকে। বিংশ শতাব্দীর আশির দশকে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) পুনর্গঠনের পূর্বে 'চলচ্চিত্র বিভাগ' বা 'ফিল্ম ডিভিশন' নামে একটি দপ্তর ছিল, যা রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের চলচ্চিত্র ও ভিডিও ফুটেজ ধারণ ও সংরক্ষণ করত। ১৯৭১ সালে সচিবালয়ের টিনশেড ভবনে এই ফিল্ম ডিভিশনের অফিস ছিল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ধারণ ও সংরক্ষণে এই ফিল্ম ডিভিশন তথা চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি)-এর চলচ্চিত্র শাখা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চলচ্চিত্র শাখার কর্মকর্তা মহিব্বুর রহমান খায়ের (প্রয়াত অভিনেতা আবুল খায়ের), আমজাদ আলী খন্দকার, জি. জেড. এম. এ. মবিন, এম. এ. রউফ এবং এস. এম. তৌহিদ বাবু বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণটি ধারণ করার ব্যতিক্রমী ও সাহসী সিদ্ধান্ত নেন। তাদের সাহসী ভূমিকার কারণে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রমনা রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণের অডিও-ভিডিও কভারেজ করা সম্ভব হয়। বর্তমানে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ, জাতিসংঘে প্রদত্ত ভাষণসহ অন্যান্য যে সকল ভাষণের লাইভ ফুটেজ পাওয়া যায় তার প্রায় সবগুলোই ডিএফপির চলচ্চিত্র শাখার কলাকুশলীদের দ্বারা ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫ সময়ে ধারণকৃত।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালরাতের পর চলচ্চিত্র বিভাগের তৎকালীন পরিচালক/কম্পট্রলার মহিব্বুর রহমান খায়ের আশঙ্কা করেছিলেন যে, পাক হানাদারবাহিনী ৭ই মার্চের ভাষণটির কপি বিনষ্ট করে ফেলতে পারে। তাই তিনি ভাষণের মূলকপি ও অডিও রেকর্ডসহ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফুটেজ নিরাপদ স্থানে সরিয়ে রাখার বিষয়ে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এপ্রিল মাসের শুরুতে এসব গুরুত্বপূর্ণ ফুটেজসহ অন্যান্য ডকুমেন্ট একটি ৪২ ইঞ্চি স্টিলের ট্রাংকে ঢুকিয়ে তিনি সহকারী চিত্রগ্রাহক আমজাদ আলী খন্দকারকে ট্রাংকটি অন্যত্র সরিয়ে রাখার নির্দেশ দেন। তার নির্দেশ পেয়ে আমজাদ আলী খন্দকার ১৯৭১ সালের ৯ই এপ্রিল ভাষণের অডিও-ভিডিও ফুটেজসহ স্টিলের ট্রাংকটি বুড়িগঙ্গা নদীর অপর পাড়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি বেবিট্যাক্সিতে করে সোয়ারি ঘাটে নিয়ে যান। পাক হানাদারবাহিনীর কড়া টহলের মধ্যে আমজাদ আলী খন্দকার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জিঞ্জিরা হয়ে মুন্সিগঞ্জের জয়পাড়ায় মজিদ দারোগা বাড়িতে ট্রাংকটি নিয়ে যান। এর পেছনে পেছনে চলচ্চিত্র বিভাগের পরিচালক মহিব্বুর রহমান খায়েরও সেখানে যান। সেখানে অত্যন্ত গোপনে ভাষণটিসহ ট্রাংকটি সংরক্ষণ করা হয়। দেশ স্বাধীন হবার পর সেখান থেকে ট্রাংকটি এনে পুনরায় তা অফিসের স্টোরে সংরক্ষণ করা হয়।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পরও ষড়যন্ত্রকারীরা ভাষণের রিলটি নষ্ট করার লক্ষ্যে চলচ্চিত্র বিভাগে তল্লাশি চালায়। কিন্তু চলচ্চিত্র শাখার নিবেদিতপ্রাণ কর্মীগণ ভাষণের মূল পিকচার নেগেটিভ ও সাউন্ড নেগেটিভসহ অন্যান্য ফুটেজ ভিন্ন একটি ছবির ক্যানে ঢুকিয়ে ডিএফপির ফিল্ম লাইব্রেরিতে লুকিয়ে রাখেন। এভাবেই ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণকে বিনষ্টের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ কভারেজের স্মৃতিবাহী শব্দধারণ যন্ত্র বা নাগ্রা মেশিন এবং টু-সি ক্যামেরাটি এখনো ডিএফপিতে সংরক্ষিত আছে।

এছাড়া বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের অডিও-ভিডিও ফুটেজ সংরক্ষণে এ অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পরবর্তীতে এসব ফুটেজ সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে সরবরাহ করা হয়েছে। ডিএফপির এ প্রচেষ্টার কারণে ১৯৯৬ পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের লাইভ ফুটেজ পাওয়া সম্ভব হয়েছে। সাবেক প্রধান তথ্য কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন ডিএফপির মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে ৭ই মার্চের ভাষণ ও এর ইতিহাস সংগ্রহের

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION

Certifies the inscription of

The Historic 7th March Speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman

Department of Films and Publications

Dhaka — Bangladesh

ON THE MEMORY OF THE WORLD INTERNATIONAL REGISTER

30 October 2017

উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং এর ওপর প্রামাণ্য পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ২০১১ সালে ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় অনুষ্ঠিত মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড কর্মশালায় ৭ই মার্চের ভাষণকে বিশ্বপ্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণকে বিশ্বপ্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে ইউনেস্কো'র স্বীকৃতি উপলক্ষে ৭ই মার্চ ২০১৮ ডিএফপিতে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম। মঞ্চে উপবিষ্ট তথ্যসচিব মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ ও ডিএফপির মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইসতাক

প্রদানের বিষয়টি প্রস্তাব আকারে উপস্থাপনের জন্য তিনি ২০১০ সালে বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন-এর রোকেয়া খাতুনকে প্রস্তাব দেন। এরপর শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে ইউনেস্কোতে খসড়া প্রস্তাব প্রেরণ করে।

ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন এরপর এ সংক্রান্ত পরবর্তী কার্যক্রমের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকেন। তিনি ২০১৩ ও ২০১৪ সালে নির্দিষ্ট ফরমেটে বাংলাদেশের প্রস্তাবটি ইউনেস্কোতে প্রেরণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করেন। পরবর্তীতে ডিএফপির মহাপরিচালক জনাব মোহাম্মদ লিয়াকত আলী খান ২০১৬ সালে ইউনেস্কোর ১৯৯তম নির্বাহী বোর্ড সভায় পরিমার্জিত প্রস্তাব জমাদানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যসহ নতুন একটি প্রস্তাব প্রেরণ করেন। শুরু থেকেই এই উদ্যোগের সাথে তথ্য মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ও সাবেক মুখ্য সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী সম্পৃক্ত ছিলেন।

২০১৩ সাল থেকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে উদ্যোগটির সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। এরপর তথ্য মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে পরামর্শ করে ৭ই মার্চের ভাষণকে বিশ্বের অন্যতম দালিলিক ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য ২০১৬ সালের এপ্রিলে প্যারিস দূতাবাসের মাধ্যমে ইউনেস্কোতে আনুষ্ঠানিক মনোনয়ন প্রস্তাব দাখিল করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণটিকে বিশ্ব দালিলিক ঐতিহ্য হিসেবে ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পাওয়ার ক্ষেত্রে ফ্রান্সে বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত ও ইউনেস্কোতে স্থায়ী প্রতিনিধি শহীদুল ইসলাম, শিক্ষা সচিব মো. সোহরাব হোসেন, সাবেক মুখ্য সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক ও শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বিভিন্ন সময় সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুরু থেকেই উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন।

এ সকল দেশ প্রেমিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগের ফলে দীর্ঘ যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া শেষে ২০১৭ সালের ৩০শে অক্টোবর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণটিকে বিশ্ব দালিলিক ঐতিহ্য হিসেবে ইউনেস্কো ঘোষণা করে। এ পর্যন্ত সারাবিশ্বের মোট ৪২৭টি দলিলকে এ বিরল স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই স্বীকৃতি সমগ্র বাঙালি জাতির জন্য গৌরবের ও আনন্দের। এই স্বীকৃতির ফলে কালোত্তীর্ণ ভাষণটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ন্যায় এবং মুক্তির পথে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে সংরক্ষিত হয়ে থাকবে এবং সারা পৃথিবীর মানুষ যুগ যুগ ধরে বাঙালি জাতির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস জানতে আগ্রহী হবে। মূল ভাষণটি ধারণ ও সংরক্ষণ করা এবং ইউনেস্কোর স্বীকৃতি প্রস্তাবের সূত্রপাত করায় ডিএফপি এই স্বীকৃতির গৌরবান্বিত অংশ হয়ে রইল।

লেখক: ডিএফপি'র চলচ্চিত্র শাখায় কর্মরত

ডিএফপি'র ইউনেস্কোর সনদপত্র অর্জন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণকে দীর্ঘ প্রায় আট বছর ধরে যাচাই-বাছাই, বিচার-বিশ্লেষণ ও নানা আনুষ্ঠানিকতা শেষে ৩০শে অক্টোবর ২০১৭ ইউনেস্কো 'বিশ্বপ্রামাণ্য ঐতিহ্য' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ধারণ, সংরক্ষণ ও বিশ্বপ্রামাণ্য ঐতিহ্যের স্বীকৃতি পাওয়ায় চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি)-এর চলচ্চিত্র শাখার কর্মকর্তা ও কলাকুশলীদের সাহসী ভূমিকা ইতিহাসের অংশ হয়ে রয়েছে। জাতির পিতার এই কালজয়ী ভাষণটি বিশ্ব দালিলিক প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার কারণে ইউনেস্কো এই অধিদপ্তরসহ ৫টি প্রতিষ্ঠানকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ও সনদ প্রদান করেছে। প্রতিষ্ঠানসমূহ হলো– তথ্য মন্ত্রণালয়ের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। ৬ই মার্চ ২০১৮ গণভবনে এক আনন্দঘন অনুষ্ঠানে ইউনেস্কোর সনদপত্র প্রত্যেক দপ্তরের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও মহাপরিচালকের হাতে তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের পক্ষে সনদপত্র গ্রহণ করেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু এমপি। এসময় তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম এমপি এবং অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

এই সনদপত্র প্রাপ্তি উপলক্ষে ৭ই মার্চ ২০১৮ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ডিএফপি'র মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন-এর সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্য সচিব মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে বাংলাদেশ টেলিভিশনের উপমহাপরিচালক (নিউজ) মোঃ নাসির উদ্দিন, গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ জাকির হোসেন ও বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ আজিজুর রহমান বক্তৃতা করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের আবেদন চিরদিনের, তা কখনও শেষ হবার নয়। এ ভাষণের মধ্য দিয়েই এদেশের মুক্তিকামী বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছিল। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চে দেওয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণটি যে বিশ্বমানবের স্মৃতির অংশ, সে স্বীকৃতি মিলেছে ইউনেস্কোর মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্তির মধ্য দিয়ে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, ৭ই মার্চের ভাষণ বাঙালিকে স্বাধীনতার পথ দেখিয়েছিল। এ ভাষণ এখনও আমাদের উজ্জীবিত করে। তিনি বলেন, পৃথিবীতে যত বিখ্যাত ভাষণ রয়েছে এরমধ্যে মার্টিন লুথার কিংয়ের ভাষণটি ছাড়া বাকি সব ভাষণ লিখিত। এরমধ্যে একমাত্র বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি অলিখিত। এটি তাঁর নিজের মনের কথা। ইতিহাসে এমন নজির বিরল। তিনি বলেন, ১৯৭৫ সালের পর এ ভাষণ বাজাতে দেওয়া হতো না, কেউ এ ভাষণ বাজাতে চাইলে তাকে নির্যাতনের মুখোমুখি হতে হতো। তিনি এ ভাষণটি সংরক্ষণ করার জন্য ডিএফপি'র সকল স্তরের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানে তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের অডিও-ভিডিও ফুটেজ ধারণ, সংরক্ষণ এবং বিশ্বপ্রামাণ্য ঐতিহ্যের স্বীকৃতির জন্য ইউনেস্কোতে প্রস্তাব প্রেরণ করায় চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইসতাক হোসেনের হাতে ইউনেস্কোর প্রত্যয়নপত্রটি তুলে দেন।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

জাতীয় পাট দিবস

অপার সম্ভাবনাময় পাট শিল্প

শারমিন সুলতানা শান্তা

'সোনালি আঁশের সোনার দেশ, পাটপণ্যের বাংলাদেশ'–প্রতিপাদ্য নিয়ে দেশব্যাপী উদ্‌যাপন করা হয়েছে 'জাতীয় পাট দিবস ২০১৮'। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে পাটের রপ্তানি বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশে দ্বিতীয়বারের মতো জাতীয় পাট দিবস উদ্‌যাপন করা হলো। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ৬ই মার্চ এ দিবসের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান ও পাটপণ্য মেলার উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জাতীয় পাট দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক বাণী দিয়েছেন।

ইট-পাথরে গড়া রাজধানীর অধিবাসীদের মধ্যে পাটপণ্য নিয়ে ভাবার জন্য প্রধান প্রধান সড়ক ও সড়ক দ্বীপগুলো পাট, পাটখড়ি, পাটের পণ্য, রং-বেরঙের ব্যানার, ফেস্টুন ও প্ল্যাকার্ড দিয়ে সাজানো হয়েছে এ দিবস উপলক্ষে। এছাড়া করা হয়েছে বাহারি রঙের আলোকসজ্জা। জাতীয় পাট দিবস উপলক্ষে নানা কর্মসূচি হাতে নেয় পাট মন্ত্রণালয়। এ দিবসকে সামনে রেখে ২৭ ও ২৮শে ফেব্রুয়ারি শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে পাটের ক্যানভাসে শিল্পীদের আর্ট ক্যাম্প, ১লা মার্চ মানিক মিয়া এভিনিউ থেকে মানিকগঞ্জ হয়ে ফরিদপুর পর্যন্ত রোড শো এবং ২রা মার্চ মানিক মিয়া এভিনিউ থেকে ময়মনসিংহ হয়ে জামালপুর পর্যন্ত রোড শো অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া ৩রা মার্চ হাতিরঝিলে নৌ শোভাযাত্রা, ৪ঠা মার্চ জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে কবিতা পাঠের আসর, ৫ই মার্চ সিরডাপ মিলনায়তনে সেমিনার, ৬ থেকে ৮ই মার্চ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে পাটপণ্যের মেলা, ৭ই মার্চ ঢাকা চেম্বার মিলনায়তনে সেমিনার, ৮ই মার্চ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে সমাপনী অনুষ্ঠান অয়োজিত হয়।

ব্রিটিশ ও পাকিস্তান শাসনামলে পূর্ব বাংলায় পাট ছিল প্রধান ও বৃহত্তম শিল্প। বিশ্ববাসী পাট দিয়েই চিনত বাংলাদেশকে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়েও প্রধান অর্থকরী ও রপ্তানি পণ্য ছিল পাট। আশির দশকে সিনথেটিক পণ্যের ব্যবহার শুরু হলে পাট খাতে ছন্দপতন দেখা দেয়। পাটের পুরোনো সুদিন ফিরিয়ে আনতে সরকার নানামুখী পদক্ষেপ নিচ্ছে। বর্তমানে নন জুটসহ সরকারি পাটকলের সংখ্যা ২৬টি ও বেসরকারি পাটকলের সংখ্যা ১৭০টি। পাটের ব্যাগ, পোশাক উৎপাদন উপযোগী সুতার কাঁচামাল, পাটকাঠির ছাই থেকে প্রসাধনীর কাঁচামাল ও পাট পাতার চা উৎপাদিত হচ্ছে বাণিজ্যিকভাবে। সাধারণ খেলনা থেকে অত্যাধুনিক জেটবিমান–সব মিলিয়ে প্রায় এক হাজার বহুমুখী পণ্য তৈরি করা হচ্ছে পাট থেকে।

বিশ্বব্যাপী ক্রমেই পাট পণ্যের বাজার বাড়ছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নে ২০১৯ সালের পর প্লাস্টিক ব্যাগের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পরিবেশ রক্ষার্থে বিভিন্ন দেশ একই পথে হাঁটছে। এতে বুঝাই যাচ্ছে, সারাবিশ্বে আরো বেশি বৃদ্ধি পাবে পাটপণ্যের ব্যবহার।

ব্রিটেনের সার্লস ফাউন্ডেশন নামের একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে বাগান পরিচর্চার জন্য পাটপণ্য রপ্তানি করছে বাংলাদেশের ক্রিয়েশন প্রাইভেট লিমিটেড। উচ্চমূল্যের এক পিস গার্ডেনিং পণ্যের দাম প্রায় ২০০ পাউন্ড। যুক্তরাষ্ট্রের ফোর্ড গাড়ির অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জায়ও ব্যবহার করা হচ্ছে বাংলাদেশের উচ্চমূল্যের পাটপণ্য। তরঙ্গ নামের একটি এনজিও পাটের পোশাক, ব্যাগ ও খেলনা রপ্তানি করে ইউরোপ ও আমেরিকার বিলাসী বাজারে ঢুকতে সক্ষম হয়েছে। হ্যারডসের মতো নামিদামি দোকান এবং ব্রিটেন ও ইউরোপের অনেক রাজবাড়িতে পাওয়া যাচ্ছে আমাদের দেশের পাটপণ্য। উড়োজাহাজের বডি, বিএমডব্লিউ বা ভক্সওয়াগন, নিশান, টয়োটা গাড়ির বডি ও অন্যান্য উপকরণ তৈরিতে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে পাটতন্তু। জার্মানি, পর্তুগাল, ফ্রান্সসহ বেশ কিছু দেশ ইতোমধ্যে প্রাকৃতিক তন্তুর ব্যবহার বাড়িয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, আফ্রিকা ও এশিয়ার উদীয়মান দেশগুলো টেকসই পণ্য হিসেবে পাট ও কৃত্রিম তন্তুর ব্যবহার বাড়িয়েছে। এইচএনএম, জারার মতো বড়ো বড়ো ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ থেকে বহুমুখী পাটপণ্য কেনার জন্য উদ্যোগী হয়ে উঠেছে।

বিগত তিন-চার বছর ধরে পাটের শোলা বা কাঠি আন্তর্জাতিক বাজারে নতুন পাটপণ্য হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। পাটকাঠি থেকে জ্বালানি হিসেবে চারকোল ও এর গুঁড়া থেকে ফটোকপি মেশিনের কালি তৈরি করা হচ্ছে। ফলে ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে পাট ও পাটজাত পণ্যের চাহিদা।

সরকারি সহায়তা বৃদ্ধি পাওয়ায় পাটের উৎপাদন বাড়ছে। ২০১৫ সালে পাটের উৎপাদন ছিল ৬৮ লাখ বেল। ২০১৬ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৮৫ লাখ বেল এবং ২০১৭ সালে ৯১ লাখ বেল। আগামী ১০ বছরে ২ কোটি বেল পাট উৎপাদন হবে বলে পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। বহুমুখী পাটজাতপণ্য রপ্তানিতে ২০ শতাংশ নগদ সহায়তা দিচ্ছে সরকার। স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন, রেল, সড়কসহ সরকারি বিভিন্ন বিভাগের টেন্ডারসহ বিবিধ কাজকর্মে জিও টেক্সটাইলের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ২০১১ সালে প্রণীত পাটনীতি ২০১৬ সালে সংশোধন করে পাট খাতের উন্নয়নে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সরকার। পাটের চাষ আধুনিকীকরণ, উন্নত পাট বীজ সরবরাহ, পাট গবেষণা ও উদ্যোক্তাদের সংযোগ বৃদ্ধির তাগিদ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে নতুন এই নীতিতে। ধান, চাল, গম, ভুট্টা, আটা, ময়দা, মরিচ, হলুদসহ মোট ১৭টি পণ্য পরিবহণ ও সংরক্ষণে পাটের ব্যাগ ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এ নীতিতে।

সরকারি পাটকলগুলোর যন্ত্রপাতি ৫০-৬০ বছরের পুরোনো। চীন সরকারের আর্থিক সহায়তায় এগুলো আধুনিকীকরণের উদ্যোগ নিয়েছে বর্তমান সরকার। সুতার কাপড়ের বিকল্প হিসেবে কোরিয়া ও চীনের সহায়তায় ভিসকস (পাটজাত সুতার তৈরি কাপড়) তৈরির একটি কারখানা তৈরি করা হচ্ছে। এছাড়া তিনটি বিশেষায়িত পাটকল স্থাপন করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনের নিমিত্তে। বাজার বহুমুখীকরণের অংশ হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে বাংলাদেশের। চুক্তি অনুযায়ী, অস্ট্রেলিয়ার জিএফএপিএল নামের প্রতিষ্ঠানটি যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডসহ আরো ৬টি দেশে বাংলাদেশের পাটপণ্যের বাজার বাড়াতে সহায়তা করবে এবং ৪৫৪ কোটি টাকার পাটপণ্য নেবে অস্ট্রেলিয়া।

বর্তমান সরকার ইতোমধ্যে বন্ধ হয়ে যাওয়া পাঁচটি পাটকল পুনরায় চালু করেছে। এই পাটকলগুলোর তিন হাজার কোটি টাকার ব্যাংক ঋণ ছিল যা সরকার মওকুফ করে সরকারই তা পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। চলতি ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জুলাই-জানুয়ারি সময়ে পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ আয় করেছে ৬ কোটি ১৮ লাখ মার্কিন ডলার, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ১৭.৩৬ শতাংশ বেশি।

শতভাগ পরিবেশবান্ধব পাট চাষ করলে এক হেক্টর পাট গাছ উৎপাদনের সময় ১৫ টন কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষিত এবং ১১ টন অক্সিজেন নিঃসরিত হয়। পাট চাষের সময় কোনো বিষাক্ত গ্যাস তৈরি হয় না বরং এটি মাটির উর্বরা শক্তি বাড়ায়। তাই পরিবেশবান্ধব পাটের উৎপাদন বাড়িয়ে পাটপণ্যের বহুমুখী ব্যবহারে সরকারি-বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে। পাটপণ্যের গুণগতমান, দৃষ্টিনন্দন ডিজাইন, সহজলভ্যতা–সর্বোপরি আগ্রাসী মার্কেটিং কৌশল পাটপণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

লেখক: প্রাবন্ধিক

দ্বন্দ্ব

ইফফাত আরা দোলা

এক থালা ধোঁয়া ওঠা গরম ভাত। পাতের কিনারে এক টুকরো পেঁয়াজ আর একটা কাঁচা মরিচ। ভাতগুলো দেখে মনে হচ্ছে এক থোকা শুভ্র শিউলি ফুল যেন। কাঁপা কাঁপা একটি হাত এগিয়ে গেল থালাটির দিকে। বড়ো বড়ো গ্রাসে মুখে পুরতে থাকল ভাত। প্রায় রাতেই জমির উদ্দিনকে এই কল্পনাটি করে ঘুমুতে হয়। ক্ষুধা পেটে তার কিছুতেই ঘুম আসে না। তাই বাধ্য হয়েই সে কল্পনার আশ্রয় নেয়। ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু ঘুম যে আজ কিছুতেই আসছে না। পেটের ভেতর কুণ্ডলি পাকানো রাক্ষুসে ক্ষুধা তার জীবন নিয়েই যেন আজ ক্ষান্ড় হবে। হঠাৎ গা শিউরে উঠল জমির উদ্দিনের। না, না, এত সহজে মরলে তো চলবে না। জীবন, সে বড়ো ভালোবাসে। জীবনের কাছে তার বিশেষ কিছু চাওয়ার নেই। দুটো খেতে-পরতে পারলেই সে খুশি। আর তাছাড়া সে মরে গেলে মরিয়ম আর সুর"জের কী হবে ! দবির যে তার ভরসাতেই ওদের রেখে গেছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জমির উদ্দিন। স্বাধীনতার তিন-চার বছর পর আজ জমির উদ্দিন ভাবেন, দবির বেঁচে থাকলে এমন দিন কি আর থাকতো! ছেলে জোয়ান হয়েই সংসারের ভার কাঁধে তুলে নিয়েছিল। শরীর-স্বাস্থ্য ছিল ভালোই। পরের ক্ষেতে কামলা দিত। তাই দিয়ে বাপ-ব্যাটার দিব্যি চলছিল। দবিরের মা মারা গিয়েছিল সে ছোটো থাকতেই। সংসারে তাই একটা মেয়েমানুষ দরকার। মেয়েমানুষ হলো ঘরের লক্ষ্মী। অনেক দেখেশুনে জমির উদ্দিন ছেলের জন্য বউ নিয়ে এল। মরিয়ম লক্ষ্মীর মতোই ঘরের শ্রী পালটে দিলো। চোখের সামনে ছেলে বউ সুখে সংসার করছে–দেখতে ভালোই লাগত জমির উদ্দিনের। পেটের ভেতর একটা ভয়াবহ পাক দিয়ে উঠল। ভাবনায় ছেদ পড়ল তার। মুহূর্তের জন্য চোখে অন্ধকার দেখল জমির উদ্দিন। নাহ, কাল সকালেই মরিয়মকে বলতে হবে চেয়ারম্যান বাড়ি যাবার কথা। মরিয়মের সব ভালো। শুধু একটাই দোষ– সে বড়ো একগুঁয়ে। যে কাজ করবে না বলে একবার স্থির করে; কারো সাধ্যি নেই তাকে দিয়ে সেই কাজ করায়। বিরক্তিতে চোখ-মুখ কুঁচকে যায় জমির উদ্দিনের। গরিবের আবার এত জেদ কীসের? গরিব মানুষ হবে পানির মতোন। পানি যেমন পাত্রের আকার ধারণ করে, গরিব মানুষও তেমনি পরিস্থিতি মতো আকার ধারণ করবে। কিন্তু মরিয়মকে বোঝায় কে? এই যে ঘরে বুড়ো শ্বশুর আছে, প্রতিরাতেই যে ক্ষুধায় তার মরো মরো দশা হয়, তা দেখেও সে কিছু করবে না। মরিয়ম কাজ করে মেম্বার বাড়িতে। দুইবেলা খাবার আর বছরে

দুটো কাপড়ের বিনিময়ে সে উদয়াস্ড় হাড়ভাঙা খাটুনি করে। যেটুকু খাবার পায় তা বাড়ি নিয়ে এসে তিনজনে ভাগ করে খায়। থালার ভাতটুকু শেষ হয়ে যায়। জমির উদ্দিনের ক্ষুধা মেটে না। সে আড়চোখে তাকায় সুর"জের থালার দিকে। যদি সুর"জ শেষ করতে না পারে তবে আরো একটু ভাত জুটে যাবে। কিন্তু এমন দিন আসে খুব কম। জমির উদ্দিন পেটে সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে মরিয়মের সাথে বচসা করে–

বৌ, ও বৌ।

কী কন?

তুমি এট্টুহানি চেরমেন বাড়ি যাও না? ওইহানে তো গবমেন্ট থিকা গম দেয়।

মরিয়মের কাছ থেকে কোনো উত্তর না পেয়ে জমির উদ্দিন আবার ডাকে–

ও বৌ, হুনছো?

কন।

রাও কড়ো না ক্যান? কাইল যাইবানি চেরমেন বাড়ি? গরম গরম গমের র"টি খাইতে বড়ো মজা। জমির উদ্দিন যেন তখনই গরম র"টির উত্তাপটুকু জিহ্বায় টের পায়। ও বৌ, কতা কও না ক্যান?

এত লালচ ক্যা আপনের? হারাদিন কাম কইরা যা পাই বেবাক তো আপনেই খাইয়া হালান। হেরপরও গমের কতা কন ক্যা? এত খাটনি খাইটা আমি আর কুনোহানে যাইতে পার"ম না।

জমির উদ্দিন চুপ করে যায়। দবির মারা যাওয়ার পর থেকে শান্ড়শিষ্ট মরিয়ম খিটখিটে মেজাজের হয়ে গেছে। আর কথাও খুব একটা মিথ্যে বলেনি সে। মেম্বার বাড়ি থেকে যা খাবার পায় তা তিনজনের জন্য যথেষ্ট নয় বলেই সে নিজে খায় খুব অল্প। বেশিরভাগ খাবারই তুলে দেয় ছেলে আর শ্বশুরের পাতে। মরিয়ম না থাকলে এই বুড়ো বয়সে জমির উদ্দিনের কী হতো কে জানে ! মনে মনে সে মাফ করে দেয় মরিয়মকে। আহা! মেয়েটা বড়ো দুখী। অল্প বয়সে স্বামীকে হারিয়ে ছেলে আর শ্বশুরের সব দায়িত্ব এসে চাপে তার ঘাড়ে। এ বাড়ি ও বাড়ি থেকে চেয়ে- চিন্ড়ে কিছুদিন চালানোর পর মেম্বার বাড়িতে কাজ নেয় সে। কষ্টে জমির উদ্দিনের বুকটা ভেঙে গিয়েছিল সেদিন। সুর"জ তখন দুধের শিশু। জমির উদ্দিনের পাশে ঘুমন্ড় সুর"জকে শুইয়ে দিয়ে মরিয়ম ক্ষীণস্বরে বলেছিল–

যাই আব্বা, সুর"জরে দেইখেন।

লম্বা একহাত ঘোমটা টেনে দ্র"তপদে মরিয়ম চলে যায়। জমির উদ্দিনের মুখে কোনো কথা ফোটেনি। ফুটবে কী করে? দেশ স্বাধীন হয়েছে। গালভর্তি দাড়ি আর মুখভর্তি হাসি নিয়ে এ গাঁয়ের মুক্তিযোদ্ধা ছেলেরা সবাই যে যার বাড়ি ফিরছে। জয়বাংলা শুনলেই লজ্জা-শরম ভুলে মরিয়ম ছেলে কোলে নিয়ে দৌড়ে যেত বাড়ির সামনের রাস্ড়ায়। ছোটো ছোটো দলে মুক্তিযোদ্ধারা গাঁয়ে ফিরত। কিন্তু কোনো দলেই দবিরকে দেখা গেল না। ধীরে ধীরে মরিয়মের মুখের সলজ্জ হাসিটি মুছে গিয়ে সেখানে নামল ভয়ের ছায়া। জমির উদ্দিনেরও বুক কাঁপতে লাগল অজানা আশঙ্কায়। একদিন খবর পাওয়া গেল– জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে একটা অপারেশনে শহিদ হয়েছে দবির। ও আল্লা গো... বলে মরিয়ম মূর্ছা যায় উঠানের মাঝখানে। সুর"জকে কোলে নিয়ে স্থাণুর মতো বসে রইল জমির উদ্দিন। এরপর স্বামীহারা ও সন্ড়ানহারা এ দুটি মানুষ একে অপরের অবলম্বন হয়ে উঠল। কিন্তু সংসার চলবে কেমন করে? চোখে-মুখে অন্ধকার দেখে জমির উদ্দিন। তার যা বয়স এবং শরীরের অবস্থা তাতে কোনো কাজ করে খাওয়ার উপায় নেই। সুযোগ বুঝে দুএকটা শয়তানও ঘুর ঘুর করতে লাগল মরিয়মের আশপাশে। দবির বেঁচে থাকতে যারা সারাক্ষণ ভাবি ভাবি বলে ডাকত তাদেরই কেউ কেউ মরিয়মকে বিয়ের প্রস্ড়াব দিয়ে বসল।

এ ঘটনার পরই মরিয়ম সিদ্ধান্ড় নিল কাজে যাবার। জমির উদ্দিনও অক্ষমতার যন্ত্রণায় বোবা হয়ে রইল।

মরিয়ম কাজে যাওয়ার পর থেকে খাওয়ার চিন্ড়া কিছুটা ঘুচল। মরিয়মের পাণিপ্রার্থীরাও হালে পানি না পেয়ে একসময় কেটে পড়ল। সবচেয়ে বড়ো পরিবর্তনটাও হলো মরিয়মেরই। দিনরাত চোখ-কান বুজে কাজ করে আর ছেলে সামলায়। কথাবার্তা বলে না মোটেও। শুধু প্রশ্ন করলেই তার জবাব দেয়। ছেলে নিয়ে আহ্লাদও শেষ হয়ে গেছে তার। জমির উদ্দিন নানাভাবে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে–

ও বৌ। এত ব্যাজার হইয়া থাইকো না। আল্লায় আমাগো দবিররে শহিদের মিত্যু দিছেন। এইডা কি কম বড়ো কতা?

মরিয়ম নীরবে হারিকেনের কাচ পরিষ্কার করতে থাকে।

বৌ, ও বৌ।

কী কন?

আমাগো দবিরে বাঁইচা নাই ঠিকই। কিন্তু হ্যায় সারা দ্যাশের মাইনষের মনে বাঁইচা থাকব। হগলে তারে ইজ্জত দিব। এই গেরামে আমগোর ইজ্জত সব চাইয়া বেশি, বুজলানি? মরিয়ম যথারীতি কোনো উত্তর দেয় না। গভীর মনোযোগে হারিকেনের কাচ পরিষ্কার করতে থাকে।

সকালে জমির উদ্দিন বেশ খোশমেজাজে থাকে। এ সময় সে নাতিকে পাশে নিয়ে দাওয়ায় বসে গুড়-মুড়ি খায়। গুড়-মুড়ি খুব ভালো জিনিস। খাবার পর দুই গাস পানি খেয়ে নিলে দুপুর পর্যন্ড় নিশ্চিন্ড়। কালকের রাতের কথা মনে পরে তার। ভাবতেই মনটা খারাপ হয়ে যায়। মরিয়ম এত পরিশ্রম করে সংসারটা টিকিয়ে রেখেছে। এরপর কোনো প্রয়োজনের কথা বলতে আর মন সায় দেয় না। কিন্তু না বলেই বা উপায় কী? দিনরাত এই জঠরজ্বালা তাকে প্রায় উন্মাদ করে তুলেছে। বাইরে বসেই সে হাঁক দেয়–

ও বৌ, তৈয়ার হইছনি? কামে যাওনের তো সময় হইয়া গেল।

অহনই যামু আব্বা। আপনের খাওন হইছে?

হ মা, চাইরডা মুড়ি খাইলাম। আমতা আমতা করে জমির উদ্দিন বলে, তোমারে একখান কতা কইতাম।

কী কতা, কন?

পরের বাড়ি কাম কর বইলা মনে কোনো দুক্কু রাইখো না বৌ। সবই আল্লার ইচ্ছা। আল্লায় যেমুন আমাগো দবিররে নিয়া গেছে তেমুনই বহুত ইজ্জত দিছে। আমগোর সুর"জে বড়ো হইয়া কইতে পারবো আমার বাপে এই দ্যাশের লিগা জীবন দিছে। দশ গেরামের মানুষ আমগোরে ভক্তি ছেরেদ্দা করবো। কিন্তু প্যাডের খিদা তো কাউরে মানে না। আমগো মতো গরিবের লিগাই তো গবমেন্টে গম দিতাছে। বাইত আহনের সময় তুমি চেরমেনের বাড়ি থিকা গম লইয়া আইও মা।

বহুদিনের নীরব মরিময় যেন বিস্ফোরিত হয় এবার–

ক্যান আব্বা, ক্যান আমার মানুষটা নিজের জীবন দিয়াও আমাগো মুহে দুইডা ভাত দিয়া যাইতে পারলো না? ক্যান এই দ্যাশে মুক্তিযুদ্দাগো বউ পোলাপান না খাইয়া মরে আর রাজাকাররা চেরমান হইয়া যায়? এইর লিগা কি হ্যায় যুদ্দে গেছিল? এই দ্যাশের লিগা হ্যায় নিজের পোলাডারে এক নজর না দেইখ্যাই মইরা গেল? কন আব্বা? আমি আপনের পোলারে হারাইছি। তয় যেই ইজ্জত আপনের পোলায় আমাগো দিয়া গেছে, হেই ইজ্জত নষ্ট করতে পার"ম না আব্বা। না খাইয়া মইরা গ্যালেও না।

মাথা নিচু করে বসে থাকে জমির উদ্দিন। ক্ষুধা আর ইজ্জতের দ্বন্দ্ব তাকে ক্ষুধার চাইতেও বেশি দুর্বল করে ফেলে।

মুক্তিযোদ্ধা মবিন

মো. মনিরুজ্জামান মনির

একাত্তরের কথা আজও মনে পড়ে। স্মৃতির পাতায় চির অম্লান সেই দিনগুলো। মনের মণিকোঠায় গেঁথে আছে একাত্তরের ঘটনা-দুর্ঘটনা। পঁচিশে মার্চ কালরাত্রি। ভয়াল কালো রাত। তবু স্বাধীনতাকামী মানুষ শত্রুর অগ্নি চক্ষুকে ভয় পায় না। বাঙালি ভয় করে না সংকটে। বাঙালি জান দেয়, মান দেয় না। এর প্রমাণ বাঙালি বহুবার দিয়েছে। এবারও প্রমাণ দিতে প্রস্তুত। স্বদেশ প্রেম যাদের অন্তরে তারা কোনো কিছু বাছ-বিচার না করেই মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ কেউ ভুলে যায়নি। দা-কোদাল-কাঁচি-কুড়াল যার কাছে যা ছিল তাই নিয়ে রুখে দাঁড়ালো। শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য দেশীয় অস্ত্র যাদের নেই, তারা বাঁশের লাঠি দিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার প্রস্তুতি নিল। স্বদেশে চলছে যুদ্ধের ট্রেনিং। মিত্রদেশ ভারত দিচ্ছে অস্ত্র ও গোলাবারুদ। ভারত সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলো সার্বিকভাবে। বর্ডার খুলে দিয়ে বাঙালিকে ভারতে নিয়ে গেরিলা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দিলো। দেশের ভেতরে থমথমে পরিবেশ। উত্তাল উত্তেজনা টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া, শহর থেকে গ্রাম, সারাদেশের ভেতর। বর্ডার খোলা, বাঙালিরা ঢুকতে থাকে ভারতে, প্রশিক্ষণ নিয়ে ফিরে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। ইতোমধ্যে বহু জায়গায় খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ হয়ে গেল। পাকবাহিনী আর রাজাকার, আল বদর, আল শামসের সাথে। যুদ্ধ থেমে নেই। চারদিকে স্লোগান–পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, তোমার-আমার ঠিকানা; লড়াই লড়াই লড়াই চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই। সবাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নেতা মেনে স্লোগান দিতে থাকে– আমার নেতা তোমার নেতা, শেখ মুজিব শেখ মুজিব। জয় বাংলা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্ম না হলে হয়তবা কোনোদিনও মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হতো না। সেই মহান নেতার ডাকে সাড়া দিয়ে পাক সেনাদের মোকাবিলা করার জন্য মুক্তিবাহিনীরাও ভারী ভারী অস্ত্র হাতে তুলে নিল। শক্তিশালী পাকবাহিনীকে মোকাবিলা করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন অস্ত্রের সাথে আরো জোগাড় হলো আগ্নেয়াস্ত্র।

দেশের মাটিতে চলছে যুদ্ধ। কিশোর মবিনের মন কিছুতেই ঘরে টিকছে না। রাতের বেলা ঘুম থেকে হঠাৎ আঁতকে ওঠে। ঘুম হয় না দেশের চিন্তায়। দুঃচিন্তা সবার মাঝেই বিরাজমান। নদী, ডোবা, খালবিলে ভেসে থাকে লাশ। লাশের গন্ধ বাতাসে ভেসে আসে। সন্তান হারানো মা-বোনের আত্মচিৎকার, মবিনকে ব্যাকুল করে দেয়। মবিন ভাবতে থাকে কীভাবে যুদ্ধে যাওয়া যায়। মবিনের চোখে-মুখে যুদ্ধের নেশা। মবিন জানে একদিন না একদিন ঠিকই এদেশ স্বাধীন হবে। বিজয় ঘণ্টা শুধু সময়ের ব্যাপার।

সেদিন ছিল এপ্রিল মাসের দশ তারিখ। মবিনের চাচাতো ভাই হাসান যুদ্ধে গেল। হাসান তাগড়া জোয়ান, তাই তাকে কেউই আটকাতে পারল না। অবশ্য তার বাবার অনুমতিও ছিল। হাসান যুদ্ধে যাওয়ার পর মবিনের সাহস আরো বেড়ে গেল। হঠাৎ একদিন মবিন তার বাবাকে বলল, বাবা আমি যুদ্ধে যাব। মবিনের বাবা চুপ করে রইলেন। মবিনের মাও চুপ। মবিন তার বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। মবিন বার বার তার বাবা- মায়ের কাছে যুদ্ধে যাওয়ার কথা বলতে থাকে। মবিনের বাবা-মা মবিনের কথায় সায় দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যেতে দেয় না। আবার দেশ মাতৃকার কথা চিন্তা করে না-ও বলতে পারে না। মবিনের বাবা-মা আছে দোটানায়। মবিন যুদ্ধে যেতে না পারায়, তার যুদ্ধ চলছে মনের সাথে। মবিন ভাবতে থাকে তার এখন কী করা উচিত। মবিন হঠাৎ দেখা পেল বদিউজ্জামান (বুইধা) মাঝির। বুইধা আগে নৌকা চালাতো গুমনী নদীতে। এখন শুধু মুক্তিযোদ্ধাদের পারাপার করে। কেউ তাকে বাধ্য করেনি। সে মনের টানেই এই কাজ করে। আরেক জন আছে চাঁচকিয়ার আব্দুল মজিদ। দুইজনই নৌকা চালায়। আর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে। বৃহত্তর পাবনার চলনবিল এলাকার মুক্তিযোদ্ধারা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে আব্দুল মজিদ আর বুইধা মাঝির নৌকায় বিভিন্ন পয়েন্টে যায়। পাকিস্তানিরা এগিয়ে এলেই তাদের ওপর আক্রমণ করে।

মবিন বুইধা মাঝিকে কাছে পেয়ে যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছে পোষণ করার কথা ব্যক্ত করল। বুইধা মাঝি মবিনের সাহসী মনোভাব দেখে মবিনকে নিয়ে গেল লতিফ মির্জার কাছে। লতিফ মির্জাই এই এলাকার কমান্ডার। বুক ভরা সাহস নিয়ে মবিন, আব্দুল লতিফ মির্জার কাছে তাকে যুদ্ধে নেওয়ার অনুরোধ করল। কমান্ডার সাহেব মবিনের চোখে-মুখে দাবানলের ছাপ দেখে মবিনকে যুদ্ধে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু শর্ত তার বাবা-মায়ের কাছে বলে আসতে হবে। মবিন মির্জা সাহেবকে তার সঙ্গে যাওয়ারও অনুরোধ করল। কমান্ডার লতিফ মির্জা মবিনের সাথে বুইধা মাঝিকে যেতে বলেন। মবিনের সাথে রওনা হলেন বুইধা মাঝি। বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে দেখল পুরো বাড়িতে আগুন জ্বলছে। মবিন দৌড়ে বাড়িতে গেল। বাড়ির আঙিনায় দেখতে পেল গলাকাটা মুরগির মতো তিন-তিনটা লাশ। নিথর হয়ে পড়ে আছে মবিনের বড়ো চাচা মুক্তিযোদ্ধা হাসান ভাইয়ের বাপ। একটু দূরেই মবিনের বাবা-মায়ের রক্তে রাঙানো দুটো দেহ। সারা বাড়িতে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত। কোথাও আবার ছোপ ছোপ রক্তের দাগ। এ দৃশ্য দেখে মবিন বুইধা মাঝিকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। মবিনের চাচাতো ভাই হাসান মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার অপরাধে কিছু সময় আগে একজন রাজাকার এবং দশ-বারো জন পাকবাহিনীর সদস্য এসে হাসানের বাবাসহ একই পরিবারের তিনজনকে গুলি করে হত্যা করে যায়। এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখে উপস্থিত কেহই চোখের অশ্রু আটকাতে পারলেন না। চোখ মুছে গ্রামের লোকজনের সাথে কোনোরকমে লাশগুলো দাফন করে মবিনকে সঙ্গে নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে গেলেন বুইধা মাঝি। মবিনকে প্রথম কাজ দেওয়া হলো ক্যাম্প থেকে খাবার বিভিন্ন জায়গায় মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পৌঁছাতে হবে। মবিন তাই করল। এইভাবে চলতে থাকে কিছুদিন। তারপর শুরু হয় সাহসী সব কর্মকাণ্ড। মবিন ছোট্ট একটা বাদামের ডালা গলায় ঝুলিয়ে বাদাম বিক্রি করতে করতে পাকবাহিনীর ক্যাম্পে ঢুকে যায়। আবার কখনো পেঁয়ারা নিয়ে গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য সংগ্রহ করে। ফিরে আসে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে। ঐ সকল তথ্যের ভিত্তিতে মুক্তিবাহিনী যুদ্ধ পরিচালনা করে। মবিন রোজ পাকবাহিনীর ক্যাম্পে যায়-আসে। মবিন এখন পাকবাহিনীর কাছেও বিশ্বাসী। এইভাবে কয়েক মাস কেটে গেল। মবিন পাকিস্তানিদের কাজ করে দিয়ে মন জয় করার পাশাপাশি উর্দু ভাষাও আয়ত্ত করে নিল। যাতে তথ্য সংগ্রহ করতে সহজ হয়। মবিন সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। বর্তমানে মবিন থোরা থোরা উর্দু কথা বলতে পারে। কথোপকথনের এক পর্যায়ে পাকবাহিনীর এক জোয়ানের মুখ থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য বের হয়ে গেল। আগামীকাল সকাল দশটার সময় পাকবাহিনীর একটা চৌকস দল সিরাজগঞ্জ হয়ে ট্রেন যোগে পাবনা ঢুকবে। ক্যাম্পের বড়ো বড়ো অফিসার তাদেরকে রিসিভ করতে যাবে। মবিন মনে মনে ঠিক করল। এই সুযোগ হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। মবিন ফিরে এসে আত্মঘাতী হামলা করার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে গেল। সেদিন ছিল শুক্রবার। তখন দশটা বাজার মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি আছে। কিছু সময় পরই চৌকস দলের সব সদস্যদেরকে নিয়ে অফিসাররা ক্যাম্পে ফিরে এল। মবিনও সুযোগ বুঝে ক্যাম্পের গোলাবারুদের গোডাউনে আগুন জ্বালিয়ে আত্মঘাতী হামলা করে পাকবাহিনীর ক্যাম্প উড়িয়ে দিলো। হামলা সফল হলো। পরদিন খবরের কাগজের হেড লাইন–এক বাদাম বিক্রেতার আত্মঘাতী হামলায় পঞ্চাশ পাক সেনা নিহত। এদিকে মবিনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু পাওয়া গেল মবিনের হাতে লেখা ছোট্ট একটা চিরকুট। লেখা আছে– সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। আজ আমি দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করলাম। এবার আর বুঝতে বাকি রইল না। ঐ বাদাম বিক্রেতাই মুক্তিযোদ্ধা মবিন।

সাবাস বাংলাদেশ, স্যালুট তোমার মবিনকে।

একাত্তরের শহিদ বুদ্ধিজীবী প্যারী মোহন আদিত্যের কাছে তাঁর সন্তান নটো কিশোর আদিত্যের লেখা চিঠি

আমার প্রিয় বাবা,

বাবা প্রণাম জানাচ্ছি তোমাকে বহু আলোকবর্ষ দূরের পথ থেকে। যে দূরত্ব কখনো আমি অতিক্রম করতে পারব না জানি। কিন্তু তবুও তোমাকে লেখার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। কারণ অনেক যন্ত্রণায় আমার মধ্যে শুধু ক্ষরণ হচ্ছে। আমি কাকে সেই কথা বলব। তুমি যখন চলে গেছ, তোমার অস্পষ্ট চলে যাওয়ার দৃশ্যপটও আমার মনে নেই। তোমার মুখাবয়ব কেবলই ধোঁয়ার মতো আমার মানসপটে জেগে আছে। তোমার আত্মত্যাগ আমার মতো হাজার হাজার পিতৃহারা সন্তানকে উজ্জীবিত করে। তোমার আত্মত্যাগের সোনালি ফসল আজ সমস্ত বাংলাদেশের মানুষকে দান করেছে জীবনীশক্তি। আমার শিশু সময়ের কষ্টটা কখনো কখনো কষ্টের শিশির হয়ে ঝরে পড়ে না, যখন দেখি জাতির পিতার আত্মত্যাগের যন্ত্রণা বুকে নিয়ে তার কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পিতার প্রদর্শিত পথে বীরদর্পে এগিয়ে চলেছেন। '৭১ এর যুদ্ধাপরাধী সেই সব নরঘাতকদের বিচার হচ্ছে এ মাটিতে।

বাবা, শৈশব স্মৃতিতে তোমার স্নেহ আমাকে এখনো আবেগতাড়িত করে। আমাকে নিয়ে যায় নষ্টালজিয়ায়। তোমার চির অদৃশ্য পটে চলে যাওয়ার পর আমি শ্যাওলার মতো শুধু ভেসে বেড়িয়েছি। বার বার হয়েছি স্নেহের কাঙাল। কোনো পিতা যখন তাঁর ঘরের শীতল ছায়ায় তাঁর সন্তানকে আদর করছে; দূর থেকে তাকিয়ে শুধু দেখেছি। অশ্রুর পসরায় আমার দু'চোখ আচ্ছন্ন হয়েছে। ভিখারির মতো শুধু মনে মনে তোমাকে ডেকেছি– বাবা তুমি ফিরে এসো, ফিরে এসো। গভীর রাত্রির মেঘমুক্ত আকাশের অন্ধকারে চকচকে তারার মেলায় তোমাকে খুঁজেছি বার বার। আমার বুকের মধ্যে অসম্ভব ক্রন্দনের রোলকে চেপে রেখেছি অনেক কষ্টে। সেই অবদমনের ফল্গুধারা কেউ কোনোদিন দেখেনি। তোমার চলে যাওয়ার পর মাকেও হারিয়েছি দিক চিহ্নহীন পথে। বাবা তোমাকে যারা হত্যা করেছে তারা বিজয় দর্পে হেসেছে। কিন্তু আমিতো জানি, তুমিতো এ দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছ। তোমার লোহর প্রতিটি কণা বৃথা যায়নি। আমি হয়ত নাম-গোত্র-পরিচয়হীন হয়েছি। পেয়েছি কাছের মানুষের ধিক্কার ও অবহেলা। বাবা জানতো, মানুষ কাছের মানুষের অবহেলায় বেশি কষ্ট পায়।

তিল তিল করে গড়ে তোলা তোমার স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান আজ বেড়ে বেড়ে ছোটো চারা গাছ থেকে মহিরুহ। শুধু সেখানে তোমার নাম কেউ জানে না। উচ্চারণ করে না মনের ভুলেও। তোমার নামে নেই কোনো মনুমেন্ট, রচিত হয়নি কোনো এপিটাফ। অথচ তুমি মিশে আছ এ দেশের শ্যামল মাটিতে, এ দেশের স্বাধীনতায়। বিজয় দিবসে, স্বাধীনতা দিবসের আনুষ্ঠানিকতায় ফুলে ফুলে ভরে যায় দেশ। সেই ফুলে ফুলে আমি যেন তোমারই অবয়ব দেখি।

সেই ১৯৭১ সালের ৮ই আগস্ট যেদিন পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যরা তোমার বুকের ওপর গুলি চালিয়ে বুক ঝাঁজরা করে দিয়েছিল। বুক থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছিল। সেদিনও তুমি অকুতোভয়ে প্রতিবাদী হয়ে শহিদ হয়েছিলে। বহুদূর থেকে বয়ে আনা শ্রী শ্রী ঠাকুরের পাদুকা তোমার রক্তে রক্তাক্ত হয়েছিল। তুমি চিৎকার করে বলেছিলে 'জয় বাংলা'। তোমাকে হত্যা করে ওরা জলপাই রঙের কনভয় চালিয়ে কালো ধোঁয়া উড়িয়ে চলে গিয়েছিল। তোমার শহিদি দেহের সৎকার করার জন্য কোনো লোক ছিল না। আমিতো অবোধ শিশু ছিলাম।

বাবা, আমার হয়ত একটু অস্পষ্ট সন্ধ্যার আলোকের মতো তোমার কথা কিছুটা মনে আছে। কিন্তু সেই সময়ের অবুঝ শিশুটির কথা কি তোমার মনে আছে? কারণ সেই মহা বিপর্যয়ে আমরা সবাই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি। এই জগৎ সংসারে শুধু অবহেলায় অবহেলায় ভেসে চলেছি। বৃক্ষ ভেবে গাছের যে ডালই ধরতে গেছি সে ডালই ভেঙে পড়েছে। কারণ বাবা ছাড়া আর কেউই যে তার সন্তানকে ভালোবাসতে পারে না।

এখনো অন্ধকার রাত্রির তারা খচিত আকাশে তাকিয়ে তোমাকে খুঁজি যে বাবা। ইচ্ছা হয় চিৎকার করে ডাকি– বাবা তুমি ফিরে এসো।

ইতি, তোমার

নটো কিশোর আদিত্য

লেখক: নটো কিশোর আদিত্য, পাকুটিয়া, টাঙ্গাইল

সাফল্যের বিজয় নিশান

শাফিকুর রাহী

পিতা তোমার অযোগ্য অক্ষম অপদার্থ কাপুরুষ অভিশপ্ত সন্তানেরা
আজও তোমাকে ভোলেনি; তোমাকে যে কেউ ইচ্ছে করলে কী
ভুলতে পারে! না; কখনো না; তোমাকে ভোলা যায় না!
বিশ্বখ্যাত জ্ঞানীদের অমূল্য প্রবাদবাক্য আজ মিথ্যে
প্রমাণিত হলো কেবল তোমার বেলায়। মানুষেরা বলে থাকেন,
অযোগ্য সন্তানেরা নাকি পিতাকে সহজেই ভুলে যায়,
আসলেও তোমাকে ভোলা যায়? না, তুমি তো ভিসুভিয়াসের
অগ্নিগিরির মতো অনন্ত উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হয়ে আজও
প্রমাণিত সত্য হয়ে বিরাজমান সমগ্র বিশ্ব লোকালয়ে।

যিনি অমরত্বের স্বপ্নবীজ বপন করে হয়েছেন
কালজয়ী কালপুরুষ মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণ। তাঁর মহান আদর্শ
বুকে ধারণ করে আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর
শুভ সম্ভাবনায় আলোকিত আগামী বিনির্মাণে ওড়াবো
সাফল্যের বিজয় নিশান। আর সে সফলতার সুবর্ণ ভূমিতে
গণমানুষের অংশীদারিত্বের অখণ্ড ঐক্য সবচে বেশি জরুরি
বাঙালি জাতিরাষ্ট্রের মুক্তির মিছিলে অসংখ্য নিরীহ প্রাণ
করেছিল আত্মদান। অথচ এক দুঃসহ কালবেলায়।

তাঁদের নাম-নিশানাও মুছে ফেলার অপচেষ্টা অপবাদ অপযুদ্ধে
ইতিহাস বিকৃতির নষ্ট নমুনা জাহির করা হয়েছিল এ বাংলায়।
আজ দেখুক সে নরঘাতক পিতৃহন্তারকের বেহুদা রাজনৈতিক দল
আর পাক-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এ দেশীয় দালাল নষ্ট নরাধমরা।
এখানে প্রগতিশীল শান্তিপ্রিয় সত্যের স্বপক্ষের আত্মপ্রত্যয়ী
বীরের পবিত্র মাটিতে কোনো গণদুশমনের স্থান নেই।
আর আমাদের আকাশচুম্বী উত্থানে শক্তি ও সাহস জোগাবে
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান; যিনি আমাদের মহা আদর্শ।

স্বাধীনতার মূলমন্ত্র

পৃথ্বীশ চক্রবর্ত্তী

স্বাধীনতার মাস এলে বিজয়ীরা আনন্দিত হন
বিজয়ী কবির মনে সাধ জাগে কবিতা লেখার
বিজয়ী প্রেমিক দেখে মুগ্ধ হাসি তার প্রেমিকার
বসন্ত হাওয়া যেন বিজয়ীর ছুঁয়ে যায় মন।

একুশের হাত ধরে একাত্তরে আসে এ বিজয়
কত সাধ কত স্বপ্ন কত আশা ও প্রত্যাশা নিয়ে
ত্যাগ-তিতিক্ষা অনেক ইজ্জতের এ-ও বিনিময়
বহু ঝড় বহু যুদ্ধ বহু প্রাণ বহু রক্ত দিয়ে।

কতজনই অতীত ভাবে মার্চ এলে পরে
শহিদ ছেলের লাশ ভেসে ওঠে জননীর চোখে
বিধবা মায়ের বুক ওঠে তীব্র হাহাকার করে
বীরাঙ্গনা মা'র চোখ রক্তজবার মতোন জ্বলে শোকে।

ভেদাভেদ ভুলে জাতি লাখো প্রাণে গড়ে বাংলাদেশ
সাম্য, মৈত্রী ও সম্প্রীতি তাই স্বাধীনতার আসল উদ্দেশ্য
তবে কেন বেড়ে যাচ্ছে স্বার্থ-দ্বন্দ্ব-সংঘাত-বিদ্বেষ
মানবিকতার মন্ত্রে গড়তে হবে সোনার স্বদেশ।

কে আমি

সালমা নাসরীন

তুমি সৌরলোকের অত্যুজ্জ্বল সূর্য
আমি নিশ্ছিদ্র অন্ধকার
তুমি বিধাতার প্রেরিত প্রতিনিধি
আমি প্রতারণার শিকার।

তুমি প্রথম সৃষ্টি স্রষ্টার
মুখ্য তুমি, সর্বত্র তোমার জয় জয়কার।
আমি সংখ্যাতিরিক্ত অস্থিতে গড়া
এক ইচ্ছের পুতুল বই তো নই!
স্ড়াবকের স্ড়বে যদি বা দেবী হই
তাতে কি আমি আনন্দিত রই?

আমি বন্দি শোষিত সর্বহারা
আমি ক্রীতদাসের ক্রীতদাসী
আমি বিত্তবানের পরগাছা
আমি মুক্তি অভিলাষী।
তুমি প্রভু, তুমি মুখ্য, তুমি শাশ্বত কায়া
আমি গৌণ কেবলই এক অস্পষ্ট ছায়া
নানা অবয়বে অবতীর্ণ আমি নানা ভূমিকায়
কন্যা, মাতা, গৃহিনীর অসার মহিমায়
আমি সুভাষিতা কল্যাণী ললিতা
প্রবঞ্চিত স্ড়বস্ড়তিতে চির অবনতা
অধিকার অচেতন আত্মবিমুখ আমি

একমাত্র ভরসা আমার অন্তর্যামী।

স্বাধীনতার গান

আনসার আনন্দ

ভাগিরথী নদীর বুকে
নীল বেদনার ঢেউ
স্মৃতির বালুকা বেলায়
একটি মানচিত্র কাঁদে।
পলাশির আম্রকাননে
ডুবে যায় বাংলার শেষ সূর্য
বাঙালির বুক হলো পাথর
নিজ দেশ হলো পরবাস।
অবশেষে উদাসী বাউল
গেয়ে যায় ভাঙনের গান
ভাঙল আকাশ ভাঙল মাটি
ভেঙে গেল তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা
ভেঙে গেল সিপাহি বিদ্রোহ
মুক্তি বাউল-বিনয়, বাদল, দীনেশ
ক্ষুদিরাম, সূর্যসেন, প্রীতিলতা
কত শত জীবন হলো বলিদান।
পলাশি থেকে বৈদ্যনাথতলা
জীবন-মরণের খেলা–
বাহান্ন-উনসত্তর অবশেষে
একাত্তরে এল স্বপ্নের কারিগর
বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে অগ্নিবীণার সুর–
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'
এক সাগর রক্তের দামে কেনা
আমার লাল-সবুজের পতাকা
আজ ভোরের পাখিরা গেয়ে যায়
মুক্তির গান স্বাধীনতার গান।

জার্নাল-৭১

সোহরাব পাশা

ঘুমের ভেতর ডেকে ওঠে মৃত্যু
নৈঃশব্দকে তুমুল জাগিয়ে তোলে দাহ
নিরীহ বাতাস পুড়ে যায়,
ওড়ে তীব্র শোকের মৌমাছি
সুচবিদ্ধ চোখ থেকে রক্ত ঝরে স্বপ্ন ভিজে যায়
অসহায় মানুষের। সকাল হয় না
দুপুর বেলায় গোধূলির ছায়া নামে,
দু'একটি গাছে ঝুলে থাকে
শীর্ণ রোদের কঙ্কাল;
নিচে নষ্ট বাঙ্কারে মাথার খুলি, ভাঙা লাল চুড়ি,
অতঃপর ওই লাল রক্তে লাল সূর্য,
আগুন দিগন্তে, সৃজনের বীজতলা।

রংতুলিতে আঁকি

মো. জাকির হোসেন চৌধুরী

রক্তে কেনা স্বাধীন দেশ এই
মায়ের মধুর হাসি
বাংলা আমার কী অপরূপ
সব্বাই ভালোবাসি।
সবুজ ঘাস আর বন-বনানী
ক্ষেতের পাকা ধান
হৃদয় কাড়ে বাউল সুরের
বাংলা মায়ের গান।
৭ই মার্চের বজ্র ভাষণ
যুদ্ধে যাওয়ার দিন,
বিজয়ের সুখ স্বপ্নের
পতাকা উড্ডীন।
দেশটাকে তাই মায়ের মতো
দু'চোখ ভরে দেখি
স্বাধীন দেশের গাঁয়ের ছবি
রংতুলিতে আঁকি।

বাংলার জয়

শম্পা প্রদীপ্তি

জয় জয় বাংলা বাংলা...
বিজয়ের সুর যখনি ছড়িয়ে গেল দূর বহুদূর–
তখনি ঘাতক-খুনির দল;
বাঙালি যোদ্ধাদের করল কতল।
চৌদ্দ ডিসেম্বর সেই কালরাত
মানুষের খুনে রাঙে দানবের হাত।
হানাদার সেনা, শামস-রাজাকার
ভেবেছিল স্বাধীনতা থাকবে না আর।
ভেবেছিল জ্ঞানীদের করে দিলে শেষ–
দেশ হবে হীনবল, মূর্খের দেশ।
তাদের ধারণা সব মিথ্যে হলো–
বলেন জাতির পিতা সামনে চলো।
জাতির পিতার ডাকে স্বাধীন জাতি
স্বদেশ গড়তে বুকে জ্বালল বাতি।
ভাঙা দেশ গড়ে ওঠে এমন সময়
পরাজিত ঘাতকেরা একজোট হয়।
তারপর এল এক ভয়াবহ রাত
পিতার রক্তে রাঙে ঘাতকের হাত।
দেশ হলো পিতাহারা, জাতি কেঁদে মরে;
হানাদার-দোসরেরা লাফালাফি করে।
ক্ষমতার মসনদে বসে পড়ে তারা...
দীর্ঘ সময় জাতি ছিল দিশেহারা।
এমন ক্রান্তিকালে কী থাকে ভাবার...
তখনি স্বদেশে ফেরা শেখ হাসিনার।
দেশ ফের হেসে ওঠে আলোয়-আলোয়
রোল ওঠে জয় জয়... বাংলার জয়!

মুজিব মানে

সাঈদ তপু

মুজিব মানে বাংলাদেশের
তেরো শত নদী
মুজিব মানে বয়ে চলা
জনম নিরবধি
মুজিব মানে তেজঃপুঞ্জ
চৈতালি পুব হাওয়া
মুজিব মানে অচেতনে
চেতন ফিরে পাওয়া
মুজিব মানে জাগরণের
মুক্তিকামী গান
মুজিব মানে দেশের প্রতি
অন্যরকম টান
মুজিব মানে আকাশ ভরা
হাজার তারার ঝলক
মুজিব মানে মায়ায় ভরা
অবুঝ শিশুর পলক
মুজিব মানে মাটির সাধক
মুজিব মানে দেশ
মুজিব মানে রবির আলো
ক্ষ্যাপা বাউল বেশ
মুজিব মানে মানবতা
মুজিব মানে সবার
এমন মহান বিশ্বমানব
কে পেয়েছে ক'বার ?
মুজিব মানে উদার আকাশ
মুজিব মানে প্রেম
মুজিব মানে ত্যাগের সুতোয়
স্বাধীনতার ফ্রেম
মুজিব মানে আঁধার ভেঙে
নতুন আলোর সিঁড়ি
মুজিব মানে মুক্ত ডানায়
বাতাস ঝিরিঝিরি
মুজিব মানে স্বপ্নে দেখা
মহান নেতার ছবি
মুজিব মানে বজ্রসুরের
বিশ্বজয়ী কবি
মুজিব মানে উন্নত শির
গগনভেদী তীর
মুজিব মানে যুদ্ধে শহিদ
ত্রিশ লক্ষ বীর
মুজিব মানে বিজয় প্রতীক
মুজিব মানে সাহস
আগে সবাই মুজিব হ ভাই
পরে তোরা যা হস।

তপ্ত বালুচর

পারভীন আক্তার লাভলী

তপ্ত বালুচরে লক্ষ বছর ধরে
তোমার জন্য... আছি দাঁড়িয়ে
কত রৌদ্র কত খরতাপ
কত ঝড়-বৃষ্টি, কত শীলাপাত
কত-শত বার প্রলয় মেঘের বজ্রনিনাদ।
কতবার আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত
তবু পাথরের মতো আজও আছি দাঁড়িয়ে।
কবেই তো মরে গেছি...
তবু কঙ্কাল হয়ে আজও বেঁচে আছি,
তপ্ত বালুচরে লক্ষ বছর ধরে
তোমার জন্য... আছি দাঁড়িয়ে
তোমার পদচিহ্ন, ছায়া-মায়া
সবই আজও অবিনশ্বর
তপ্ত বালুচরে দু'জনে হাত ধরে
হয়েছিলাম সকলের দৃষ্টিগোচর।

আমাদের স্বাধীনতা

নূর মোহাম্মদ

আমাদের স্বাধীনতা পতাকার গান
রক্তিম বৃত্তটা শহিদের মান
সবুজের সব দিক বাংলার শাণ।

আমাদের স্বাধীনতা মুক্তির তাজ
নয় মাস যুদ্ধের বিজয়ের সাজ
এমন নজির নেই সেই থেকে আজ।

আমাদের স্বাধীনতা সুশীতল বায়ু
নিশানের গায়ে মিশে এদেশের আয়ু
মনে আনে শিহরণ সাহসের জায়ু।

আমাদের স্বাধীনতা মায়ের মতন
আদর-সোহাগ দিয়ে করছে যতন
জেগে হেসে ওঠে তাই মানিক-রতন।

আমাদের স্বাধীনতা সুখের বহর
রুপালি নদীর বুকে দুধের নহর
কূলে কূলে তার গাঁও হাওর শহর।

আমাদের স্বাধীনতা রুপালি পুকুর
শাপলার সাথে হাসা রোদেলা দুপুর
বধূর সাঁতারু পায়ে পানির নূপুর।

আমাদের স্বাধীনতা সবুজের ঢেউ
জলাশয় আসমান–ভালো লাগে তেউ
সেভাবেই জেগে ওঠে আগামীর কেউ।

আমরা তো আছি

শান্তনু চট্টোপাধ্যায়

যেদিন তোমার ছেলেরা,
তোমাকে না বলে
চিরদিনের জন্য চলে গিয়েছিল–
তুমি জানো না,
কোথায় গেছে তাঁরা!
ভেবেছিলে, ফিরে আসবে আবার
প্রতিদিনের মতো তোমার কাছে ॥
যত রাত বাড়ে,
তোমার মনের মধ্যে বাঁধতে থাকে
ধীরে ধীরে জমাট কালো মেঘ!
একদিন না একদিন তাঁরা আসবেই–
এই আশা নিয়ে আজও
দু-মুঠো ভাত নিয়ে
তাকিয়ে আছ পথের দিকে!
দিনের পর দিন চলে যায়–
তবুও তাঁরা আসে না।
ওরা আসবে বলে
আর কতদিন তাকিয়ে থাকবে
দু-মুঠো ভাত নিয়ে পথের দিকে–
জানি না!
ওরা না এলেও
আমরা তো আছি, তোমার কাছে
আমরা তো আছি ॥

এই পতাকা

ওয়াসীম হক

এই পতাকা রক্ত ঝরা আমার প্রিয় ভায়ের
এই পতাকা অশ্রুভরা পুত্রহারা মায়ের
এই পতাকা দোয়েল-শ্যামা-ময়না পাখির গান
এই পতাকা বিশ্বজুড়ে আমার দেশের মান

এই পতাকা সুখে-দুখে দৃষ্টি অনিমেষ
এই পতাকা কোমল পরশ আমার বাংলাদেশ
এই পতাকা চিরসবুজ, এই পতাকা লাল
এই পতাকা হৃদয় জুড়ে থাকবে চিরকাল।

ফাগুনের ডালায়

আব্দুল আওয়াল রনী

ফাগুন এসেছে;
বসন্তের ডালা সাজিয়ে।
হরেক সাজের,
সাজ নিয়ে।
যার যেটা প্রয়োজন,
নাও কিনে সাজন।
লাজলজ্জা ত্যাগ করে
নাও সাজ আপন করে।
যেমন খুশি,
তেমন সাজো।
মনটাকে খুশি করো,
উল্লাসের জাহাজ ধরো।
এই সুযোগ,
করো ভোগ।
মনটারে দাও সুখ
অন্তরে জমা অনেক দুখ।
যার যেমন জীবন
সেই জীবনের কত স্বপন।
স্বপ্নের ঘোর মিটাতে যেয়ে।
দেহ-মন গেছে বিষিয়ে।
প্রকৃতির শ্রী মমতার টানে
যেতে হবে আনন্দ ভ্রমণে।
রূপসি বাংলা নিমন্ত্রণ করেছে
উদার নয়নে চেয়ে আছে।
ভোগের উদারতায় উদার
কৃপণতা নেই প্রয়োজন যেমন যার।
সাগর নিমন্ত্রণ করেছে,
উদার চিত্তে ডাকছে।
অঢেল আনন্দ উল্লাস
অঙ্গ ম্লানে সঙ্গের নেই শেষ।
পাহাড় ই-মেইল করেছে,
এসো প্রিয় প্রিয়া।
এখানেই প্রেমের কানন
কত প্রেমের স্মৃতি বহমান।
অতীত বর্তমান খুঁজে পাবে
পাবে সুরাঞ্জলীতে মনের যৌবন!
উদয় শশী, মেঘে ঢাকা পড়শি
ছুটে আসবে তারুণ্যয় সরসী ॥
অফুরন্ত ভোগের আছে রূপ
রূপের আয়নায় খুঁজে পাবে
চূড়ায় দাঁড়ালে
নয়ন সার্থকতা পাবে।

মার্চ আসে দ্বারে

সেঁজুতি রহমান

মাগো আমার কানে বাজে যুদ্ধ ঘোষণার ধ্বনি
মেতে উঠল কামার-কুমার তোমার নয়ন মণি।
রক্তে আমার জেগে ওঠে স্বাধীনতার মান,
শক্ত হাতে অস্ত্র ধরে সাহসী সন্তান।
কৃষক, মজুর, ছাত্র, জনতার মুখে বঙ্গবন্ধুর নাম
আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হলো মুক্তির সংগ্রাম।
ছুটল সবাই রণাঙ্গনে লক্ষ মুক্তিসেনা,
মনেপ্রাণে ধারণ করে ৭ই মার্চের ঘোষণা।
হাতে নিয়ে লাঠিসোঁটা যার যা আছে ঘরে,
স্বাধীন দেশ পেলাম আমরা লক্ষ প্রাণের তরে।
যে ভাষণে মুক্তি পায় জেল-জুলুম আর দুঃশাসন
বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যে আজ স্থান পেল সে ভাষণ।
আনন্দে উদ্বেলিত সবার মুখে জয় বাংলার ধ্বনি
সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে লাখো জনতার মুখে ঐ অমর বাণী।
মুক্ত স্বাধীন আমরা সবাই হাসি সবার ঘরে,
বছর ঘুরে আবার দেখ মার্চ আসে দ্বারে।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১৯শে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩য় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন–পিআইডি

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

রোগীরা হাসপাতালের অতিথি : রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেছেন, চিকিৎসা প্রদানের সময় জনগণের সক্ষমতা বিবেচনায় রাখতে হবে, যাতে কোনো রোগী অর্থাভাবে চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত না হয়।

১৯শে ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি উপরিউক্ত কথাগুলো বলেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, দেশে এখনো চিকিৎসক, রোগীর আনুপাতিক হার সমপরিমাণ নয়। তবে তারপরও স্বাস্থ্যসেবা পেতে যাতে জনগণকে হতাশ হতে না হয়, এজন্য চিকিৎসকদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা থাকতে হবে। দেশে ওষুধ ও চিকিৎসা পদ্ধতি দিন দিন আধুনিক হচ্ছে। স্থানীয় চিকিৎসক ও চিকিৎসা ব্যবস্থার ওপর জনগণের আস্থা অর্জনে সর্বশেষ আবিষ্কার ও প্রযুক্তি সম্পর্কে আরো জ্ঞান অর্জনের জন্য চিকিৎসকদের এগিয়ে আসতে হবে। তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্য সুবিধা পৌঁছে দিতে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে ই-সার্ভিস চালু করারও পরামর্শ দেন তিনি।

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

ঐতিহ্য-সংস্কৃতিকে যথাযথ মর্যাদা দেওয়ার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০শে ফেব্রুয়ারি ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে রাষ্ট্রের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সম্মাননা একুশে পদক প্রদান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী দেশের গৌরবময় ইতিহাস ও কৃষ্টিকে কেউ যেন ভুলে না যায় সেজন্য তা সংরক্ষণের এবং মর্যাদা দেওয়ার আহ্বান জানান। আগামী প্রজন্মের জন্য এগুলো প্রচার ও সংরক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন প্রধানমন্ত্রী। পরে প্রধানমন্ত্রী ২১ জন দেশবরেণ্য ব্যক্তিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ একুশে পদক ২০১৮ প্রদান করেন।

২০শে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে একুশে পদকপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা–পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে 'শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৮' উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান–পিআইডি

ইফাদ অধিবেশনে অংশগ্রহণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১১ই ফেব্রুয়ারি জাতিসংঘের কৃষি উন্নয়ন তহবিলের (ইফাদ) পরিচালনা পর্ষদের ৪১তম বার্ষিক অধিবেশনে যোগ দিতে ইতালির রাজধানী রোমের লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি ফিউমিচিনো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছেন। ১৩ই ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূর করতে গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিনিয়োগের জন্য উন্নয়ন সহযোগীদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান এবং এক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগীদের আরো উদার হতে হবে বলে উল্লেখ করেন। ইফাদ-এর পরিচালনা পর্ষদের বার্ষিক অধিবেশনের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে প্রধানমন্ত্রী একথা বলেন।

তিনি রোমে ইতালি প্রবাসীদের সঙ্গে এক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। ভ্যাটিকানে পোপ ফ্রান্সিসের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠককালে বাংলাদেশের ধর্মীয় সম্প্রীতির প্রশংসা করেন পোপ ফ্রান্সিসকো। একই সঙ্গে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করেন। প্রধানমন্ত্রী পোপকে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ওপর একটি চিত্রকর্ম উপহার দেন এবং আইএফএডি'র পরিচালনা পর্ষদের সভায় যোগ দেন। পরে তিনি ১৬ই ফেব্রুয়ারি ইতালি থেকে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হন।

চা প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৮ই ফেব্রুয়ারি বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টারে বাংলাদেশ চা প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী চায়ের উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি এর বহুমুখী ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং ফ্লেভারযুক্ত চা ছাড়াও চা থেকে বিভিন্ন প্রসাধন সামগ্রী–টি সোপ, টি শ্যাম্পু, টি টুথপেস্ট প্রভৃতি এবং খাদ্য সামগ্রী যেমন- টি কোলা, চা-এর আচার প্রভৃতি উৎপাদনের সুযোগ রয়েছে বলে উল্লেখ করেন। ধানের বিভিন্ন প্রজাতির মতো ক্ষরা সহিষ্ণু চা উৎপাদনের দিকে সংশ্লিষ্টদের নজর দেওয়ার এবং চা শ্রমিকদের কল্যাণে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য বাগান মালিকদের প্রতি আহ্বান জানান। পরে তিনি চায়ের নতুন জাত 'বিডি ক্লোন-২১' অবমুক্ত করেন এবং ৭টি ক্যাটাগরিতে চা উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার প্রদান করেন।

বাংলার ব্যবহার ও চর্চা সমুন্নত রাখার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে 'শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৮' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী দেশের অধিকতর উন্নয়ন এবং বিশ্বে জাতির ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে বাংলা ভাষার যথাযথ চর্চা, ব্যবহার এবং সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সমুন্নত রাখতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

রাজশাহীতে ৩৩টি প্রকল্পের উদ্‌বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২২শে ফেব্রুয়ারি রাজশাহী সরকারি মাদ্রাসা ময়দানে এক জনসভায় অংশগ্রহণ করেন। সভাস্থল থেকে প্রধানমন্ত্রী ফলক উন্মোচনের মাধ্যমে রাজশাহীতে ২১টি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্‌বোধন এবং ঢাকা মহানগর পুলিশের নতুন ৮টি থানাসহ ১২টি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

মন্ত্রিসভায় হজ প্যাকেজ অনুমোদন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬শে ফেব্রুয়ারি তাঁর কার্যালয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী 'জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৮' এবং 'হজ প্যাকেজ ২০১৮'র খসড়া অনুমোদন দেন। সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্যাকেজ ১-এর আওতায় ৩ লাখ ৯৭ হাজার ৯২৯ টাকা, প্যাকেজ ২-এর আওতায় ৩ লাখ ৩১ হাজার ৩৫৯ টাকায় হজে যাওয়া যাবে। বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় সর্বনিম্ন ৩ লাখ ৩৭ হাজার টাকায় হজে যাওয়া যাবে।

প্রতিবেদন: সুলতানা বেগম

তথ্য মন্ত্রণালয় : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রেস কাউন্সিল পুরস্কার ২০১৮ প্রদান

১৪ই ফেব্রুয়ারি প্রেস কাউন্সিল দিবস। এ দিবস উপলক্ষে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ১৮ই ফেব্রুয়ারি আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ মনোনীত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে ছয়টি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন– প্রাতিষ্ঠানিক সাংবাদিকতায় দৈনিক সংবাদ, আজীবন সম্মাননা আব্দুল গাফ্‌ফার চৌধুরী, নারী সাংবাদিকতায় বরিশাল সময় পত্রিকার রিপোর্টার মর্জিনা বেগম, আলোকচিত্র সাংবাদিকতায় আমাদের সময় পত্রিকার রিপোর্টার আলামিন লিওন,

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১৮ই ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল পদক প্রদান ২০১৮' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন–পিআইডি

উন্নয়ন সাংবাদিকতায় দৈনিক জনকণ্ঠের সিনিয়র রিপোর্টার রাজন ভট্টাচার্য এবং গ্রামীণ সাংবাদিকতায় দৈনিক সমকালের রাজীব নূর। প্রখ্যাত সাংবাদিক আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর পক্ষে পুরস্কার গ্রহণ করেন দৈনিক সমকাল সম্পাদক গোলাম সরওয়ার।

প্রেস কাউন্সিল চেয়ারম্যান বিচারপতি মমতাজ উদ্দিন আহমদ-এর সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম এবং তথ্যসচিব মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

শুদ্ধ বাংলা ভাষা চর্চার শিক্ষক বাংলাদেশ বেতার

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ১৩ই ফেব্রুয়ারি ২০১৮ আগারগাঁওয়ে জাতীয় বেতার ভবনে 'বিশ্ব বেতার দিবস ২০১৮' উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন–পিআইডি

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ১৩ই ফেব্রুয়ারি রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ বেতার কেন্দ্রীয় অফিসের সামনে আন্তর্জাতিক বেতার দিবস উপলক্ষে র‍্যালি-পূর্ব শুভেচ্ছা বার্তায় বলেন, বাংলাদেশ বেতার বহুমাত্রিক সম্প্রচার কেন্দ্র, শুদ্ধ উচ্চারণে বাংলা কথনের প্রচার কেন্দ্র এই বাংলাদেশ বেতার স্বাধীনতা যুদ্ধে শব্দসৈনিক হিসেবেও ভূমিকা রেখেছে। 'ক্রীড়াঙ্গনে বেতার'– এ প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে এবার পালিত হয় বিশ্ব বেতার দিবস ২০১৮।

দিবসটি উপলক্ষে তথ্যমন্ত্রী আরো বলেন, মুক্তিযুদ্ধের আগে এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় সবচেয়ে বলিষ্ঠ কণ্ঠযোদ্ধা বা শব্দসৈনিক স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পাশে থাকা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে থাকা বাংলাদেশ বেতারের দীর্ঘদিনের সম্প্রচারকে মহিমান্বিত করেছে। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের প্রচার কেন্দ্র এবং ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ভাষণের বাণী সম্প্রচার কেন্দ্র হচ্ছে বাংলাদেশ বেতার।

অমর একুশে গ্রন্থমেলায় তিনটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ২৫শে ফেব্রুয়ারি অমর একুশে গ্রন্থমেলার মোড়ক উন্মোচন মঞ্চে তিনটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন। তথ্যমন্ত্রীর নিজের লেখা 'বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিষবৃক্ষ' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, সাংবাদিক শেখ জামিল ইউ আহমেদ রচিত 'ঞযব ধু ড়ভ ঔড়ঁৎহধষরংস' এবং সচিত্র বাংলাদেশ-এর সম্পাদক আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন রচিত 'গণমাধ্যম সহায়ক আইন, নীতি ও বিধি' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু। মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব আফিয়া খাতুন, গৌরব প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী স.ম. ইফতেখার মাহমুদ, কবি সাঈদ তপু এবং গ্রন্থসমূহের রচয়িতাগণসহ কবি-সাহিত্যিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদনঃ মো. জামাল উদ্দিন

২৫শে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু অমর একুশে গ্রন্থমেলার মোড়ক উন্মোচন মঞ্চে ৩টি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন

মাগুরার বধ্যভূমি ও গণকবর

পাকা ব্রিজ বধ্যভূমি

মাগুরার বধ্যভূমিগুলোর মধ্যে ঢাকা-মাগুরা সড়কের (ঢাকা রোড স্লুইজ গেট) পাকা ব্রিজটি ছিল অন্যতম। এই ব্রিজেই হত্যা করা হয়েছে অসংখ্য বাঙালিকে। পাকহানাদাররা বিভিন্ন গ্রাম থেকে যুবকদের ধরে এনে তাঁদের গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিত। তারপর গুলি করে উপর থেকে ছেড়ে দিত। স্বাধীনতার পর এই ব্রিজের আশপাশে ছড়িয়ে ছিল অসংখ্য নরকঙ্কাল।

শালিখার হাজরাহাটি গ্রামের চিত্রা নদীর পাড়ে গণকবর

পারনান্দুয়ালী ক্যানেল

শহরতলীর পারনান্দুয়ালী ক্যানেল এলাকা বর্তমান পল্লি বিদ্যুৎ অফিসের অদূরে। এটি ছিল ৭১ সালের সংঘটিত হত্যাযজ্ঞের মূল স্থান। এখানে মাগুরা শহরের মুক্তিকামী সাধারণ মানুষ ও অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধাকে ধরে নিয়ে হত্যা করা হয়।

পিটিআই বধ্যভূমি

মাগুরা শহরের সাতদোহা নবগঙ্গা নদীর ঘাট ও পিটিআই স্কুলের বর্তমান ছাত্রীবাসের অদূরে রয়েছে বধ্যভূমি। যুদ্ধকালীন সময়ে এখানে অনেককে হত্যা করা হয়। প্রতিদিন তাদের হাতে মারা যেত দশ থেকে বারো জন লোক। পিটিআই স্কুল ছিল জেলার পাকহানাদারদের সবচেয়ে বড়ো ঘাঁটি।

কাঠের পুল বধ্যভূমি

মাগুরা শহরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নবগঙ্গা নদীর একটি শাখা নদী হলো কালিগাঙ। এই কালিগাঙ নদীর ওপর নির্মিত (সাবেক স্পাহানি পাট গোডাউন বর্তমান ভূমি অফিসের অদূরে) কাঠের পুল সংলগ্ন এলাকা ছিল পাকবাহিনীর বধ্যভূমি। যুদ্ধকালীন এখানে বহু মানুষকে হত্যা করা হয়।

মুক্তিযোদ্ধারা রাষ্ট্রীয় খরচে হাওয়া বদলের সুযোগ পাবে

যুদ্ধাহত পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধারা রাষ্ট্রীয় খরচে বছরে একবার দেশের অভ্যন্তরে হাওয়া বদলের সুযোগ পাবেন। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক সংসদে সম্প্রতি এ তথ্য জানান। মুক্তিযোদ্ধাদের দেওয়া বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা তুলে ধরে মন্ত্রী আরো জানান, সম্পূর্ণ পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বছরে একবার কক্সবাজারে আবহাওয়া পরিবর্তন বা ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মন্ত্রীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মাসিক ভাতা ছাড়াও মুক্তিযোদ্ধারা যেসব সুবিধা পাচ্ছেন তাহলো– আবাসন সুবিধা, রেশন সুবিধা, শিক্ষা ভাতা, কন্যাদের জন্য বিবাহ ভাতা এককালীন ১৯ হাজার ২০০ টাকা, উৎসব ভাতা, স্বাধীনতা ও বিজয় দিবসে প্রীতিভোজ, ২০ শতাংশ পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধারা দেশ-বিদেশে বিনা খরচে চিকিৎসা সেবা, মুক্তিযোদ্ধারা মারা গেলে 'গার্ড অব অনার'সহ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন অথবা সৎকার করার ব্যবস্থা ইত্যাদি। এছাড়া যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন, সিটি করপোরেশন এলাকায় ১ হাজার ৫০০ বর্গফুটের বাড়ির হোল্ডিং ট্যাক্স ও পানির বিল মওকুফ, যুদ্ধাহত পরিবারের দুই বার্নারের একটি গ্যাসের চুলার গ্যাস বিল মওকুফ, হুইল চেয়ারে চলাচলকারী যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের মোবাইল বিল মওকুফ করা হবে। ইতোমধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের পরিচয়পত্র দেওয়া হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

দিনান্ত ক্লাব বধ্যভূমি ও নোমানী ময়দান আনসার ক্যাম্প

মাগুরা শহরের নোমানী ময়দান সংলগ্ন দিনান্ত ক্লাব এলাকা ছিল পাকবাহিনীর অন্যতম বধ্যভূমি। মাগুরার দূরদূরান্তের বিভিন্ন গ্রাম থেকে নিরীহ মানুষদের ধরে এনে হত্যা করে এখানে পুঁতে রাখা হয়। আর নোমানী ময়দান আনসার ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিকামী বাঙালিদের ধরে এনে অত্যাচার-নির্যাতন করা হতো।

শালিখার হাজরাহাটি

শালিখার হাজরাহাটি গ্রামে চিত্রা নদীর পাড়ে ৮ ব্যক্তির গণকবর রয়েছে। এরা সকলে ৭ই ডিসেম্বর ভারত থেকে দেশের বাড়ি ফেরার পথে রাজাকারদের হাতে ধরা পড়েছিলেন।

শালিখার আড়পাড়া ডাকবাংলো ঘাট ও শালিখা পুরাতন থানা ভবন

শালিখা উপজেলার আড়পাড়া বাজার সংলগ্ন ডাকবাংলোতে সাধারণ মানুষ ও মুক্তিযোদ্ধাদের নির্যাতনের পর ফটকি নদীর ঘাটে তাদের হত্যা করা হতো। শালিখা পুরাতন থানা ভবনে রাজাকাররা ক্যাম্প স্থাপন করে। পরে থানা সংলগ্ন চিত্রা নদীতে অসংখ্য মানুষকে হত্যা করা হয়।

ছয়ঘরিয়ার গণকবর

শালিখা উপজেলার ছয়ঘরিয়াতে ২টি গণকবরে ৬ জন শায়িত আছেন। এরা ৯ই ডিসেম্বর ভারত থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। এরা রাজাকারদের হাতে ধরা পড়ে শহিদ হন।

তালখড়ি গণকবর

নভেম্বর মাসের দিকে ভারত থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজ এলাকা ফরিদপুর যাওয়ার পথে তালখড়িতে রেঞ্জার পুলিশ ও রাজাকারদের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে ৭ জন মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হন। এখানে ওই ৭ মুক্তিযোদ্ধার গণকবর রয়েছে।

প্রতিবেদন: লিটন ঘোষ জয়

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১লা ফেব্রুয়ারি ২০১৮ বাংলা একাডেমি চত্বরে অমর একুশে গ্রন্থমেলা ও আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন–পিআইডি

জাতীয় ঘটনার প্রতিবেদন

অমর একুশে গ্রন্থমেলা উদ্‌বোধন

১লা ফেব্রুয়ারি: বাংলা একাডেমিতে মাসব্যাপী অমর একুশে গ্রন্থমেলা উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

ড় জাতীয় কবিতা উৎসব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে দু'দিনব্যাপী 'জাতীয় কবিতা উৎসবে'র উদ্‌বোধন করেন কবি আসাদ চৌধুরী। এবারের উৎসবের প্রতিপাদ্য ছিল– 'দেশহারা মানুষের সংগ্রামে কবিতা'।

ড় এসএসসি পরীক্ষা

২০১৮ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হয়। অভিন্ন প্রশ্নপত্রে এবার পরীক্ষায় ২০ লাখ ৩১ হাজার ৮৯৯ পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।

জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০১৮

২রা ফেব্রুয়ারি: বর্ণাঢ্য আয়োজনে রাজধানীসহ সারাদেশে উদ্‌যাপিত হয় 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০১৮'। 'নিরাপদ খাদ্যে ভরবো দেশ–গড়বো সোনার বাংলাদেশ' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে দেশে প্রথমবারের মতো দিবসটি পালন করা হয়।

শপথ নিলেন প্রধান বিচারপতি

৩রা ফেব্রুয়ারি: সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন দেশে ২২তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নেন।

বিশ্ব ক্যানসার দিবস পালিত

৪ঠা ফেব্রুয়ারি: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও সরকারি-বেসরকারিভাবে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব ক্যানসার দিবস।' দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'আমি পারি, আমরা পারি'

ওআইসি পর্যটন মন্ত্রীদের সম্মেলন উদ্‌বোধন

৬ই ফেব্রুয়ারি: প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে ওআইসি'র পর্যটন মন্ত্রীদের দশম ইসলামিক সম্মেলনের উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

শেখ হাসিনা সেনানিবাস উদ্‌বোধন

৮ই ফেব্রুয়ারি: পটুয়াখালীর লেবুখালিতে পায়রা নদীর তীরে নবনির্মিত 'শেখ হাসিনা সেনানিবাস' উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল দিবস

১৪ই ফেব্রুয়ারি: যথাযোগ্য মর্যাদায় নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল দিবস'।

ড় সুন্দরবন দিবস

নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'সুন্দরবন দিবস'।

ড় বিশ্ব ভালোবাসা দিবস

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও পালিত হয় 'বিশ্ব ভালোবাসা দিবস'।

বিশ্ব শিশু ক্যানসার দিবস

১৫ই ফেব্রুয়ারি: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব শিশু ক্যানসার দিবস'। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'সেবার ধরন বদলে দিব, নতুন আশার দীপ জ্বালাব'।

একুশে পদক

২০শে ফেব্রুয়ারি: ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে রাষ্ট্রের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সম্মাননা একুশে পদক ২১ জন বরেণ্য ব্যক্তিকে বিতরণ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত

২১শে ফেব্রুয়ারি: ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয় 'মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'। অমর একুশের প্রথম প্রহরে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বিশ্ব স্কাউট দিবস

২২শে ফেব্রুয়ারি: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব স্কাউট দিবস'।

প্রতিবেদন: আখতার শাহীমা হক

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

নোবেলজয়ী তিন নারীর বাংলাদেশ সফর

শান্তিতে নোবেলজয়ী তিন নারী– ইরানের শিরিন এবাদি, ইয়েমেনের তাওয়াক্কুল কারমান এবং যুক্তরাজ্যের মেইরিড ম্যাগুয়ার ২৪শে ফেব্রুয়ারি ৮ দিনের সফরে ঢাকায় আসেন। নারী পক্ষের আমন্ত্রণে তারা ঢাকায় আসেন। মূলত মিয়ানমারে নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচতে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের দেখতে তাদের এই ঢাকা সফর। নোবেল ওমেন্স ইনিশিয়েটিভের এই তিন সদস্য শান্তি, নায্যতা ও সমতার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন।

পৃথিবীর মানুষ বিভিন্ন গণমাধ্যমে রোহিঙ্গা নির্যাতনের যে চিত্র দেখেছে, বাস্তবে এই নির্যাতনের মাত্রা আরো কয়েকগুণ ভয়াবহ। রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন শেষে ২৮শে ফেব্রুয়ারি নোবেল বিজয়ী তিন নারী সংবাদ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে ২৮শে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ গণভবনে নোবেল বিজয়ী নারী প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন–পিআইডি

সম্মেলনে এই মন্তব্য করেন। তারা বলেন, এটা সুস্পষ্ট গণহত্যা। একুশ শতকের পৃথিবী এই হত্যাকাণ্ড দেখে লজ্জিত। এজন্য অং সান সুচিকে অবশ্যই বিচারের সম্মুখীন হতে হবে।

এদিন সোনারগাঁও হোটেল 'নারীপক্ষ' আয়োজিত নোবেল বিজয়ী তিন নারীর রোহিঙ্গা আশ্রয় শিবির পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা নিয়ে সংবাদ সম্মেলন এবং কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ-এর সভাকক্ষে তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নিয়ে 'জীবনী ও সংগ্রামের পথে' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানে তাঁরা বক্তব্য রাখেন।

জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপিত হয়।

মিশনের অডিটোরিয়ামে ২০ থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারির প্রথম প্রহর পর্যন্ত অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন এতে স্বাগত বক্তব্য দেন। এরপর বঙ্গবন্ধু অডিটোরিয়ামে স্থাপিত অস্থায়ী শহিদমিনারের সামনে দাঁড়িয়ে ভাষা শহিদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অতঃপর রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করে শোনানো হয়। এছাড়া জাপানের টোকিও বাংলাদেশ দূতাবাস ও মুম্বাইয়ে বাংলাদেশ উপহাইকমিশনসহ বিভিন্ন দেশে যথাযথ ভাবগাম্ভীর্য ও মর্যাদায় এ দিবসটি পালিত হয়েছে।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

মৎস্য আহরণে বাংলাদেশ বিশ্বে চতুর্থ

মাছে-ভাতে বাঙালি আমরা। আমাদের এই ঐতিহ্য আমরা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি। গোলা ভরা ধান, পুকুর ভরা মাছের বাংলাদেশ এখন মাছ-মাংসে স্বয়ংসম্পূর্ণ। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ২০১৬ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ জলাশয় থেকে মৎস্য আহরণে বিশ্বে চতুর্থ এবং মাছ চাষে পঞ্চম। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মাছ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪০ লাখ ৫৩ হাজার টন। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪১ লাখ ৩৪ হাজার টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৮৪ হাজার টন বেশি। আমাদের দেশে দৈনিক মাথাপিছু মাছ গ্রহণের চাহিদা ৬০ গ্রাম। উৎপাদন অনুযায়ী, বর্তমানে প্রতিদিন জনপ্রতি মাছ গ্রহণের পরিমাণ ৬২.৫৮ গ্রাম। দেশি মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি চাষের মাছেও নীরব বিপ্লব সাধিত হয়েছে।

খাদ্য মজুতে রেকর্ড

সরকারের খাদ্য মজুত এখন রেকর্ড পর্যায়ে। বর্তমানে খাদ্য মজুত ১৩ লাখ মেট্রিক টন। এর আগে সর্বোচ্চ মজুত ছিল ২০১৫ সালের অক্টোবরে ১৬ লাখ ৪১ হাজার মেট্রিক টন। বর্তমান মজুতের মধ্যে চাল ১০ লাখ মেট্রিক টন বাকি সাড়ে তিন লাখ মেট্রিক টন গম। নীতিমালা অনুযায়ী সরকারের মজুত ৮ লাখ মেট্রিক টন থাকতে হবে, এই পরিমাণ খাদ্য মজুত থাকলে তা সন্তোষজনক বলে ধরা হয়।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

জেন্ডার ও নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

মাতৃত্বকালীন ভাতা ডিজিটালাইজড হচ্ছে

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চলমান মাতৃত্বকালীন ভাতা বিতরণ কর্মসূচি ডিজিটালাইজড করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ১৪ই ফেব্রুয়ারি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক যৌথ সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি উপস্থিত ছিলেন।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, একটি প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের সাত উপজেলায় পরীক্ষামূলকভাবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে মাতৃত্বকালীন ভাতা বিতরণ করা হবে।

ন্যাশনাল হেলপ ডেস্ক ৯৯৯

নারীদের সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে চালু হয়েছে ন্যাশনাল হেলপ ডেস্ক ৯৯৯। এটিতে নির্যাতনের শিকার নারী বা নির্যাতনকারীকে সহায়তা করতে অন্য যে কেউ ফোন করে সহায়তা চাইতে পারেন। ফোনে পর্যাপ্ত পরিমাণ ব্যালেন্স না থাকলেও কল করা যাবে। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যাবে পুলিশ। ৯৯৯– ধর্ষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে পুলিশের একটি নতুন উদ্যোগ। ফায়ার সার্ভিস ও অ্যাম্বুলেন্স সেবাও দেবে এই ৯৯৯ নম্বরটি।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী প্রথম নারীর পিএইচডি লাভ

বাংলাদেশে যে ৫০টির বেশি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী রয়েছে তাদের মধ্যে প্রথম নারী হিসেবে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন রাঙামাটির মেয়ে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫শে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তাঁর কার্যালয়ে ২০১৫ ও ২০১৬ সালের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সাথে ফটোসেশনে অংশ নেন–পিআইডি

রূপানন্দা রায়। 'বাংলাদেশের প্রবাসী শ্রমিক সংক্রান্ত নীতিমালার মূল্যায়ন'– এ বিষয় নিয়ে গবেষণা করে অস্ট্রেলিয়ার ইউনিভার্সিটি অব অ্যাডিলেড থেকে রূপানন্দা এ ডিগ্রি অর্জন করেন।

বাংলা চ্যানেল পাড়ি দিলেন প্রথম ব্রিটিশ নাগরিক

ঢাকার ব্রজেন দাসের ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেওয়ার ছয় দশক পর বাংলা চ্যানেল পাড়ি দিলেন প্রথম কোনো ব্রিটিশ নাগরিক। নাম বেকি হর্সব্রো। ২৮শে জানুয়ারি সকালে টেকনাফ থেকে ৯টা ২০ মিনিটে সাঁতার শুরু করে তিনি একটানা ১৬.১ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে সেন্টমার্টিনে পৌঁছাতে সময় নিয়েছেন ৪ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট। পেশায় সাংবাদিক হলেও শখের এই ব্রিটিশ নারী সাঁতারু বাংলাদেশে পানিতে ডুবে শিশুমৃত্যু রোধে সচেতনতা তৈরির জন্য এ বাংলা চ্যানেল পাড়ি দিয়েছেন।

প্রতিবেদন : জান্নাতে রোজী

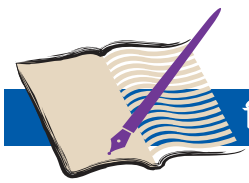

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

শিক্ষা খাতে উচ্চতর গবেষণায় বরাদ্দ বাড়ানোর আশ্বাস

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ১২ই ফেব্রুয়ারি নায়েম অডিটোরিয়ামে শিক্ষা খাতে উচ্চতর গবেষণা সহায়তা কর্মসূচি বিষয়ক কর্মশালা ও চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, উচ্চতর গবেষণায় সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। ফলপ্রসূ গবেষণার ফলে কৃষিসহ নানা ক্ষেত্রে উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে এবং গবেষণার মাধ্যমেই বিদ্যমান সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। এলক্ষ্যে তিনি উচ্চতর গবেষণায় বরাদ্দ আরো বাড়ানোর আশ্বাস দেন এবং বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন আদর্শ মানুষ তৈরির আহ্বান

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ১৪ই ফেব্রুয়ারি বসুন্ধরা কনভেনশন সিটিতে বাংলাদেশ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি করা বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। তিনি শিক্ষার্থীদের নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ আদর্শ মানুষ হিসেবে তৈরি করার এবং বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত ও তথ্য বিপ্লবের সুযোগ গ্রহণ করে নিজেদেরকে যুগোপযোগী মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। পরে তিনি শিক্ষার্থীদের মাঝে সনদ ও পদক বিতরণ করেন।

যুগোপযোগী মানসম্পন্ন শিক্ষার বিকল্প নেই

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫শে ফেব্রুয়ারি তাঁর কার্যালয়ের শাপলা হলে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রদত্ত 'প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক ২০১৫ ও ২০১৬' প্রদান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং বলেন, বিশ্বায়নের এই যুগে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে মানসম্পন্ন ও সময়োপযোগী উচ্চশিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। মানসম্পন্ন শিক্ষা এবং গবেষণার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা এবং উদ্ভাবনী শক্তিই পারে সকল প্রতিকূলতা এবং প্রতিবন্ধকতাকে কাটিয়ে সভ্যতাকে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে। পরে প্রধানমন্ত্রী সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ব স্ব অনুষদে সর্বোচ্চ নম্বর বা সিজিপিএ অর্জনের স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৫ ও ২০১৬ সালের শিক্ষার্থীদের মাঝে পদক প্রদান করেন।

প্রতিবেদন: মো. সেলিম

প্রতিবন্ধী : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য অর্থ বরাদ্দের সিদ্ধান্ত

প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য পৃথক অর্থ বরাদ্দ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সরকার। এ অর্থ বরাদ্দ করা হবে প্রস্তাবিত ৪র্থ প্রাথমিক উন্নয়ন কর্মসূচির (পিইডিপি) আওতায়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান সোসাইটি অব দি ডেভ এন সাইন ল্যাংগুয়েজ ইউজার্স (এসডিএসএল)-এর উদ্যোগে আয়োজিত 'একীভূত শিক্ষা: প্রতিবন্ধী শিশুর অধিকার' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় এ তথ্য প্রকাশ করেন।

প্রতিবন্ধিতা সার্বজনীন বিষয়

অটিজম ও নিউরো ডেভেলপমেন্ট ডিস-অর্ডার এবং জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান এবং ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের মেন্টাল হেলথ প্যানেল বিশেষজ্ঞ সায়মা ওয়াজেদ বলেছেন, প্রতিবন্ধিতা একটি সার্বজনীন সমস্যা, যা সবারই ভালোভাবে বুঝতে হবে। বিষয়টি নিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে এমন মনোভাব নিয়ে যে, আমাদের পরিবারে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি রয়েছে। তিনি অটিজম চিকিৎসা সংক্রান্ত দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে ইউনিসেফ

বাংলাদেশ চাইল্ড প্রোটেকশন ইউনিট প্রধান জেনা লিবি বলেন, আমরা বিশ্বাস করি এ প্রকল্প প্রতিবন্ধী শিশুদের এবং পরিবারের সদস্যদের প্রতি চ্যালেঞ্জ রাখবে।

প্রতিবেদন: হাছিনা আক্তার

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

১৮৪৭ জনের জন্য একজন চিকিৎসক

দেশের প্রতি ১ হাজার ৮৪৭ জন মানুষের জন্য একজন রেজিস্টার্ড চিকিৎসক রয়েছেন। ১৯শে ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর পর্বে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম এ তথ্য জানান।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরো জানান, দেশে মোট জনসংখ্যা ১৫ কোটি ৮১ লাখ। বর্তমানে ২৪ হাজার ২৮টি পদের বিপরীতে ২২ হাজার ৩৭৪ জন চিকিৎসক কর্মরত রয়েছেন।

সরকারি কর্মকর্তাদের স্বাস্থ্যবিমার আওতায় আনা হবে

সরকারি কর্মকর্তাদের স্বাস্থ্যবিমার আওতায় আনার বিষয়টি সরকার অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে। ১৮ই ফেব্রুয়ারি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে 'সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য স্বাস্থ্যবিমা প্রণয়ন' শীর্ষক সেমিনারে এ কথা জানানো হয়।

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ইসমাত আরা সাদেক বলেন, আমাদের প্রতিবেশী দেশসমূহসহ উন্নত বিশ্বে সরকারি কর্মকর্তারা বিমা সেবার আওতায় থাকেন। উন্নত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সরকারি কর্মকর্তাদের বিমায় অংশগ্রহণ করা উচিত।

প্রতিবেদন: মো. আশরাফ উদ্দিন

ডিজিটাল বাংলাদেশ

ফোর-জি চালু হলো বাংলাদেশে

চতুর্থ প্রজন্মের মোবাইল কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক ফোর-জি চালু হয়েছে বাংলাদেশে। ১৯শে ফেব্রুয়ারি রাত ৮টায় দেশে ফোর-জি সেবা প্রথমবারের মতো বাণিজ্যিকভিত্তিতে চালু করেছে মোবাইল অপারেটর কোম্পানি গ্রামীণ ফোন, রবি ও বাংলালিংক।

ফোর-জি নেটওয়ার্কে অত্যন্ত দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবা পাওয়া যায় বলে এতে এইচডি ভিডিও স্ট্রিম, অনলাইন টিভি, দ্রুততম ফাইল ডাউনলোড/আপলোড এবং ব্রাউজিং করা যায়।

তথ্যপ্রযুক্তিসহ চার খাতে নগদ সহায়তা দেওয়া হচ্ছে

তথ্যপ্রযুক্তিসহ চার খাতে নতুন করে নগদ সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তির পাশাপাশি পাদুকা, নারিকেলের ছোবড়া, ব্যাটারি রপ্তানির বিপরীতে এখন থেকে নগদ সহায়তা দেওয়া হবে। ৮ই ফেব্রুয়ারি পৃথক চারটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে ব্যাংকগুলোর প্রধান নির্বাহীদের কাছে পাঠানো হয়েছে।

তথ্যপ্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার

২০১৭ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর বাংলা ভাষার ওয়েবসাইট গুগল অ্যাডসেন্স চালু করে বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো সার্চ ইঞ্জিন গুগল। গুগল বলছে, বাংলাদেশ, ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলা ভাষার ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব কিছু বিবেচনা করে বাংলায় গুগল অ্যাডসেন্স চালু করা হয়েছে।

কম্পিউটার নির্ভর তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশের ফলে অভিধানের ডিজিটাল রূপও তৈরি হয়ে গিয়েছে। এপিকে ব্যবহার করে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের কাছেও আলো হয়ে ধরা দিচ্ছে সদ্য প্রকাশিত অভিগম্য অভিধান। ১লা ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই ডিজিটাল অভিধানটি উদ্‌বোধন করেছেন।

মানবাধিকার কমিশন হটলাইন সেবা চালু করছে

কোথাও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলে তার তথ্য জানাতে একটি হটলাইন নম্বর চালু করতে যাচ্ছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। মার্চে ১৬১০৮ নম্বরের হটলাইন সেবা কার্যক্রম শুরু হবে। বিনামূল্যে কল দিয়ে এ নম্বরে তথ্য জানানো যাবে। ১৮ই ফেব্রুয়ারি রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবে 'মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান এ কথা জানান।

জানা যায়, আপাতত অফিস সময়ে হটলাইন নম্বরটি চালু থাকবে। এখানে অভিযোগগুলো রেকর্ড করে রাখা হবে। পরে অভিযোগ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

আউশ চাষে ৪০ কোটি টাকার প্রণোদনা

বোরো ধান কাটার সঙ্গে সঙ্গে কৃষকরা যেন আউশ চাষ করতে পারে সেজন্য দেশের ২ লাখ ৩৭ হাজার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে বিনামূল্যে ৪০ কোটি টাকার বীজ ও রাসায়নিক সার দেবে সরকার। ৮ই ফেব্রুয়ারি সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে খরিফ মৌসুমের জন্য আউশের প্রণোদনা কর্মসূচি ঘোষণা করেন কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী।

কৃষিমন্ত্রী জানান, দেশের ৬৪ জেলার কৃষকদের উফশি আউশের জন্য ৩২ কোটি ৩৩ লাখ ৫৩ হাজার ১৭০ টাকার এবং ৪০ জেলার কৃষকদের নেরিকা আউশ আবাদে ৭ কোটি ২৯ লাখ ৩০ হাজার ৭৫ টাকার বীজ ও সার বিতরণ করা হবে।

স্থানীয় সরকার, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন ১০ই ফেব্রুয়ারি ২০১৮ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ অডিটোরিয়ামে 'জাতীয় কৃষি যন্ত্রপাতি মেলা ২০১৮' উদ্‌বোধন করেন। কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এসময় উপস্থিত ছিলেন–পিআইডি

বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে চা গবেষণা সমঝোতা চুক্তি

বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউটের সঙ্গে চাইনিজ একাডেমি অব এগ্রিকালচারাল সায়েন্সের মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চীনের মতো বাংলাদেশেও চা থেকে চকলেট, বিভিন্ন পানীয়, কেক, বিস্কুট ইত্যাদি প্রস্তুত করার লক্ষ্যে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ৬ই ফেব্রুয়ারি সচিবালয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

প্রথমবারের মতো আয়োজিত হলো কৃষি যন্ত্রপাতি মেলা

রাজধানীর ফার্মগেটে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি) চত্বরে ১০ই ফেব্রুয়ারি শুরু হয় 'জাতীয় কৃষি যন্ত্রপাতি মেলা ২০১৮'। প্রথমবারের মতো আয়োজিত এ মেলার উদ্‌বোধন করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন। মেলায় সরকারি-বেসরকারি ২১টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির সাথে সকলকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং বিজ্ঞানসম্মত যন্ত্রপাতি ক্রয় ও ব্যবহারে উৎসাহিত করার নিমিত্তে আয়োজন করা হয় এই মেলার।

কেআইবি অ্যাওয়ার্ড প্রদান

রাজধানীর ফার্মগেট কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি) অডিটোরিয়ামে ১৪ই ফেব্রুয়ারি কৃষি পদক প্রদান করা হয়। কৃষিতে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ৪ ব্যক্তি ও ১টি ইনস্টিটিউশনকে কেআইবি অ্যাওয়ার্ড ২০১৮ এবং ৫ ব্যক্তি ও ১টি ইনস্টিটিউশনকে কেআইবি অ্যাওয়ার্ড ২০১৭ প্রদান করা হয়। রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বিজয়ীদের এ পদক প্রদান করেন।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

বিবিআইএন বাস্তবায়নের পথে

বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত ও নেপালের মধ্যে অবাধ গাড়ি চলাচলের যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা বিবিআইএন নামে পরিচিত। ২০১৫ সালে এই চার দেশের মধ্যে বিবিআইএন মোটর ভেহিক্যালস এগ্রিমেন্ট (এমভিএ) বা মোটরযান চলাচল চুক্তি হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ, ভারত ও নেপালের মধ্যে গাড়ি চলাচলের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। চলতি ২০১৮ সালের জুনের আগেই এই তিন দেশের মধ্যে মোটরযান চলাচল শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পরে সুবিধাজনক সময়ে ভুটান বিবিআইএন মোটর ভেহিক্যালস এগ্রিমেন্ট (এমভিএ) অনুমোদন করে এতে যোগ দেবে। সড়ক যোগাযোগ ও সেতু মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

এ চুক্তির মাধ্যমে ঢাকা থেকে পণ্যবাহী ও যাত্রীবাহী গাড়ি যেমন ভারত যাবে আবার ভারত হয়ে নেপালও যেতে পারবে। চুক্তির পরপরই এই পর্যন্ত দুটি পরীক্ষামূলক চালান গেছে। ২০১৫ সালের নভেম্বর মাসে পরীক্ষামূলক চালান হিসেবে কলকাতা থেকে ঢাকা হয়ে ত্রিপুরার আগরতলায় গেছে ডিএইচএল এক্সপ্রেসের একটি চালান। কয়েক মাস পরে তৈরি পোশাকবাহী দুটি ট্রাক ঢাকা থেকে কলকাতা হয়ে দিল্লি গেছে।

সড়ক যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানানো হয়েছে, বিবিআইএনকে সামনে রেখে ভারত খুলনা ও সিলেটে নতুন দুটি উপদূতাবাস খুলেছে। বাংলাদেশ ও গুয়াহাটিতে খুলেছে তাদের নতুন উপদূতাবাস। এছাড়া বাংলাদেশ বাংলাবান্ধাসহ সংশ্লিষ্ট স্থলবন্দর ও আশুগঞ্জ নৌবন্দর এবং আখাউড়া স্থলবন্দর আধুনিকায়ন করেছে।

প্রতিবেদন: জাহিদ হোসেন নিপু

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

জাহাজ থেকে নিঃসরিত কার্বন ডাই-অক্সাইড নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ

সকল কাজের উর্ধ্বে এখন হচ্ছে পরিবেশ রক্ষা, সকল কাজের আগে বিবেচনায় আনা হচ্ছে কীভাবে পরিবেশের সৌন্দর্যবর্ধন ও এর ভারসাম্য রক্ষা করা হবে। তাইতো দেশে পরিবেশবান্ধব জাহাজ নির্মাণের পাশাপাশি পরিবেশ দূষণ রোধে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে বলে জানিয়েছেন নৌপরিবহণ মন্ত্রী শাজাহান খান। ২৫শে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ নৌপরিবহণ কর্তৃপক্ষের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত 'শিপ ইমিশন কন্ট্রোল আন্ডার মার্পোল' শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি একথা জানান।

নৌপরিবহণ মন্ত্রী শাজাহান খান ২৫শে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে নদীর নাব্যতা সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। পরিবেশ ও বনমন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, ভূমিমন্ত্রী শামসুর রহমান শরীফ এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ এসময় উপস্থিত ছিলেন–পিআইডি

সুন্দরবনের সৌন্দর্য বেড়েছে

পরিবেশ ও বন উপমন্ত্রী আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব বলেছেন, সুন্দরবনের সৌন্দর্য আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি সুন্দরবনের চলমান বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শনকালে কর্মকর্তাদের সম্প্রতি এক মতবিনিময় সভায় এ কথা বলেন। তিনি বলেন, সুন্দরবন এলাকায় বঙ্গবন্ধু চর ও পুটনীর চর নামে আরো দুটি চরে প্রাকৃতিকভাবে ম্যানগ্রোভ বন সৃষ্টি হওয়ায় সুন্দরবনের পরিধি আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। সারাবিশ্বে সর্বপ্রথম সুন্দরবনে স্মার্ট পেট্রোলিং পদ্ধতিতে বন ও বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন এবং বন্যপ্রাণী পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। উদ্ভাবিত এ পদ্ধতি অন্যান্য দেশে মডেল হিসেবে অনুকরণ করা হচ্ছে।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ২৮৮টি ফ্ল্যাট নির্মাণ

রাজধানী ঢাকায় সরকারি কর্মকর্তাদের আবাসন সমস্যা দূরীকরণে ফ্ল্যাট নির্মাণ করছে সরকার। মিরপুর ৬ নং সেকশনে ২৮৮টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হচ্ছে। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় ৪ঠা ফেব্রুয়ারি এ প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়।

সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ফ্ল্যাট নির্মাণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিকল্পনা মন্ত্রী বলেন, সরকারি কর্মকর্তাদের আবাসন সুবিধা দেওয়া, উপযুক্ত, মানসম্পন্ন ও স্বাস্থ্যকর বাসস্থান নিশ্চিতসহ তাদের কাজের মান বৃদ্ধি এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

প্রতিবেদন: সানজিদা আহমেদ

নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

দেশীয় অর্থে ঢাকা-সিলেট চার লেন

দেশীয় অর্থায়নে ২১৪ দশমিক ৪৪ কিলোমিটার ঢাকা-সিলেট চার লেন নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। চার লেন সড়ক নির্মাণে সরকারি তহবিল থেকে ১১ হাজার ৪১২ কোটি টাকা ব্যয় হবে। নতুন করে এ প্রকল্পের নামকরণ করা হয়েছে 'ঢাকা (কাঁচপুর) সিলেট মহাসড়ক উভয় পার্শ্বে পৃথক সার্ভিস লেনসহ চার লেনে উন্নীতকরণ'। এপ্রিল ২০১৮ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ মেয়াদে প্রকল্প সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছে সরকার। মূল সড়কের উভয় পাশে ধীরগতির যান চলাচলের জন্য পৃথক সার্ভিস লেন নির্মিত হবে। ছোটো-বড়ো ৭০টি ব্রিজসহ এতে থাকবে পাঁচটি রেলওয়ে ওভারপাস। শিল্প ও বাণিজ্যে গতিশীলতা আনতে এশিয়া হাইওয়ে নেটওয়ার্ক, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ৭ দেশের জোট 'বে অব বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টি সেক্টরাল টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক কো-অপারেশন (বিমসটেক)' করিডোর, দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক) করিডোরসহ আঞ্চলিক সড়ক নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে চার লেনটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

প্রতিবেদন: মো. সৈয়দ হোসেন

মাদক প্রতিরোধ : বিশেষ প্রতিবেদন

চলছে মাদকের বিরুদ্ধে সাঁড়াশি অভিযান

মাদক ব্যবসাকে রুখে দিতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী প্রতিনিয়ত চালাচ্ছে সাঁড়াশি অভিযান। সম্প্রতি পাবনা, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, যশোর, সিরাজগঞ্জ, হবিগঞ্জ, জয়পুরহাট, সিলেটের বিভিন্ন জায়গায় র‍্যাব-পুলিশ অভিযান চালায়। এতে আটক করা হয় মাদকপাচারকারীসহ প্রায় অর্ধশতাধিক। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় হেরোইন, ইয়াবাসহ বিভিন্ন মাদকদ্রব্য।

দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলো বিশেষ করে কক্সবাজার, চট্টগ্রাম দিয়ে মাদক দেশে প্রবেশ করে। তাই সীমান্তবর্তী এলাকায় জোরদার করা হয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রহরা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শুধু আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দ্বারা মাদকের সম্পূর্ণ মূলোৎপাটন করা সম্ভব নয়। রাজধানীর ছিনতাইকারীদের একটা বিরাট অংশই মাদকাসক্ত। মাদকের কারণে সমাজে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় দেখা দেয়, বাড়ে চুরি, ছিনতাই, খুনসহ নানা ধরনের অপরাধ। এজন্য সোচ্চার হতে হবে ব্যক্তি, পরিবার তথা সকল শ্রেণির মানুষকে। মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে সচেতন হতে হবে আমাদের সবাইকে। তরুণ সমাজকে রক্ষার স্বার্থে, সর্বোপরি সমাজ ও দেশের স্বার্থে সবার মাদককে 'না' বলতে হবে।

প্রতিবেদন: এনায়েত হোসেন

শিশু ও কিশোর উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও ভাতা পাবে ১৫-১৮ বছরের দরিদ্র মেয়েরা

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি বলেছেন, সরকার বাল্যবিবাহের সংখ্যা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে আইন প্রণয়নসহ নানাবিধ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে সরকার। দারিদ্র্যতা, নিরাপত্তাহীনতা ও সামাজিক সচেতনতার অভাবে বাল্যবিবাহ সংঘটিত হয়। প্রতিমন্ত্রী বলেন, দরিদ্র পরিবারে ১৫-১৮ বছরের মেয়েদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং ভাতা প্রদান কার্যক্রম হাতে নিয়েছে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। এর লক্ষ্য, তাদেরকে অর্থনৈতিক সহযোগিতা করা এবং আয়বর্ধক ব্যবসায় উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা।

রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে ২৫শে ফেব্রুয়ারি সরকার এবং ইউনিসেফের যৌথ আয়োজনে 'অ্যা স্কোপিং অ্যানালিসিস অব বাজেট অ্যালোকেশন ফর চাইল্ড মেরিজ ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক গবেষণা ফলাফলের মোড়ক উন্মোচনকালে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন।

সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মো. মসিউর রহমান রাঙ্গা বলেন, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের জন্য মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি ও আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে সরকারের পাশাপাশি সামাজিক-সেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর সুপরিকল্পিত ভূমিকা অপরিহার্য। দনিয়া সহজপাঠ স্কুল মাঠে ১৮ই ফেব্রুয়ারি 'প্রিয় বাংলাদেশ' কর্তৃক 'সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ-২০১৮' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

প্রতিবেদন: নাসিমা খাতুন

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন

একুশের গ্রন্থমেলা উপলক্ষে কয়েক বছর ধরেই ধারাবাহিকভাবে আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এবারের আয়োজনটি হয় মেলার ২২তম দিনে, শেষ হয় ২৩ তারিখে। একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় 'দক্ষিণ এশিয়ার কবিতা' শীর্ষক আলোচনা। মূল প্রবন্ধ পড়েন অধ্যাপক কায়সার হক। আলোচনায় অংশ নেন নেপালের লেখক অভি সুবেদি, বাংলাদেশের কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা, অধ্যাপক সোনিয়া নিশাত আমিন প্রমুখ।

পঁয়তাল্লিশে শিল্পকলা একাডেমি

দীর্ঘ ৪৪ বছরের পথ-পরিক্রমা শেষে পঁয়তাল্লিশে পা দিল শিল্পকলা একাডেমি। এ দিনগুলোকে ধরে রাখার জন্য ১৯শে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে নানা আয়োজনে ভরপুর ছিল। একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকি বেলুন উড়িয়ে অনুষ্ঠানটির উদ্‌বোধন করেন।

এই প্রতিষ্ঠানের স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

আলোকচিত্রে ভাষা সংগ্রাম ও বঙ্গবন্ধু

নতুন প্রজন্মকে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস জানাতে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে প্রদর্শিত হয় 'ভাষা সংগ্রাম ও বঙ্গবন্ধু' শিরোনামে আলোকচিত্র প্রদর্শনী। বাহান্ন'র গৌরবগাথা নিয়ে প্রথমবারের মতো এই প্রদর্শনীতে ৫৮টি আলোকচিত্র স্থান পায়। অমর একুশে গ্রন্থমেলাকে প্রাণবন্ত করতে সুচিন্তা ফাউন্ডেশন এই প্রদর্শনীর আয়োজন করে। ১৭ই ফেব্রুয়ারির নজরুল মঞ্চে প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন করেন ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। প্রদর্শনীতে

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি ২৫শে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ সিরডাপ মিলনায়তনে বাংলাদেশ সরকার এবং ইউনিসেফ-এর যৌথ আয়োজনে 'A Scoping Analysis of Budget Allocation for Ending Child Marriage in Bangladesh' শীর্ষক গবেষণা ফলাফলের মোড়ক উন্মোচন করেন–পিআইডি

ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর অবদান নিয়ে 'ভাষা সংগ্রাম ও বঙ্গবন্ধু নামে গবেষণাধর্মী' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

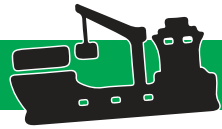

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

দেশের পাট পাতার চা রপ্তানি হচ্ছে জার্মানিতে

এবার বাংলাদেশের পাট পাতা থেকে তৈরি চা রপ্তানি হচ্ছে জার্মানিতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়তায় পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা পাট পাতা থেকে এ চা উদ্ভাবন করেছেন। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ফুল আসার আগেই পাট গাছ থেকে পাতা সংগ্রহ করতে হবে। পরে তা সূর্যের আলোয় শুকিয়ে গুঁড়া করতে হবে। এরপর মধু বা চিনি দিয়ে এই চা তৈরি করতে হয়। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট পাট পাতা থেকে এই অরগানিক চা বা পানীয় উৎপাদন শুরু করে। পরবর্তীতে ঢাকায় গুয়ার্ছি অ্যাকুয়া অ্যাগ্রো টেক নামের একটি প্রতিষ্ঠান পাটের পাতা দিয়ে তৈরি অরগানিক চা জার্মানিতে রপ্তানি শুরু করে। ৮-১০ টন পাট পাতার চা জার্মানিতে রপ্তানি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছে সরকার।

বাংলাদেশে তৈরি হোন্ডা ব্র্যান্ডের মোটর সাইকেল বাজারে আসছে

চলতি বছরের মধ্যেই বাজারে আসছে বাংলাদেশে তৈরি জাপানের বিশ্বখ্যাত হোন্ডা ব্র্যান্ডের মোটর সাইকেল। বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন এবং জাপানের হোন্ডা মটরস্ কোম্পানি লিমিটেডের যৌথ বিনিয়োগে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেড এ মোটর সাইকেল বাজারজাত করবে। ১৩ই ফেব্রুয়ারি শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমুর সঙ্গে বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেডের প্রতিনিধিদলের বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

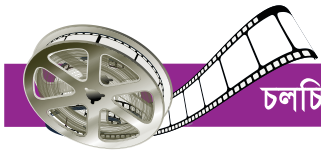

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

কলকাতায় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চলচ্চিত্র উৎসব

প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসকে সামনে রেখে 'কলকাতা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চলচ্চিত্র উৎসব' অনুষ্ঠিত হয় ২৩-২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এ উৎসব কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গান্ধী ভবন মিলনায়তনে আয়োজিত হয়। বিশ্বের ৮টি দেশ ও ভারতের ১০টি রাজ্যের ২৫টি ছবি ও তথ্যচিত্র এ উৎসবে প্রদর্শিত হয়। উৎসবের উদ্‌বোধনী ছবি ছিল নিউজিল্যান্ডের পরিচালক ফিলিপ নয়েসের i¨vweU cÖæd †dÝ। বাংলাদেশ থেকে দুটি ছবি প্রদর্শিত হয়। এগুলো হচ্ছে– †ivwn½v wiwdDwR Av d‡Uv Rvwb© Ab 136 I Rb¥mv_x।

টিএসসিতে আমার ভাষার চলচ্চিত্র উৎসব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চলচ্চিত্র সংসদ ১৭ বারের মতো আয়োজন করে 'আমার ভাষার চলচ্চিত্র উৎসব'। ১২-১৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি) চলে এ উৎসব। এতে ঢাকা-কলকাতার ধ্রুপদি ও সমসাময়িক মিলিয়ে ২০টি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। ১২ই ফেব্রুয়ারি বিকাল সাড়ে ৫টায় উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। ১৭ই ফেব্রুয়ারি সমাপন অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চলচ্চিত্র সংসদের পক্ষ থেকে ২০১৭ সালে নির্মিত শ্রেষ্ঠ বাংলা চলচ্চিত্রকে প্রদান করা হয় 'হীরালাল সেন পদক'।

অস্কার ২০১৮

যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলসে ৫ই মার্চ ডলবি থিয়েটারে বসেছিল অস্কার পুরস্কার হিসেবে খ্যাত একাডেমি অ্যাওয়ার্ডের ৯০তম আসর। অস্কারের এবারের আসরে সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেলেন গ্যারি ওল্ডম্যান। 'ডার্কেস্ট আওয়ার' ছবিতে অনবদ্য অভিনয়ের জন্য তিনি এ পুরস্কার জেতেন। সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার জিতেছেন ফ্রান্সিস ম্যাকডর্মান্ড থ্রি বিলবোর্ডস আউটসাইড ও মিসৌরি ছবি দুটির জন্য তিনি এ পুরস্কার পান। আর 'দ্য শেপ অব ওয়াটার' পেয়েছে সেরা ছবির পুরস্কার। শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার পেয়েছেন গুয়ের্মো ডেল তোরো (দ্য শেপ অব ওয়াটার)।

প্রতিবেদন: মিতা খান

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

শুরু হয়েছে জাতীয় যুব ফুটবল গেমস

৭ই মার্চ ২০১৮ শুরু হয়েছে জাতীয় যুব ফুটবল গেমস। ছেলেদের ৮টি দল এবং মেয়েদের ৭টি দল অংশ নিচ্ছে এই ইভেন্টে। মেয়েদের ইভেন্ট শুরু হয়েছে ৮ই মার্চ। ছেলেদের দলগুলো হলো– ঢাকা, রংপুর, খুলনা, ময়মনসিংহ, সিলেট, বরিশাল, এবং রাজশাহী। মেয়েদের দলগুলো হলো– ঢাকা, রংপুর, খুলনা, ময়মনসিংহ, সিলেট, চট্টগ্রাম, এবং বরিশাল। ছেলেমেয়ে উভয় বিভাগের খেলা কমলাপুর শহিদ সিপাহী বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। উভয় বিভাগের ফাইনাল খেলা ১৪ই মার্চ।

নিদাহাস ট্রফি খেলতে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল শ্রীলঙ্কায়

ভারত, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কাকে নিয়ে ত্রিদেশীয় নিদাহাস ট্রফিতে অংশগ্রহণের জন্য খেলতে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল এখন শ্রীলঙ্কায়। টি-টোয়েন্টির ফরম্যাটের এই সিরিজে বাংলাদেশ ভালো করার প্রত্যয় নিয়ে শ্রীলঙ্কায় গিয়েছে। তবে এই ফরম্যাটে ভারত ও শ্রীলঙ্কা অনেক শক্তিশালী দল হওয়ায় সিরিজটি বাংলাদেশ দলের জন্য খুবই চ্যালেঞ্জিং। ৬ই মার্চ ভারত-শ্রীলঙ্কা ম্যাচের মাধ্যমে শুরু হওয়া নিদাহাস ট্রফির ফাইনাল খেলা ১৮ই মার্চ।

এশিয়ান গেমস হকি বাছাই পর্ব

এশিয়ান গেমস হকি বাছাই পর্ব খেলার জন্য বাংলাদেশ হকি দল এখন ওমানে। ৮ই মার্চ ওমানে শুরু হয় এটি। বাছাই পর্বের এই খেলায় মোট ৯টি দল দুইটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে অংশ নিচ্ছে। বাংলাদেশ 'এ' গ্রুপে পড়েছে। 'এ' গ্রুপে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ– আফগানিস্তান, হংকং, থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়া। এ বছর বাংলাদেশের লক্ষ্য বাছাই পর্বে চ্যাম্পিয়ন হয়ে ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিতব্য এশিয়ান গেমসের মূল পর্বে অংশ নেওয়া।

প্রতিবেদন: জাকির হোসেন চৌধুরী